বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা
শামসুজ্জামান খান

র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা

উৎসর্গ

বাংলাদেশে আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম রূপকার

অধ্যাপক আবদুল হাফিজের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে —

সূচিপত্র

লোকসাহিত্য

লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস

লোকসঙ্গীত

লোকনাট্য

লোকক্রীড়া

লোকপুরাণ

মিশ্র মাধ্যম

ভূমিকা

'বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য' এবার কিছু ভিন্ন আঙ্গিক ও ফর্মগত (Genric) বিন্যাসে উপস্থাপিত হলো। এর উদ্দেশ্য পাঠককে আন্তর্জাতিক ফোকলোর গবেষণার বহুল পরিচিত ও ধ্রুপদী ফর্ম বা ধরনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ জাতিগোষ্ঠীগত (Ethnic Genre) বা স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসূচক ধরনের (Culture-Specific Genre) পরিচয় ঘটানো। বাংলাদেশেব ফোকলোর উপাদানকে আমরা আন্তর্জাতিক শ্রেণীকরণের (Classification) আওতায় যেমন ফেলতে পাবি, তেমনি আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একে কিছু ভিন্নভাবেও উপস্থাপন করা যায়। ফলে এই ফর্ম বা প্রকরণ (Genre) একাধিক ফর্মে সমন্বিত হযে একটি আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখায় (Category) পরিণত হতে পারে, যেমন — লোক বা মৌখিক আখ্যান (Folk or Oral Narrative) বা লোকসঙ্গীত (Folksong)। লোক আখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হয় লোককাহিনী (Folktale), কিংবদন্তী (Legend) ও লোকপুরাণ (Myth) এবং লোকসংগীতে গীতিকা (Ballad), গীতি (Song), কবিগান ইত্যাদি। সমন্বিত বা একিভূত শ্রেণীকরণকে আলাদা আলাদা প্রকরণেও বিশ্লেষণ করা যায়। গবেষক ও পণ্ডিতেবা গবেষণার সুবিধার্থে এ ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ, বা প্রজাতিভিত্তিক ধরন চিহ্নিত করেছেন। আমরা আন্তর্জাতিক পযাযেব স্বযংসম্পূর্ণ বিভাগ ইতোপূর্বে দেখিয়েছি। আন্তর্জাতিক প্রজাতিভিত্তিক প্রকরণের মধ্যে প্রবাদ (Proverb), ধাঁধা (Riddle), লোককাহিনী (Folktale), কিংবদন্তী ইত্যাদিকে চিহ্নিত করতে পারি। তেমনি লোকশিল্প (Folkart) ও লোকসংস্কারকে (Folk Superstition) কে সমন্বিত ও প্রজাতিভিত্তিকভাবে দেখানো যায়, যেমন — লোকশিল্প একটি সমন্বিত শাখা। এর প্রধান দু'টি ভাগ হতে পারে লোকশিল্প ও কারুশিল্প (Folkcraft)। আবাব লোকশিল্পও বিভক্ত হতে পারে মৃৎশিল্প, সূচিশিল্প (যেমন— নকশীকাঁথা), আলপনা ইত্যাদি অভিধায়। লোকসংস্কারকেও ক্রিয়াকরণধর্মী (Ritualistic) বিশ্বাস-সংস্কারজাত, জাদুবিদ্যাভিত্তিক, জীবনচক্রমূলক ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত কবে বিশ্লেষণ করা যায়। ফোকলোবে সমন্বিত, প্রজাতিভিত্তিক বা একক ধরন বা প্রকরণ ছাড়াও কোনো দেশের বিশেষ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসূচক একক, মিশ্র বা বিশ্ব পরিচিত ধ্রুপদী প্রকরণের সঙ্গে আংশিকভাবে আঞ্চলিকতা যুক্ত উপাদানও থাকে। অতএব ফোকলোর-এব শ্রেণীকরণ ব্যাপক, বিচিত্র এবং জটিল। এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও তাই। আমাদের দেশে সে-ভাবে পরিপূর্ণ গবেষণা এখনো শুরু হয়নি।

আমাদের বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলোকে আমবা পূর্বোক্ত ফর্ম (Genre) বিশ্লেষণের আলোকে কিছুটা বিচার-ব্যাখ্যা করে বুঝে নিতে চেষ্টা করবো। কাবণ, ফোকলোর গবেষণায় Genre-এর ধারণা একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। যদিও এখন এ বিষয়ে নানা বিতর্ক-বিতণ্ডা আছে। যাহোক, 'লোকসাহিত্য' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা পাঁচটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত

করেছি। এতে আছে : ড. মুহম্মদ এনামুল হকের 'লোক–সাহিত্য', মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর 'পূর্ববাংলার লোক–সাহিত্য', আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'বঙ্গের গ্রাম্য সাহিত্য', ইব্রাহীম খাঁর 'পল্লী–সাহিত্যের কথা' এবং সৈয়দ আলী আহসানের 'লোকঐতিহ্য ভাবনা'। প্রথমেই বলে নেয়া ভালো যে, 'লোকসাহিত্য' ফোকলোর বিদ্যাশাখার (Discipline) একটি প্রধান অঙ্গমাত্র, গোটা বিষয়টির (Folklore) অভিধা নয়। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ বঙ্গদেশে ফোকলোর বোঝাতে 'লোকসাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি কারণ বা তাৎপর্য হয়তো আছে। তবে তা তেমন ব্যাখ্যাত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০–এর দশকে পূর্ববাংলায় আগমন করে লোকসাহিত্য, লোকজ–সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে বাউলগানের অসামান্য ভাবসম্পদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে এর সংগ্রহ–সংরক্ষণে যেমন যত্নবান হন, তেমনি তাঁর কবিতা ও গানে এর প্রভাব পড়তে থাকে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ–বক্তৃতায়ও তিনি লোককবি–ভাবুক–দার্শনিকদের বক্তব্য তুলে ধরে তার মধ্যে যে ভাব–গভীরতা এবং সর্বজনীন মানব–সত্যের উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে তা তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথের আগে 'লোকসাহিত্য' অভিধাটি কেউ ব্যবহার করলেও যথাযথ তাৎপর্যে তিনিই প্রথম এর ব্যবহার করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বই 'লোকসাহিত্য' এর পরিচয় বহন করছে। এই ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের Genre বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত সকল রচনাই লোকসাহিত্য শাখার অন্তর্ভুক্ত। 'কবিগান' সংক্রান্ত রচনাটিও তখন পর্যন্ত লোক–কবিদের মৌখিক রচনা হিসাবে বিবেচিত হতো। এখন ফোকলোরের নানামাত্রিক গবেষণার ফলে কবিগানকে শুধুই লোকসাহিত্য বলবো না—লোকসঙ্গীত এবং তত্ত্ববিচারমূলক একটি বিশেষ বাঙালি–জাতিতাত্ত্বিক Genre হিসাবেই একে আখ্যাত করবো।

যাহোক, রবীন্দ্রনাথ ফোকলোর বিবেচনায় যে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন পরবর্তীকালের গবেষকেরা তার মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করেননি। হয়তো তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত ওই অভিধার মধ্যেই ফোকলোরের একটি উপযুক্ত প্রতিশব্দ পেয়ে গেছেন বলে মনে করে থাকবেন। তখনো ফোকলোরকে নানা বিদ্যাশাখার আলোকে দেখার উপযোগী বিষয় নৃতত্ত্ব, মিউজিকোলজি, এথনো–মিউজিকোলজি, ফোক আর্ট ইত্যাদি বিদ্যা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়নি। অন্যদিকে বোম্বের নৃতত্ত্ব বিষয়ক জার্নালে স্যার শরৎচন্দ্র মিত্র, খানবাহাদুর আবদুল ওয়ালিরা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের চর্চার মাধ্যমে আধুনিক ফোকলোর চর্চার যে ভিত্তি নির্মাণ করছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত ফোকলোর প্রেমিকরা সে সম্বন্ধেও যথাযথভাবে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া ড. দীনেশচন্দ্র সেন ছাড়া ফোকলোর চর্চার তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্যদের তেমন ধারণা ছিলো বলেও মনে হয় না। ড. দীনেশচন্দ্র সেন যে ময়মনসিংহের এবং পূর্ববঙ্গের পালাগান বা গীতি–আখ্যান কাব্যকে "গীতিকা" শীর্ষক একটি সুপ্রযুক্ত অভিধায় আখ্যাত করেছিলেন তাতে মনে হয় তিনি হার্ভার্ডের প্রফেসর ফ্রান্সিস জে. চাইল্ডের (Prof. Francis J. Child)–এর তখনকার আলোড়ন সৃষ্টিকারী English And Scottish Ballad (5 vols. 1882-98)

সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তবে দীনেশ সেন পরবর্তী বাঙালি ফোকলোর গবেষকেরা কোনো আন্তর্জাতিক সংযোগ গড়ে তুলতে না পারায় এতদ্‌সংক্রান্ত চর্চা আধুনিক ও বৈশ্বিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছে। এটাই বাংলা ফোকলোর চর্চার দুর্বলতার কারণ। ফোকলোর বিষয় হিসাবে আঞ্চলিক হলেও এর চর্চা আন্তর্জাতিক।[২] দীর্ঘদিন এই সত্য উপেক্ষিত হয়েছে। বাংলা অঞ্চলের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও পূর্ণাঙ্গ ফোকলোর বিভাগ না থাকায় বাংলা বিভাগের সঙ্গে হেলায়-ফেলায় এর চর্চা হয়েছে।

বাঙালি বিদ্বানেরা ফোকলোর চর্চা করেছেন নিতান্তই ভালোবাসা ও জাতীয়তাবাদী প্রেরণা থেকে এবং রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন এক্ষেত্রেও সকলের প্রেরণার উৎস। ফলে রবীন্দ্র-আচ্ছন্নতার জন্যেই হয়তো তাঁরই অনুসরণে ফোকলোরের বাংলা প্রতিশব্দ হয়ে গেল 'লোকসাহিত্য'। ১৩৬১ (১৯৫৪) সালে প্রকাশিত অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলা ফোকলোরের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের নাম রাখা হলো 'বাংলার লোকসাহিত্য'। মজার ব্যাপার হলো এ বই লেখার সময় তিনি 'ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগারের নৃতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা'য় বসে কাজ করেন। জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ এবং নৃতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে সংযুক্তি সত্ত্বেও বহির্বিশ্বের ফোকলোর বা নৃতত্ত্বের সর্বশেষ বইপুস্তকের প্রভাব তাঁর বইয়ের নামকরণ এবং আলোচনায় তেমন একটা পড়েনি। আর রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ ভট্টাচার্যের পরে ১৯৬৩-তে প্রকাশিত ড. আশরাফ সিদ্দিকীও তাঁর বইয়ের নামকরণ করলেন 'লোকসাহিত্য'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফোকলোর চর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি করার পরও ড. সিদ্দিকী বঙ্গীয় ঐতিহ্য ভেঙ্গে নতুন নামকরণে যাননি। ১৯৭৭ সালে অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তীর বইয়ের নামও রাখা হল 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস'। যদিও এইসব বইয়ে ফোকলোরের বিভিন্ন শাখার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এই ধারায় প্রথম ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করি ড. ওয়াকিল আহমদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে। তিনি তাঁর বইয়ের নামকরণ করেন 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' (১৩৮১)। এর আগে ড. মযহারুল ইসলাম ফোকলোরের প্রতিশব্দ করেছিলেন 'লোকলোর'। এই শব্দের মাধ্যমে তিনি ফোকলোর শব্দটির মর্মবস্তুকে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। শব্দটি শ্রুতিমধুরও ছিলো। তবে পরে তিনি 'লোকলোর' পরিত্যাগ করে 'ফোকলোর' শব্দই ব্যবহার করা শুরু করেন। তবে বাংলা একাডেমীর এতদ্‌সংক্রান্ত বিভাগের নামকরণও করা হয় 'ফোকলোর বিভাগ'। এটি এক গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রচারী পদক্ষেপ। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য লোক-সংস্কৃতি চালু হয়েছে। নৃতত্ত্বের Folkculture নামে একটি বিশিষ্টার্থক শব্দ থাকায় তার প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোক-সংস্কৃতি' যথাযথ হয় বিবেচনা করে আমরা ফোকলোরকেই গ্রহণ করেছি। কারণ ফোককালচারে ফোকলোরের প্রধান প্রধান বিষয় যথা : লোকগল্প, কিংবদন্তী, লোকপুরাণ, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এমতাবস্থায় ফোকলোরকে 'লোক-সংস্কৃতি' বলা যায় না।[৩]

বর্তমান সংকলনের নাম : 'বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য'। মরহুম আবদুল হাফিজ এই নামটি প্রচলন করেন। এটি একাডেমী কর্তৃক নির্বাচিত এ বইয়ের নাম। এই নামে মৎ সম্পাদিত একটি সংকলন আগেও বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছিলো। আগের সংকলনের বেশকিছু লেখা এতে থাকলেও বর্তমান সংকলনটি সম্পূর্ণ নতুন বই হিসাবে পরিকল্পিত।

দুই

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের (১৯০৬–১৯৮২) 'লোক-সাহিত্য' প্রবন্ধে লোকসাহিত্য, ছড়া হেঁয়ালি, প্রবাদ-প্রবচন, মন্ত্রতন্ত্র, লোকগাথা, লোককথা, লোকসঙ্গীত, নৃত্যসঙ্গীত ইত্যাদির আলোচনা আছে। ফোকলোরের আধুনিক গবেষকেরা হয়তো এ বিষয়ের প্রবন্ধকে তিন/চার ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতেন যথা : ক. লোকসাহিত্য, খ. প্রবাদ-প্রবচন, গ. হেঁয়ালি বা ধাঁধা, ঘ. লোক-সংস্কার এবং ঙ. লোকসংগীত। বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চার ধরন হয়তো তাঁকে এ ধরনের নামকরণে প্রবুদ্ধ করেছে। অন্য কারণেও এরকম নামকরণ হতে পারে ; এটি বরিশাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের লোকসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ (১৯৫৭)। উদ্যোক্তারা যে-বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ড. হক হয়তো সেই বিষয়ের ওপরেই আলোকপাতে সচেষ্ট ছিলেন। তবে বাংলাদেশের এই প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ভাষাবিজ্ঞানী আলোচ্য প্রবন্ধে ফোকলোরের কিছু মূল বৈশিষ্ট্যকেও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন : 'লোক-সাহিত্যকে আলোচনার সাহায্যে বুঝানো সম্ভবপর নহে।' তিনি এর জন্য একজন প্রতিভাবান লোকশিল্পীর উপযোগী পরিবেশে উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্রাদিসহ পরিবেশনার (Performance) মাধ্যমে ভোক্তাদের তৃপ্তিদানের কথা বলেছেন। একালে আমরা যে কথা বিশ্ব ফোকলোব বোদ্ধাদের কণ্ঠে শুনি : 'It has Long been known that the wiltten page is but a pale reproduction of spoken word, that a tale hardly reflects the telling'—ড. হক তাঁর প্রখর কাণ্ডজ্ঞানে সেকথাই বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : 'লোক-সাহিত্যের বহু বিষয় ও ভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং ভাষা সতত পরিবর্তনশীল বলিয়া জীবন্ত ও নিত্য নতুন। আর শিষ্ট সাহিত্যেব বিষয়, ভাব ও ভাষা শিল্পের লৌহ পিঞ্জবে আবদ্ধ হইয়া আশু পরিবর্তন ঘটাইতে অসমর্থ।' এ উক্তি ফোকলোর চর্চার আধুনিকতম ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রুশ ফোকলোর তাত্ত্বিক ভ্লাদিমির প্রপ (১৮৯৫–১৯৭০) বলেছেন : 'What is important is the fact of changeability of folklore compared with the stability of literature'. তবে ড. হক যে বলেছেন : 'লোক-সাহিত্যে প্রাণ আছে, হৃদয় আছে, অভিজ্ঞতা আছে, এমনকি বৈচিত্র্যও আছে, কিন্তু শিল্প নাই।' এ উক্তি যথার্থ নয়।

ভ্লাদিমির প্রপ বলেছেন : 'Folklore Posses a most distinctive Poetics, Peculiar to it and different from the Poetics of literary works. Study of this Poetics will reveal the incomparable artistic beauty of folklore' (Theory and History of Folklore Vladimir Propp, p.6. University of Minnesota Press, Minneapolis, U.S.A). এ ছাড়া Dan-Ben-Amos ফোকলোরেব যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হলো : 'Folklore is artistic communication in small groups'. তাতেও শিল্পের বিষয়টিকে অপরিহার্য মনে করা হয়েছে।

ড. হকের উপর্যুক্ত বক্তব্য মেনে নিলে আমাদের মৈমনসিংহগীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকাও শিল্প সুষমাহীন হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে তাই ড. দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন : 'পল্লী কবিদের গাথা কবিতায় সরল মাধুর্য, মানবীয় গুণ এবং শিল্প সাফল্য প্রশংসনীয়'।

সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর (১৯০১–১৯৭৯) 'পূর্ববাংলার লোক–সাহিত্য'র গুরুত্বের কারণ — লেখক নিজেই ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ ফোকলোর সংগ্রাহক ও গবেষক। তদুপরি তিনি বাংলাদেশের লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ এলাকা নেত্রকোণার অধিবাসী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত হিসাবে ভাষার ওপরও তাঁর ভালো দখল ছিলো। তাছাড়া আজীবন নিজ জেলার গ্রাম এলাকায় বসবাস করার ফলে লোক–জীবন ও তাদের সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো জীবন্ত। লেখাটি কিছু বিশ্লেষণমূলক এবং তথ্য সমৃদ্ধ। লেখাটিতে ধাঁধা ও হেঁয়ালী এবং প্রবাদ–প্রচনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। লোকসাহিত্যের সঙ্গীত শাখাকে তিনি দুই অংশে ভাগ করেছেন, যথা : গীতি ও গীতিকা। এ দুইয়ের সংজ্ঞাও তিনি দিয়েছেন। গীতিকাকে সংগীত শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং গীতিকার স্থানীয় নাম 'লম্বাগীত' বা 'পালাগান' উল্লেখ করাও তাঁর চিন্তার আধুনিকতাকে তুলে ধরে। জারিগানে মণিপুরী ও সাঁওতালী নৃত্যের আঙ্গিক গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ তথ্যও নতুন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১–১৯৫৩) পুথি সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগ্রাহক, পাঠোদ্ধারকারক এবং গবেষক–বিশ্লেষক। গ্রাম–বাংলায় ঘুরে–ঘুরে পুথি সংগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে তিনি যে হেঁয়ালি ও ধাঁধা সংগ্রহ করেছেন তারই উপস্থাপনার সুবাদে সংকলিত প্রবন্ধটিতে লেখক হেঁয়ালির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যসাধক অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪–১৯৭৮) 'পল্লী–সাহিত্যের কথা'য় জাতীয় জীবনে লোকসাহিত্যের গুরুত্ব এবং ইতিহাস নির্মাণে লোক–উপাদানের ব্যবহার সম্পর্কে পাঠকদের সচেতন করেছেন। ইউরোপ আমেরিকার মতো ফোকলোর সোসাইটি গঠন করে বিভিন্ন দেশের লোক–উপাদানের তুলনামূলক আলোচনার প্রতিও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০–২০০২) এর 'লোকঐতিহ্য ভাবনা' ১৯.৩.১৯৮৫ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ লোক–সংস্কৃতি উৎসবে (ময়মনসিংহ টাউন হল) প্রধান অতিথি হিসাবে দেয়া ভাষণ। এতে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের ফোকলোর সম্পর্কে সাধারণ এবং ময়মনসিংহের ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ওই অঞ্চলের সমৃদ্ধ লোকসাহিত্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া আধুনিক কবিসাহিত্যিকদের রচনায় বিশ্বব্যাপী লোকউপাদানের ব্যবহার থাকলেও বাংলাদেশে একমাত্র জসীমউদ্‌দীনের রচনায় এর উজ্জ্বল নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ড. মযহারুল ইসলাম (১৯২৮–২০০৩) বাংলা ফোকলোর চর্চায় আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃৎ। ভারতীয় উপমহাদেশে লোককাহিনী সংগ্রহের প্রাথমিক পর্বে ইউরোপীয় সিভিলিয়ান ও মিশনারীদের উদ্যোগের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে তাঁর রচনায়।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬–১৯৩৯) বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাঙালির ইতিহাসের ওপর অনেকগুলো আকর গ্রন্থ রচনা করেছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬), History of Bengali Language and literature, বৃহৎবঙ্গ ইত্যাদি এ ধরনের গ্রন্থ। তিনি শুধু উচ্চমানের সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, মৈয়মনসিংহ গীতিকা (১৯২৩), পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১৯২৬), Eastern Bengal Ballads (1923) প্রভৃতি তাঁর চিরস্মরণীয় কীর্তি। বর্তমান

গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রচনাটি তাঁর 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকে সংকলিত। এ বইয়ে ড. সেন দেখিয়েছেন লোককবিরা মৌলিকতা এবং পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অনন্য রূপকার। তিনি বলেছেন, আলাওল প্রমুখের পাণ্ডিত্য আছে, তবে কবিত্ব কম ; কিন্তু পল্লী কবিদের গাথা কবিতায় সরল মাধুর্য, মানবীয় গুণ এবং শিল্পসাফল্য প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, ভারতচন্দ্রের কুরুচির বিপরীতে পল্লী কবিদের নৈতিক সতর্কতা ঈর্ষণীয়। এই গীতিকাগুলিকে তিনি বাঙালি জাতির অকৃত্রিম কাব্য বলে মনে করেন। তিনি বলেন, এই পল্লীসাহিত্যে দেখা যায় বাঙ্গালী প্রতিভা কত দুর্দমনীয় ও উজ্জ্বল। ড. সেন এই পল্লী গীতিকাগুলির সঙ্গে মুসলমানদের সংশ্রব এবং কেনইবা তারা এগুলো রক্ষা করেছেন তার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই সূত্রেই এই গীতিকাগুলো পূর্ব ময়মনসিংহে কেনো অধিক পরিমাণে পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। উচ্চ হিন্দু সমাজে এসব পল্লী গীতিকার কোনো কদর যে ছিলো না তার কারণও বিশ্লেষণ করেছেন। পল্লী গীতিকাকে যে স্থানীয় ভোক্তারা 'পালাগান' বলতেন তিনি তারও উল্লেখ করেছেন। ফর্ম বিশ্লেষণে এই স্থানীয় নামও গুরুত্ববহ।

ফোকলোর সংগ্রহের ব্যাপারে ড. সেনের পদ্ধতিও ছিলো বিজ্ঞানভিত্তিক। সংগ্রাহক নির্বাচনের বিষয়ে তিনি লিখেছেন —'আমি গ্রাজুয়েট চাই না, যাহারা চাষার কুটিরে পা দিতে সহজে স্বীকৃত হইবে না এবং তাহাদের কথিত গানগুলি শুদ্ধ না করিয়া লিখিতে পারিবে না, নিম্নশ্রেণীর কাছে আসিলে যাহাদের গা ঘিনঘিন করিবে, এমন লোক আমি চাই না, যাহারা দরদ দিয়া তাহাদের আনন্দে যোগ দিতে পারিবে এবং তাহাদের কথিত গানের একটিমাত্র বর্ণনাও বদলাইয়া ঠিক করিবে না, তাহারা যেভাবে বলিবে, সেইভাবে টুকিয়া লইতে পারিবে, সেইরূপ লোক আমি চাই।' তবু ড. সেনের একটা সমালোচনা আমরা করি ; তা হল, চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত উপাদানগুলো তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা জাতীয় মহাফেজখানায় (আর্কাইভস্) এ সংরক্ষণ করেননি। ফলে পরবর্তী গবেষকদের তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ নেই।

চন্দ্রকুমার দে'র (১৮৮৯–১৯৪৬) 'মনসা ভাসান'—দুই কারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত 'মনসা ভাসান' বা 'বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী' নিঃসন্দেহে বাঙালির এক জনপ্রিয় লৌকিক মহাকাব্য এবং দ্বিতীয়ত এটি প্রচলিত নারায়ণ দেব বা বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ হতে ছন্দ ও সুরে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কারণ এটি প্রতিভাময়ী কবি চন্দ্রাবতীর রচনা। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ যেমন ভিন্ন স্তর ও স্বাদের কাব্য তাঁর বেহুলার ভাসানও তেমনি। জন্মদুঃখিনী বেহুলার লোকগাথা চন্দ্রাবতী ছাড়া আর কে অমন দরদ দিয়ে এবং প্রতিভার স্পর্শে মোহনীয় করে তুলতে পারতেন? তবে চন্দ্রাবতীর এই রচনাটি আমরা পাইনি। চন্দ্রকুমারের আলোচনা থেকেই যা কিছুটা জানা যায়।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭–) বাংলা ফোকলোরের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ফোকলোর বিদ্যায় পি.এইচ.ডি করেছেন। 'লোকসাহিত্য' তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ। বর্তমান গ্রন্থভুক্ত রচনাটিতে তিনি বাংলার লোক-ক্রীড়ার ওপর আলোকপাত করেছেন।

অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের (১৯৩৬—) 'বাউল গান' সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ। লোকসাহিত্য চর্চার জাতীয়তাবাদী আবেগপ্রসূত আচ্ছন্নতার পরিবর্তে বাংলার ধর্ম-দর্শন-কাল্ট-এর দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমন্বয়ের প্রেক্ষাপটে লেখা রচনাটি চিন্তা-উদ্দীপক। বাউল গান লোকসংগীত। তবে বর্তমান প্রবন্ধে সঙ্গীতের আলোচনার চেয়ে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ গুরুত্ব পেয়েছে।

অধ্যাপক যতীন সরকারের (১৯৩৬—) 'বাংলাদেশের কবিয়াল' শীর্ষক রচনায় বাংলাদেশের কবিগানের বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য সংযোগ করা হয়েছে। যাঁরা আরো বিস্তৃতভাবে জানতে চান তাঁরা প্রবন্ধকারের 'বাংলাদেশের কবিগান' (বাংলা একাডেমী) শীর্ষক গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন।

ড. ওয়াকিল আহমদ (১৯৪১—) এক বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর বর্তমান গ্রন্থভুক্ত রচনাটিতে বাংলার লোকপুরাণ বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনায় পাঠক উপকৃত হবেন।

মোহাম্মদ সাইদুরের (১৯৪২–) 'লোকনাট্য কলা' তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও ফিল্ডওয়ার্ক নির্ভর একটি উল্লেখ্য রচনা।

অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমানের (১৯৪৮—) "চাঁদ সদাগরের লাঠি ও হজরত মুসার 'আষা" শীর্ষক রচনাটি আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক। প্রবন্ধকার এ রচনার মাধ্যমে আমাদের এক নতুন অন্তর্দৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছেন।

চিত্রশিল্পী তরুণ ঘোষের (১৯৫৩–) শিল্পচর্চায় বেহুলা উপাখ্যান কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে স্থিত। বর্তমান প্রবন্ধে পটচিত্রে বেহুলার প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ওপরও আলোকপাত করেছেন।

শাহনাজ হুসনে জাহান লীনা (১৯৬৬–) নতুন প্রজন্মের সংস্কৃতি গবেষক। ফোকলোর চর্চায় তাঁর আগ্রহ ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক। বর্তমান রচনাটিও তার পরিচয় বহন করছে। এ লেখাটি সম্পন্ন করার জন্য তিনি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন।

বাংলার লোকসাহিত্য এবং ফোকলোরের অন্যান্য বিষয়ে Genre ভিত্তিক এই সংকলনের মাধ্যমে এ বিষয়ে নতুন করে আলোচনা ও তর্ক-তদন্তই আমাদের কাম্য। এর মধ্য দিয়ে আমাদের ফোকলোর Genre বিশ্লেষণ একটা সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করবে আমরা এটাই আশা করি।

বইটি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

শামসুজ্জামান খান

পাদটীকা

১ *Folklore Genres* Edited by Dan-Ben Amos অধ্যাপক ফ্রান্সিস জে চাইল্ড তার সংগ্রহকৃত সুবিখ্যাত ব্যালাড গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে *The English and Scottish Popular Ballads* শীর্ষক Genre ভিত্তিক প্রথম লেকচার প্রদান করেন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৯৪-'৯৫ এ।

২ ক The international Nature of folklore studies leads to the cultivation of still other skills by the folklorist One such skill or technique may be termed International communications The Professional folklorist can not simply plough the soil of his own environs, for the trail of the most localised item of folklore will eventually lead around the world, and the problems he confronts are also being faced with perhaps a good deal more support, on other continent *The skills of the folklorist* — Richard Dorson

খ *Folklore is an international Phenomenon* — Vladimir Propp

৩ Folklore and Anthropology—William R Bascom, P 26 *The study of Folklore*, Ed Alan Dundes

লোকসাহিত্য

মুহম্মদ এনামুল হক

লোক-সাহিত্য

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল, 'লোক-সাহিত্য'কে আলোচনার সাহায্যে বুঝানো সম্ভবপর নহে। আমি যদি একজন পল্লীর প্রতিভাবান মানুষ হইতাম এবং একতারা, দোতারা, সারিন্দা, মন্দিরা, মুরলী, বাঁশী, শিঙ্গা, মাদল, ঢোল, ঢাক, কাড়া খোল, করতাল, ঝাঁঝর, কাসর, খঞ্জনি, গোপীযন্ত্র প্রভৃতি লইয়া সদলবলে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতাম, তবে লোক-সাহিত্যের যে স্বাভাবিক পরিবেশ, তাহার কিছুটা তুলিয়া ধরিতে সমর্থ হইতাম। ইহার যে অকৃত্রিম রস ও তাহার উৎসার, ইহার যে সহজ-সরল পরিবেশন ও উপভোগ,—এই সমুদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পল্লীর শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদ লোক-সাহিত্যের রসোপলব্ধি সহজ নয়। অন্য কথায়, ইহার রস গ্রহণ ও দান করিতে হইলে, স্বাভাবিকভাবে রসের সহিত রসনার যোগ সাধন করিতে হইবে। তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে একরূপ দুরূহ। এই জন্যই আশঙ্কা হইতেছে, আমাদের মত বেরসিক লোকের হাতে পড়িয়া শেষ পর্যন্ত রসে-ভরা লোক-সাহিত্যে'র ভরাডুবি না হয়। তবে, একেবারে নিরাশ হইবারও কারণ নাই। লোক-সাহিত্যেই বলে :

"নুনর না ডুবি যাইতে মুখত্ দি চা।" (চট্টগ্রাম)

আমিও বলি, নেহাত ভরাডুবি হইতে দেখিলে আপনারা একটু সাবধান হইবেন এবং আমার সহিত 'নুনের নায়ের নুন' মুখে দিয়া চাখিয়া লইবেন।

এই প্রসঙ্গে-এই কথাও বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে, আলোচনার সাহায্যে 'লোক-সাহিত্যে'র সত্যকার রসোপলব্ধি যতই দুরূহ হউক না কেন, ইহার সহিত শিষ্ট-সমাজের পরিচয় ঘটানো তেমন কোন কঠিন কাজ নহে। আমরা এই আলোচনায় প্রধানত এই সহজ পথেই চলিবার চেষ্টা করিব।

এই কথা সত্য যে, লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নাই। আমরা যে-সাহিত্য শিখি বা শিখাই অথবা আমরা যে-সাহিত্য সৃষ্টি করি বা করাই, তাহার সমস্তই 'শিষ্ট-সাহিত্য', ইহা নাগরিক-সৃষ্টি যদি নাও হয়, তবু ইহা নাগরিক-সাহিত্য। কেননা, ইহাতে নাগরালি থাকুক বা না থাকুক, নাগরিয়ানা বা নগুরে-ভাব যে বর্তমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাহিত্য ভদ্রলোকের,—দেশের বিশাল লোক-সমাজের নহে। ভদ্রলোকদের মতো এই 'শিষ্ট-সাহিত্য' যেমন নগণ্য, তাঁহাদের মতো তাঁহাদের সাহিত্যও তেমন পোশাকী। দেশজোড়া লোক-সমাজ যে-সাহিত্যের সঞ্জীবনী-সুধা পান করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে, সে-সাহিত্যের নাম 'লোক-সাহিত্য'। কি সৃষ্টিতে, কি প্রকাশে, কি অনুভূতিতে, কি পরিবেশে-কোন কিছুতেই ইহার সহিত 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র বিশেষ মিল নাই; ইহা সর্বপ্রকারে গ্রামীণ। ইহা কথায় যেমন গেঁয়ো, ভাবেও তেমন গেঁযো। এইজন্যই 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র ভব্যতা

ও শালীনতা 'লোক-সাহিত্যে' আশা করা যায় না। 'লোক-সাহিত্যে' শালীনতা ও ভব্যতা নাই বটে, কিন্তু স্বাভাবিকতা আছে, ঋজুতা আছে, সজীবতা আছে, সর্বেপরি আছে সহৃদয়তা। তার, 'লোক-সাহিত্য' দেশের লোক-সমাজের সহজ অভিজ্ঞতা ও সরল অনুভূতির অভিব্যক্তি বা প্রকাশ, আর 'শিষ্ট-সাহিত্য' নগুরে-ভাবাপন্ন লোকের জটিল মনীষার বিচিত্র বিকাশ।

এই প্রসঙ্গে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র লোক-গাথার অন্তর্গত 'মহুয়া পালা'র কিয়দংশ এবং তৎসূত্রে কবি নজরুল ইসলামের একটি গান স্মরণ করা যাইতে পারে। 'মহুয়া পালা'য় মহুয়ার সহিত নদ্যার ঠাকুরের সাক্ষাৎকার ঘটার এবং প্রেম নিবেদনের ঘটনাটি স্মরণ করুন।

সন্ধ্যা সমাগত। কাকলি-মুখর পাখি কুলায় ফিরিতেছে, ক্রমেই গ্রামের পথ প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। এমন নির্জন-নদীর বিজন-ঘাটে নামিয়া উদ্‌ভিন্ন-যৌবনা মহুয়া আনমনে কলসী ভরিতেছে। অলক্ষিতে নদী-তীরে দাঁড়াইয়া পুষ্পশর-জর্জর নদ্যার ঠাকুর একাকী এই দৃশ্য দর্শনে আত্মহারা। হঠাৎ আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া সে বলিয়া ফেলিল :

'জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ॥
কেবা তোমাব মাতা কন্যা কেবা তোমারে পিতা॥"
ইত্যাদি

ইহাতে মহুয়া চমকিতা হইয়াছিল নিশ্চয়ই এবং সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য-নিস্তব্ধতাকে মুখর কবিয়া উত্তর দিযাছিল :

"নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সোদর ভাই।
সোতের সেওলা হইয়া ভাসিয়া বেড়াই॥"

মহুয়ার এমন একটি করুণ উত্তর বংশীর ধ্বনির ন্যায় নদ্যার ঠাকুরেব হৃদয় মথিত করিতেই সে নিঃসঙ্কোচে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল :

"কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া॥
তোমার মতন কন্যা পাইলে আমি করি বিয়া॥"

এমন একটা বেয়াড়া প্রস্তাব শুনিয়া মহুয়া, নদ্যার ঠাকুরকে কলসীর কানা মারিয়াছিল কিনা জানি না। তবে তাহার যৌবন-দীপ্ত গণ্ডদ্বয় যে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠুক বা না উঠুক, তাহার উত্তর হইতে আমরা বেশ আঁচ করিতে পারিতেছি। মহুয়া উত্তর দিল :

"লজ্জা নাইরে নিলাজ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তোর।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুইব্যা মর॥

নদ্যার ঠাকুর এই উপদেশ শুনিয়া গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মরিবার আগেই তো মহুয়ার প্রেমদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিতে গিয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। সুতরাং, সে নির্ভয়ে উত্তর দিল :

"কোথায় পাইবাম কলসী কন্যা কোথায় পাইবাম দড়ি
তুমি হও গহীন গাং আমি ডুইব্যা মরি।"

আমাদের মতো সামাজিক-জীব যদি অশরীরী-অবস্থায়ও নদীর ঘাটে মহুয়া ও নদ্যার ঠাকুরের প্রশ্নোত্তর শুনিবার জন্য এই সময়ে উপস্থিত থাকিত, তবে নিশ্চয়ই এই কথা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিত। ব্যাপারটি আমাদের কাছে এমনই বিসদৃশ ঠেকিত। আমরা ভাবিতাম না যে, বিবাহের প্রস্তাব আগেও হইত, এখনও হয়। ইহাতে নূতনত্ব কি? হ্যাঁ, এখনকার প্রস্তাবে নূতনত্ব আছে। এখন এখনকার মতো সামাজিক ভব্যতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব করা হয়—ইহাই নূতন। নূতনত্ব রক্ষা করে নাই বলিয়াই নদ্যার ঠাকুরের প্রস্তাব আমাদের কাছে অসামাজিক। আমরা তাহার এই প্রস্তাবকে অসামাজিক বলিয়া রায় দিলেও, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, নদ্যার ঠাকুরের প্রেম-নিবেদনে সারল্য আছে, প্রাণের পরশ আছে, সংবেদনশীলতার প্রাবল্য আছে, আর মহুয়ার বাহ্যিক শ্লেষাবৃত উত্তরে যুবতী-হৃদয়ের কোমলতা ও প্রাণের অতলস্পর্শী আকুতি আছে। এই জন্যই বলিতে হয়, ইহাদের প্রশ্নোত্তরে শুধু দুইটি মিলনোন্মুখ হৃদয়ের আত্মনিবেদন নাই, একটি গভীর অনুভূতির উলঙ্গ প্রকাশও রহিয়াছে। 'শিষ্ট-সাহিত্যে' প্রেমের এমন উলঙ্গ-প্রকাশ নাই বটে, তবে ভব্য-প্রকাশ আছে। নদ্যার ঠাকুরের প্রাণের আকুতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, আজিকার ভব্য-সাহিত্যের বিনানোকথার পরতে পরতে এই একই আকুতি কিভাবে অশরীরী অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কবি নজরুল ইসলামের গান হইতেই তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি :

"কেন কাঁদে পরাণ—
কি বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি॥
কাজল করি যারে রাখিনু আঁখিপাতে।
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু সাথে।
বুকে তায় মালা করি
রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি।
কেমনে সে উদাসীর মন মোহি॥"

ইহা হইতে দেখা যাইবে, 'লোক-সাহিত্যে'র পল্লী-কবির 'তুমি হও গহীন গাং আমি ডুইব্যা মরি' যে উৎস হইতে উদ্ভূত, 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র কবির কেন কাঁদে পরাণ,—কি বেদনায় কারে কহি' ঠিক সে উৎস হইতে উৎসারিত। পল্লী-কবির প্রাণ-প্রবাহ নির্ঝরিণীর স্রোতোধারায় আপন মনে প্রবাহিত, আর শিষ্ট-কবির প্রাণ-প্রবাহ ফোয়ারার মুখ দিয়া শতধারে উৎক্ষিপ্ত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, নজরুলের মুন্সীয়ানা পল্লী-কবিতে নাই এই মুন্সীয়ানার নামই শিল্প। এইখানেই 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র সহিত 'লোক-সাহিত্যে'র প্রধান ব্যবধান। লোক-সাহিত্যে প্রাণ আছে, হৃদয় আছে, অভিজ্ঞতা আছে, এমন কি বৈচিত্র্যও আছে, কিন্তু শিল্প নাই। উল্লেখ্যযোগ্য শিষ্ট-সাহিত্যে লোক-সাহিত্যের সমস্ত কিছু থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে, কিংবা অল্প বিস্তর থাকিতে পারে কিন্তু শিল্প বা মুন্সীয়ানা না থাকিলে শিল্প-সাহিত্য হয় না। প্রাণ বলুন, হৃদয় বলুন, অনুভূতি বলুন, অভিজ্ঞতা বলুন-সবই শিষ্ট-সাহিত্যে শিল্প মহিমায় মণ্ডিত হইয়া সচেতন মনের সজ্ঞান সাধনার পরিচয় দেয়, আর লোক-সাহিত্যে তাহার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। এতৎসত্ত্বেও লোক-সাহিত্য প্রাণবন্ততায় সজীব ও বনফুলের ন্যায় স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মনোহারী।

এতদ্ব্যতীত, 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র সহিত 'পল্লী-সাহিত্যে'র ব্যবধান আরও কতিপয় বিষয়ে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। শিষ্ট-সাহিত্যের জন্ম বুদ্ধিজীবী ভদ্র-সমাজের মস্তিষ্কে, রূপায়ণ কলে-তৈয়ারী কাগজের পৃষ্ঠায়, লালন-পালন মুদ্রাযন্ত্রের নোংরা প্রকোষ্ঠে, আর 'লোক-সাহিত্যে'র জন্ম জন-সমাজের হৃদয়ে, রূপায়ণ লোকের মুখে মুখে এবং লালন-পালন দেশের মানুষের পবিত্র স্মৃতির পরতে পরতে। তাই 'লোক-সাহিত্যে'র ক্ষেত্র দেশ-জোড়া, 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তবে 'লোকের মুখে জয়, লোকের মুখে ক্ষয়'—লোক-সাহিত্যে'র এই কথা 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র জন্য যেমন খাঁটি, 'লোক-সাহিত্যে'র জন্যও তেমন সত্য। উভয় সাহিত্যের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, উদ্ভব, স্থায়িত্ব ও বিলয় আছে বটে, তবে লোক-সাহিত্যের বহু বিষয় ও ভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং ভাষা সতত পরিবর্তনশীল বলিয়া জীবন্ত ও নিত্য নূতন। আর 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র বিষয়, ভাব ও ভাষা শিল্পের লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া আশু পরিবর্তন ঘটাইতে অসমর্থ বলিয়া, সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম এবং কিয়ৎকাল পরেই যাদুঘরের দর্শনীয়-সামগ্রীতে পরিণত হয়। এই অবস্থার হাত হইতে 'শিষ্ট-সাহিত্য'কে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই।

একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি, আমাদের 'লোক-সাহিত্যে'র ক্ষেত্র আমাদের দেশের জন-সমাজের মতোই বিরাট ও বিশাল। আমাদের দেশে কত রকমের লোক-সাহিত্য যে সৃষ্ট হইয়াছিল, হইয়াছে ও হইতেছে, আজ পর্যন্ত খুব অল্প লোকই তাহার সংবাদ রাখেন। তবে সুখের বিষয়, পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনে যে জ্ঞানানুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইয়াছে, তাহার কল্যাণে অল্পদিন হইতে আমাদের সাংস্কৃতিক-জীবনের এই বিশাল দিকে কাহারও কাহারও দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। আশা করা যায় অতঃপর লোক-সাহিত্যে'র সকল দিক ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইবে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের নানা বৈচিত্র্যও আমাদের কাছে ধরা দিবে। আজ পর্যন্ত যে-সমস্ত 'লোক-সাহিত্যে'র সন্ধান আমরা পাইয়াছি তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিম্নের কয়েকটি ভাগে লোক-সাহিত্যকে ভাগ করা যায়। আলোচনার সুবিধার জন্যও এই ভাগগুলির প্রয়োজন আছে।

ছড়া

'লোক-সাহিত্যে'র কথা বলিতে গেলে, সর্বাগ্রে 'ছড়া'র কথাই উল্লেখ করিতে হয়। ছড়াগুলি সমাজের বালসুলভ অপরিণত মনের সৃষ্টি। কিন্তু এইগুলি বালকের সৃষ্টি নহে। এজন্য ছড়ার ভাবের পরিণতি নাই, আছে শুধু বোবার ইঙ্গিত-ইশারার মতো নানা অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন ভাব, যেন কতগুলি রেখাচিত্রের সমাবেশ। উদাহরণস্বরূপ এই ছড়াটির উল্লেখ করিতেছি :

রৈদ্-রে রৈদ্ আনি।
চাঁদার মা পুতানী॥
চাঁদারে কাড়ি।
হাত ঘর বাড়ি।
সুইজ্জ উডের কন্নান্দি।
কদম গাছের তলাদি॥
কদম গাছর নাই ফুল।
চিচ্চিবাইয়্যা রৈদ্ তোল॥ (চট্টগ্রাম)

শীতের দিন, ছেলে-মেয়েদের রোদ পোহাইতে হইবে, অথচ রোদ উঠিতে দেরি আছে। সুতরাং 'রৈদ্ রে রৈদ্ আনি' বলিয়া সমবেত কণ্ঠে রোদকে আসিবার জন্য আহ্বান জানাইতে হয়। রোদকে ডাকিতে ডাকিতে হঠাৎ চাঁদের কথা মনে পড়ে। সে-ই যেন সূর্যকে রাতের আঁধারে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তাই, চাঁদকে 'পুতানী' বা 'পুতখাওনী' বলিয়া সমস্বরে গালি পাড়িতে হয়। শুধু পুতখাওনী বলিয়া চাঁদকে গালি পাড়িয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারা যাইতেছে না। চাঁদকে কাটিয়া সাত ঘরে বাঁটিয়া দিবার ভয়ও দেখানো হইতেছে। এমন কি, সূর্য না উঠিয়া আর লুকাইয়া থাকিতে পারে না ; তবে সূর্য কোনখান দিয়া উদিত হইবে, ইহাই ভাবনার বিষয়। তাহার উদিত হইবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে পত্র-পুষ্পহীন শীতকালীন কদম গাছের কথাই মনে পড়ে। কেননা, এই গাছের তলায় বসিয়াই শীতকালের রোদ পোহাইবার উপযুক্ত স্থান। তাই, কালবিলম্ব না করিয়া চিক্-চিক্ করিয়া বোদ তুলিবার জন্য সূর্য মামার আহ্বান আবশ্যক হইয়াছে।

এই ছড়ায় কত ছবিই না ভিড় জমাইয়াছে,—শীতকাল চন্দ্র, সূর্য, বণ্টন, পত্র-পুষ্পহীন কদম বৃক্ষ কত কিছুই। এইসব দিক হইতে ভাবিলে মনে হয় ছড়াগুলি লোক-সাহিত্যেব আদিম নিদর্শন। ভাব-পরিণতি ও চিত্রের দিক হইতে ছড়াগুলি যতই প্রাচীন হউক, ভাষার দিক হইতে এইগুলি চির পরিবর্তনশীল, এইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারেই নতুন। এই কারণে ছড়াগুলিকে শিশুর সহিত তুলনা করা যায়। শিশুর মত প্রাচীন ও শিশুর মত নবীন জগতে আর কিছুই নাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ববর্তী আদিম মানব-শিশু জন্মের পর যেমন ছিল, আজিকার সুসভ্য মানুষের শিশুও তেমনই আছে,—তাহার সেই অসহায় অবস্থা, সেই অজ্ঞানতা, সেই উলঙ্গ মূর্তি, কিছুরই পরিবর্তন ঘটে নাই, অথচ কালক্রমে তাহার ভাষায় পরিবর্তন ঘটিতেছে। ছড়াগুলিও অবিকল তাহাই। সেই আদিম কাল হইতে আজ পর্যন্ত শিশুগুলি যেমন জগতে এক সময়ে জন্মগ্রহণ করে নাই, ছড়াগুলিও তেমনই জগতে এক সময়ে বচিত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ সেই প্রাচীন ছড়াটির উল্লেখ করিতেছি :

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিনটি কন্যে দান॥
একটি কন্যে রাঁধেন বাড়েন একটি কন্যে খান।
আর একটি না রাগ ক'রে বাপের বাড়ি যান॥"

এই যে ছড়া, ইহাতে বর্ষার বৃষ্টিধারা, শিবু ঠাকুরের বিবাহ, নদীতে বান ডাকার দৃশ্য, এক বিবাহে তিন কন্যার দান, তাহার একটি 'সুয়ো', আর একটির 'দুয়ো' বনিবার কথা এবং তৃতীয়টির অভিমানিনী মূর্তিতে শ্বশুর বাড়ি ত্যাগ প্রভৃতি এতগুলি চিত্রের সমাবেশে কোন মহাকাব্য রচিত হইত কিনা বলা কঠিন হইলেও, একটি উপন্যাস, অন্ততঃ একটি চমৎকাব গল্প যে লিখিত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে আমাদের দেশের প্রাচীন রাজাদের সুয়ো-রাণী ও দুযো-রাণী রাখার প্রতি ইঙ্গিত যেমন মিলিতেছে, তেমনই বিবাহে একাধিক মেয়ের বা বোনের যৌতুক প্রাপ্তির মত আর একটি প্রাচীন রীতির সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে। গোপীচন্দ্রের গানে দেখা যায়, খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীব রাজা গোপীচন্দ্র অদুনাকে বিবাহ করিয়া তাহার ভগ্নী পদুনাকে যৌতুকস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। শিবু ঠাকুরও পিতার এক কন্যাকে বিবাহ কবিয়া সঙ্গে আরও দুই কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। অতএব,

ছড়াটি যে অতি প্রাচীন, সে-কথা বোধ হয় না বলিলেও চলে। তবে ইহার ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। আর একটি ছড়ায় দেখা যায় :

"আমি যাব গউড়
আনব সোনার মউর
বানাব চার কাচারী
যাব শ্বশুর বাড়ি॥"

গরীব জামাই নিশ্চয়ই শ্বশুর বাড়িতে আদর পায় নাই। তাই গৌড়ে গিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া চারিটি কাচারী-ঘর বাঁধিয়া বড়লোক হওয়ার পর শ্বশুর বাড়ি যাইবার কথা ভাবিতেছে। এই ছড়াটি গৌড়ে মুসলমানদের রাজধানী স্থাপিত হইয়া নগরীটির ধনৈশ্বর্যের কথা দেশে ছড়াইয়া পড়িবার আগে রচিত হয় নাই। কিংবা—

"ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।"

ছড়াটি বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বর্গীর আক্রমণ সংঘটিত হওয়ার সময় রচিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছড়া যে রচিত হইয়াছিল, তাহা ছড়ার আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

আরও দেখা যায়, ছড়ায় একটা ছন্দ আছে, কিন্তু রাগ-রাগিণী বা তাল-মানের বালাই নাই। প্রকৃতপক্ষে, ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দই বাংলার 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র মূল ছন্দ। এখন এই কথা আর না বলিলেও চলে। এই ছড়ার ছন্দে এক প্রকার মোহিনী-শক্তি আছে। দোলনায় শিশুকে শোয়াইয়া মা যখন ছড়া কাটিতে থাকে :

"ঘুম যারে দুধর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘুমথুন উডিলে বাছা দুধ দিয়ম মুই॥
ঘুম যারে দুধর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘুম যাইলে গড়াই দিয়ম সোনার বাজু মুই॥
ঘুম যারে কৈতর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘুমথুন উডিলে বাছা দানা দিয়ম মুই॥" (চট্টগ্রাম)

তখন মা শিশুকে দুধ, বাজুবন্দ ও দানা দিবার যে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে, তাহার কিছুই হয় তো ছেলে বুঝে না, কিন্তু তাহাতে শিশু যে, নির্বিঘ্নে দোলনায় ঘুমায় সে অভিজ্ঞতা জীবনে এখনও প্রত্যহ অর্জন করিতেছি।

এই যে আমাদের ছড়া, এইগুলির একটি চিরন্তন রসের দিক আছে। ছড়ার আলোচনায় তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সুবিখ্যাত 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধে ছড়ার এই আকর্ষণীয় দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যের আজ পর্যন্ত তাহার এই আলোচনা একটি অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

তিনি বলিযাছিলেন, আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়ই পরিবর্তনশীল বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান; দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়া ও কলা-

বিচার-শাস্ত্রের বাহিরে, মেঘ বিজ্ঞান ও শাস্ত্র-নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়-জগতে এবং মানব-জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলি স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা-বৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিত সাধনে স্বভাবতঃই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থ-বন্ধনশূন্যতা এবং চিত্র-বৈচিত্র্যবশতঃই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে, শিশু মনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র ধরিয়া রচিত হয় নাই।

হেঁয়ালি

ছড়া যদি প্রাচীন সমাজের অপরিণত মনের সৃষ্টি হয়, তবে 'হেঁয়ালি' সেই সমাজেরই পরিণত-মনের সৃষ্টি। বুদ্ধি-দীপ্তি, সৌন্দর্য-বোধ, রসিকতা, চিন্তাব উৎকর্ষ-সাধন, মননশীলতার পরিচয় দান, প্রতীক-ব্যবহারের প্রবণতা প্রভৃতিই হেঁয়ালির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এই দিক হইতে ভাবিলে স্বীকার করিতে হইবে, 'হেঁয়ালি'গুলি আদিম সমাজের সৃষ্টি হইতে পারে না ; কেননা আদিম বর্বর সমাজের সামাজিক ও ব্যক্তিগত মন এমন পরিণত বুদ্ধিপ্রসূত নহে। সুতরাং হেঁয়ালিগুলি সুসভ্য ও উন্নত সমাজ-মনের পরিচায়ক হইলেও এইগুলির প্রাচীনতার দাবী উপেক্ষণীয় নহে। বলা বাহুল্য, এখনও যে হেঁয়ালির সৃষ্টি হয় না, তাহা নহে। তাহার বেশির ভাগ আমাদের শিশু-মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ।

দেশ-বিদেশের সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক দেশেব প্রাচীন সাহিত্যে 'হেঁয়ালি' স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের 'স্ফিঙ্কস্' নামক রাক্ষসীর গল্প বহু বিদিত। এই রাক্ষসী লোককে প্রশ্ন করিত-'বাল্যে চতুষ্পদ, যৌবনে দ্বিপদ ও বার্ধক্যে ত্রিপদ—এমন জীবের নাম কি?" এই সমস্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া বহু লোক প্রাণ হারায়। পরিশেষে 'ইদীপুস' নামক এক জ্ঞানী ব্যক্তি এই জীব 'মানুষ', এই কথা বলিয়া রাক্ষসীকে হত্যা করিয়াছিল। হিন্দুদের ঋগ্বেদেও হেঁয়ালিব উদাহবণ দেখা যায়। বাংলা-সাহিত্যেও 'হেঁয়ালি'র উদাহরণ প্রচুর। হাজার বছর আগেব চর্যাপদে দেখিতে পাই :

> "দুলি দুহি পীঢ়া ধরন ন জাই।
> রুখেব তেন্তলী কুম্ভীরে খাই॥"

আধুনিক বাংলায

> কচ্ছপী দুহিয়া ভাঁড়ে ধরান যায় না।
> গাছের তেঁতুল (যত) কুমীবে (যে) খায়॥

শেখ ফয়জুল্লার গোরক্ষ-বিজয়েও এই শ্রেণীর 'হেঁয়ালি' আছে। কবি কঙ্কনের 'চন্ডীমঙ্গলে'ব শারী-শুক-সংবাদে যে-সমস্ত 'হেঁয়ালি' দেখা যায় তাহার একটি এইরূপ :

> "যোগী নয়, সন্ন্যাসী নয়, মাথায় হুতাশন।
> ছেলে নয়, পিলে নয়, ডাকে ঘন ঘন॥
> চোর নয়, ডাকাত নয়, বর্শা মারে বুকে।
> কন্যা নয়, পুত্র নয়, চুম খায় মুখে॥"

এই হেঁয়ালির উদ্দিষ্ট বস্তু 'হুকা' হইলেও কল্পনার বাহাদুরী আছে। চব্বিশ পরগণার একটি 'হেঁয়ালি'তে সাহিত্যিক-রসও জমিয়া উঠিয়াছে, যেমন :

"বন থেকে বেরুলেন টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।"

'আনারস'কে এমন সোনার টোপর পরিহিত টিয়া "বলিয়া কল্পনা করা সহজ নয়। ঠিক এই 'আনারসটি' চট্টগ্রামে বন-বিড়ালরূপে কল্পিত হইয়াছে। যে বিড়াল আবার অদ্ভুত-অতি অদ্ভুত ; যেমন—

"ঝাড়্খুন নিঅলিল্ ভোজা।
পাছাত্ লাঠি মাথাত্ বোঝা।।"

'হেঁয়ালি'গুলিকে আমরা 'ধাঁধা'ও বলিয়া থাকি। প্রকৃত বস্তুটিকে বুদ্ধি বলে, কল্পনার খেলায়, কথার মারপ্যাচে ঢাকিয়া দিয়া শ্রোতার দৃষ্টি-বিভ্রম, এমন কি, বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটানোই, এই 'ধাঁধা' বা 'হেঁয়ালি'গুলির মূল উদ্দেশ্য। গৃহের তৈজস-পত্র, প্রাকৃতিক ফল-ফুল, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি অসংখ্য বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া ধাঁধার সৃষ্টি হয়। শ্রোতার স্বাধীন বিশ্লেষণের ফলে কোন 'হেঁয়ালি'র গ্রন্থি উন্মোচন বা সমস্যা-সমাধান চলে না। তাহা করিলে গৃহীতও হয় না। বাঁধা-ধরা উত্তরটি শ্রোতার জানা না থাকিলে কোন ধাঁধার উত্তর দেওয়া যায় না।

প্রবাদ ও প্রবচন

প্রবাদ ও প্রবচনের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। সমাজ-জীবনেব সুদীঘ অভিজ্ঞতাব উপর ভিত্তি করিয়া শুক্তির বুকে মুক্তার ন্যায় সমাজেব মধ্য হইতেই এইগুলির উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই সকল দেশের সকল জাতির ভাষায় তাঁহাদের নিজ নিজ প্রবাদ ও প্রবচনগুলি স্থান পাইয়াছে। আমাদেব দেশেও আমাদের প্রবাদের স্থান প্রাচীন কাল হইতেই হইযাছে। চর্যাপদের "অপ্পন মাংসে হরিণা বৈরী", শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে "আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী" এবং কবিকঙ্কণে "হরিণ জগৎবৈরী আপনার মাংসে" রূপে দেখা দিয়াছে। এইরূপ দেশের কত প্রবাদ যে আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মুক্তার মত ছড়াইয়া রহিয়াছে আজও তাহার কোন হিসাব নিকাশ করা হয় নাই। জাতির বা সমাজজীবনেব সঞ্চিত অভিজ্ঞতা প্রবাদগুলির মতো এমন সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতা 'শিষ্ট-সাহিত্যে'র নাই বলিযাই বোধ হয, জাতিব সাহিত্যে এইগুলি এত সহজে প্রবেশাধিকাব লাভ করিয়াছিল।

'প্রবাদ' ও 'প্রবচনের' মধ্যে প্রভেদ আছে। উভয়েই সমাজ বা জাতির কিংবা ব্যক্তিবিশেষের জীবনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক সৃষ্টি হইলেও আকৃতি-প্রকৃতিতে উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রবাদগুলি আকারে অত্যন্তই ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, কোন 'প্রবাদ'ই দুই চরণের অধিক নহে। 'প্রবচন'গুলি প্রবাদের চেয়ে দীর্ঘতর এবং মূলতঃ ছন্দোবদ্ধ সৃষ্টি। 'প্রবাদে' ছন্দের অস্তিত্ব বা সম্ভাবনা একেবারে নাই এমন নহে, তবে ছন্দ না থাকিলে ক্ষতির কোন কারণও নাই। 'প্রবচন'গুলিতে কিন্তু ছন্দ না থাকিলে চলেই না। বিশেষতঃ প্রবচনগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি এবং তাঁহার জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধ সত্যের ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ। 'প্রবাদ'গুলির সহিত কখনও কোন ব্যক্তির সংস্রব থাকা অসম্ভব না হইলেও, সম্ভাবনা অতি

ক্ষীণ বলিয়া এইগুলি সমাজের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। 'প্রবচন'গুলি বোধ হয় সভ্য সমাজের প্রথম জীবন-দর্শন এবং 'প্রবাদ'গুলি ইহার প্রথম সামাজিক নীতি। বলাবাহুল্য, তখন এইগুলি একান্তই স্মৃতিনির্ভর হইয়া কালের সতর্ক-প্রহরীকে এড়াইয়া চলিয়াছিল। তাই আজও 'প্রবচন'গুলি হয় 'ডাক', না হয় 'খনা', না হয় 'রাবণের' নামে দেশে প্রচলিত এবং 'প্রবাদ'গুলি কোন ব্যক্তির নামে চলে না। ডাক, খনা বা রাবণ কোন অনৈতিহাসিক ব্যক্তি নহেন ; তবে তাঁহাদের ইতিহাস কোন শিলালিপি, তাল বা ভূর্জপত্রে লিখিত না হইয়া সমাজভুক্ত মানুষের স্মৃতির ফলকেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় এ-পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার 'প্রবাদ' সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ড: সুশীলকুমার দে মহাশয়ের 'বাংলা-প্রবাদ' নামক গ্রন্থ (১৩৫৯ বাংলা) তাহার একমাত্র নিদর্শন। 'প্রবচন' সম্বন্ধে আজ পযন্ত এমন কোন প্রামাণিক গ্রন্থ সঙ্কলিত হয় নাই। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে 'প্রবাদ' ও 'প্রবচন'গুলি অত্যন্ত কার্যকর ও উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি শ্লেষ, বক্রোক্তি ও উপদেশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। 'প্রবাদে'র মর্মার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা যখন বলি "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ" কিংবা "অতি লোভে তাঁতী নষ্ট" তখন আমরা যে 'চোব' বা 'তাঁতী' বনিবার ভয় করি তাহা নহে, বরং অতিরিক্ত কিছু করিবার ইচ্ছা হইলে, তাহা দমন করি। কিংবা যখন বলি—

"যম, জামাই, ভাগিনা,
এ তিন নয় আপনা।"

অথবা

"সাপ, শালা, জমিদার।
এ তিন নয় আপনার॥"

তখন আমরা যম, জামাই, ভাগিনেয়, শ্যালক ও জমিদাবের কৃতঘ্নতা সম্বন্ধে তাহাদের বুকে শ্লেষের বাণ বিদ্ধ করি। তখন তাহারা কাছে থাকিলে, নিশ্চয় তাহাদের কোন প্রতিনিধির নিমকহারামিব জন্য লজ্জায় তাহাদেব অধোমুখ হইতে হয়।

এই প্রসঙ্গে 'প্রবচন'গুলির কথাও বলা যাইতে পারে। 'প্রবচন'গুলিব বেশির ভাগ ডাক ও খনার নামে প্রচলিত। রাবণের নামে প্রচলিত প্রবচনের সংখ্যা খুব কম। সে নাকি গোয়ালা ছিল। 'ডাক' একশ্রেণীর তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাব নাম। 'ডাকার্ণব' নামক গ্রন্থের পদগুলি 'ডাকদের' বচনা হওয়া বিচিত্র নয়। ডাকেব বচনগুলি লোক-চরিত্র-ভিত্তিক ;

"নিযড় পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়া আউরে চায়॥
পর সম্ভাযে বাটে থেকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে॥"

'খনা'র বচন কিন্তু 'ডাকে'র বচন হইতে পৃথক। 'খনা' স্ত্রীলোক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার বচনগুলি প্রধানতঃ কৃষি ও ফলিত-জ্যোতিষ বিয়য়ক উপদেশ। তাহার দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি—

(ক) দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল॥

কার্তিকের উন জলে।
খনা বলে দুনো ফলে॥
অথবা
(খ) শূন্য কলসী শুকনো না।
শুক্‌নো ডালে ডাকে কা॥
যদি দেখ মাকুন্দ চোপা।
এক পাও না বাড়াও বাপা॥
খনা বলে এরেও ঠেলি।
যদি না দেখি সমুখে তেলি॥"

বলা বাহুল্য, গঠন-রীতি ও ভঙ্গীতে 'ডাক' ও 'খনা'র বচন 'ছড়া'-জাতীয় হইলেও, এইগুলি ছড়া নহে। ছড়ায় উপদেশ নাই, চিত্র আছে ; আর 'খনা' ও 'ডাকের' বচনে চিত্র নাই, উপদেশ আছে। 'প্রবাদ-প্রবচন' ও 'ছড়া' এই দিক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সৃষ্টি।

মন্ত্র-তন্ত্র

মন্ত্র-তন্ত্র লোক-সাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট বিভাগ। লোক-সাহিত্যের এই বিভাগ গুপ্ত-জ্ঞানের অন্তর্গত ও গুরু পরম্পরায় লব্ধ বলিয়া আমাদের মতো বৈষয়িক লোকের প্রবেশাধিকার ইহাতে একরূপ নাই বলিলেও চলে। তবে দেখিতে পাই, ইন্দ্রজাল বা মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাস আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে অতি ব্যাপক ও প্রাচীন। ইংরেজিতে magic বলে, ইহাও তাহাই। মুসলমানদেব নিকট ইহা 'যাদু' নামে পরিচিত। ঝাড়ফুঁক, মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি 'মন্ত্র-তন্ত্র' বা 'যাদুর প্রক্রিয়া। কবচ, মাদুলি ও তাবিজ 'মন্ত্র-তন্ত্রের' আর এক প্রকার অভিব্যক্তি। আমাদের দেশে অনেকটা অপ্রকাশ্যে এই সমস্তের ব্যবহার এখনও বহুল পরিমাণে চালু আছে। সাপের ওঝা, ভূতের ওজা, জীনপরীর মোল্লা— এখনও 'মন্ত্র-তন্ত্র' ও 'আসব' সারাইতে ডাকা হয়। বরিশাল ও খুলনার সুন্দরবন অঞ্চলে ফকীবেরা এখনও 'বাঘ-বন্দী'ব ছড়া বা মন্ত্র আউড়াইতে আউড়াইতে ব্যাঘ্র উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশ সাপের দেশ। এই দেশে প্রতি বৎসর বহু ব্যক্তি সর্প-দংশনে প্রাণ হারায। লোক সর্পদষ্ট হইলেই সাপের ওঝার খোঁজ করে। এই সাপেব ওঝার একটি মন্ত্র এইরূপ :

'হস্ত সারম গলা সারম আর সারম মুখ।
পেট পীঠ চরণ সারম আর সারম বুক॥
পেট পীঠ চরণ সারি মনসার বরে।
লক্ষ লক্ষ বাণ অমুকের কি করিতে পাবে॥
কাঙুরেব কামিক্ষি দেবী দিয়া গেল বর।
বালির বিন্দু-রাজা বলে অমুক হৈল অমর॥"

এই মন্ত্রে কামরুপের কামাক্ষী বা কামাখ্যা দেবীর বরের উল্লেখ আছে। এই দেবীই তন্ত্র-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া হিন্দুদের একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সুন্দরবনের মুসলমান ফকীরদের 'বাঘ-বন্দীর মন্ত্র' বা ছড়া অন্যরূপ। বাঘের মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাহারা যে-সমস্ত মন্ত্র আওড়াইয়া থাকে, তাহার একটি এইরূপ :

"আদি বন্ধম, অনাদি বন্ধম।
গাজী কালুর চোলায় বন্ধম।।
আমার গায়ে বাঘের খা।
মা ফাতেমার মাথা খা।।"

সুন্দরবনের বাঘ এই মন্ত্রে কাবু হয় কিনা কে বলিবে? কিন্তু, তাহারা যে দলবদ্ধ ফকিরের চীৎকার শুনিয়া পলাইয়া যায়, তাহার সংবাদ এই অঞ্চলের অনেকের কাছে পাওয়া যায়।

লোক গাথা

ইংরেজিতে যাহাকে Ballad বলে, আমরা বাংলায় তাহাকে "লোক-গাথা" বলি। উপ-মহাদেশে 'গাথা' অতি প্রাচীন লোক-সাহিত্য। এইগুলি মূলত কাহিনী-প্রধান সৃষ্টি, রস-প্রধান রচনা নহে। গীতিছন্দে এই গাথাগুলি রচিত। বাংলা পাঁচালী বা লাচারীর মতো গাথার সুর অনেকটা একঘেঁয়ে। গাথা উন্নত সভ্য-সমাজের সৃষ্টি বলিয়া এইগুলিতে শিল্পচাতুর্যের প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে যে-সমস্ত গাথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে 'ময়মনসিংহ-গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' ও 'নাথ-গীতিকা' প্রধান। 'নাথ-গীতিকাগুলি' এক সময়ে সমগ্র উপ-মহাদেশে প্রচলিত ছিল। পরলোকগত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এই সমস্ত 'গাথা' সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া বিশ্বের সপ্রশংস-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি এই 'গাথা'গুলির বিস্তৃত সাহিত্যিক আলোচনাও করিয়াছেন। নিম্নে 'নাথ-গীতিকা'য় রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তাঁহার রাণী অদুনা ও পদুনাব মর্মস্পর্শী বিলাপের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"না যাইও না যাইও রাজা দূব দেশান্তর।
কার লাগি বান্ধিলাম আমি শীতল মন্দিব ঘর।।
বান্ধিলাম বাংলা-ঘব নাহি পড়ে কালি।
এমন ব'সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাভুরালি।।
নিদের স্বপনে রাজার হইব দবশন।
পালঙ্কে ফেলাইব হাত নাহি প্রাণের ধন।।

লোক কথা

কথা ও গল্প বলার প্রবৃত্তি মানুষের একটি বিশিষ্ট প্রাচীন অভ্যাস। এই অভ্যাস বসে আমাদের দেশে যে সমস্ত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, রসবোধের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে 'ব্রতকথা', 'রূপকথা', 'উপকথা', 'পুরাকথা', 'শ্রুতিকথা', ও 'কেচ্ছা-কাহিনী' নামে অভিহিত করা হয়। 'ব্রতকথা', কেবল হিন্দু সমাজে, 'কেচ্ছা-কাহিনী' শুধু মুসলমান সমাজে এবং 'রূপকথা 'উপকথা', 'শ্রুতিকথা', 'পুরাকথা' উভয় সমাজে প্রচলিত আছে। 'লোক-কথা'র এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের দেশে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। আমরা লোক-সাহিত্যের এই বিভাগ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অবহিত। সুতরাং, এই বিভাগের কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা না করিয়া, অতি ক্ষুদ্র একটি কাহিনী বলিয়া শেষ করিতে চাই। কাহিনীটি এইরূপ :

কাক ও চড়ুই পাখী

"গেরস্ত ভাই, দাও ত আগুন, গড়ব
কাস্তে, খাবে গাই, দিবে দুধ, খাবে
কুকুর, হবে তাজা, মারবে মোষ,
লব শিং, খুড়ব মাটি, গড়ব ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট,—তবে
খাব চড়ুইর বুক।"

লোক-সঙ্গীত

'লোক-সঙ্গীত' আমাদের 'লোক-সাহিত্যের' একটি অঙ্গ। ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই সঙ্গীতগুলিতে 'সুরও' আছে, কথাও আছে, কিন্তু 'কালোয়াতি' নাই। হৃদয়ই এই গানগুলির জন্মস্থান, অনুভূতিই ইহাদের জনক। এইগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এককভাবেই গীত হয়। যন্ত্রের বাহুল্যও এইগুলিতে দেখা যায় না। সাধারণতঃ একতারা, দোতরা, সারিন্দা, ঢাক, ঢোল, কাঁসর, বাঁশী, গোপীযন্ত্র প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এককভাবে এই সমস্ত গানে ব্যবহৃত হয়। আমাদের এই 'লোক-সঙ্গীত'কে আমরা এই কয়ভাগে ভাগ করিতে পারি :

ক. প্রেম-সঙ্গীত : ভাটিয়ালী, ভাওইয়া, বারমাসী ;

খ নৃত্য-সঙ্গীত : ঝুমুর, ভাঁজোই, ঘাটু, লেটো ;

গ. সহেলা : যাবতীয় মেয়েলী-সঙ্গীত ;

ঘ. শ্রম-সঙ্গীত : সারি, বাইচ, ছাতপেটা, কর্মপ্রেরণার হুঙ্কার ;

ঙ. কৃষি-সঙ্গীত : জাগ, কার্তিকা, পুষালি ;

চ আনুষ্ঠানিক-সঙ্গীত : গম্ভীরা, গাজন, ভাদুই ;

ছ. পটুয়া-সঙ্গীত : দেবপট, গাজীপট ;

জ. শোক-সঙ্গীত : জাবী-গান, কান্না-গান ;

ঝ. ভক্তি-সঙ্গীত : শাক্ত সঙ্গীত, সোনাপীর, মানিকপীর বদরপীর, মাইজ-ভাণ্ডারী ;

ঞ তত্ত্ব-সঙ্গীত : বাউল, মুর্শিদা, মারফতী, দেহতত্ত্ব।

লোক-সঙ্গীতের এই যে এতগুলি ভাগ, বর্তমান আলোচনায় তাহার সম্যক পরিচয় দান সম্ভবপর না হইলেও, 'লোক-সাহিত্যের' এই বিশাল অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। নতুবা 'লোক-সাহিত্যের' ধারণা সুস্পষ্ট হইতে পারে না।

ক. প্রেম-সঙ্গীত

লোক-সঙ্গীতের মধ্যে 'প্রেম-সঙ্গীতের' কথাটি সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। কেননা, এই সঙ্গীতগুলিই লোক-সমাজে সর্বাধিক প্রিয় বলিয়া মনে হয়। হৃদয়ের অকুণ্ঠ আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। বিরহ, মিলন, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি যৌবনধর্মী অনুভূতির প্রেরণা এই সঙ্গীত-সৃষ্টির মূলে ক্রিয়া করিয়াছে।

প্রেম–সঙ্গীতগুলি প্রকৃতপক্ষে একটি যন্ত্রের সাহায্যে একক কণ্ঠে গীত সঙ্গীত। এইগুলি আমাদের কাছে 'ভাটিয়ালী', 'ভাওইয়া', 'বারমাসী', প্রভৃতি নামে পরিচিতি। অবসর সময়ে লোকচিত্ত বিনোদনের জন্যই এইগুলি গীত হয়। 'ভাটিয়ালী' একান্তই পূর্ববঙ্গের, 'ভাওইয়া' খাস উত্তর–বঙ্গের এবং 'বারমাসী' সর্ব–অঞ্চলের সঙ্গীত। এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে কেবল 'ভাওইয়া' গানের সহিত আমাদের পরিচয় নিবিড় নহে বলিয়া এইরূপ একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি :

"পরথম যৈবন কালে না হৈল বিয়া।
আর কতকাল রহিম্ ঘরে একাকিনী হৈয়া।।
রে বিধি নিদয়া।।
হাইলা পৈল্ মোর সোনার যৈবন মলেয়ার ঝড়ে।
মাও বাপ মোর হৈল বাদী না দিল্ পরের ঘরে।।
রে বিধি নিদয়া।।
বাপক্ না কও শরমে মুই মাওক্ না কও লাজে।
ধিকি ধিকি তুষির আগুন জ্বলেছে দেহির মাঝে।।
রে বিধি নিদয়া।।
পেট ফাটে তাও মুখ না ফাটে লাজ–শরমেব ডরে।
খুলিযা কোইলে মনেব কথা নিন্দা করে পরে।।
রে বিধি নিদয়া।।
এমন মন মোর করে বিধি, এমন মন মোব করে।
মনের মতন চেংড়া দেখি ধরিয়া পালাও দূরে।।
বে বিধি নিদযা।।
কহে কবে কলঙ্কিনী হানি নাইক মোর তাতে।
মনের সাথে কবিম্ কেলি পত নিযা সাথে।।
রে বিধি নিদয়া।।"

যৌবন অতিবাহিত অবস্থায় থাকিযা এই যুবতীর মনে যে প্রেমানল জ্বলিযাছিল, তাহা নিশ্চয তাহার মাতা-পিতার মুখে কলঙ্ক লেপন না করিয়া ছাড়ে নাই। এই সামাজিক দিক উপেক্ষা করিয়া একবার তাহার হৃদযেব দিকে তাকাইলে নিশ্চয় আমাদের করুণা না হইয়া পারে না। তখন আমরা বেশ অনুভব কবিতে পাবি যে, নাবী হৃদযের এই ভাব অনেকটা সার্বজনীন। নতুবা আমরা কখনও পূর্ববঙ্গের নারীর মুখে এই ভাবটি এমন করিয়া শুনিতে পাইতাম না—

"ফুল যদি হৈতারে বন্ধু,
আইতা ফুলের বেশে রে।
আমি ঝাইড়া বাইন্তাম বেণী আমার
ছাপাই রাইখ্তাম কেশে বে।
বিধি যদি দিত পাখা,
উইড়া যাইয়া দিতাম দেখা,
আমি উইড়া যাইতাম সোনার বন্ধুর দ্যাশে রে।।"

খ. নৃত্য-সঙ্গীত

লোক-সঙ্গীতে নৃত্য-সঙ্গীতের সংখ্যাও কম নয়। এই গানগুলিতে সুরের চেয়ে নাচের প্রাধান্য দেখা যায়। এইগুলিতে বাদ্যযন্ত্রের স্থানও গৌণ। নৃত্য-সঙ্গীতের মধ্যে 'ঝুমুর', 'ঘাটু', 'লেটো', 'ভাঁজোই' গানই উল্লেখযোগ্য। 'ঝুমুর', 'ভাঁজোই' ও 'লেটো' পশ্চিম-বঙ্গের গান। কবি নজরুলের সংস্রবে আসিয়া 'লেটো' এখন শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত, 'ভাঁজোই' বীরভূম অঞ্চলের মেয়েদের নৃত্যসহ গান। 'ঝুমুর' মূলতঃ বাঁকুড়া ও সাঁওতাল পরগণায় সমাদৃত। 'ঝুমুর' প্রকৃতপক্ষে সাঁওতালদের বর্ষা-সঙ্গীত। নিম্নে যে খাঁটি 'ঝুমুর' গানটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে :

"এসো কা বরখা বড়ী জোর।
ভীংজয় সোরে সোর—
এসো কা বরখা বড়ী জোর॥
রোপালী হম রোপা ধান।
বদরী গরজে আসমান॥
বনমে নাচত হৈ মোব।
এসো কা বরখা বডী জোর॥
খেত চাঈঢ় কিষাণ ঠাঢ়।
ভরল নদীকে দেখে বাঢ়।
অন্ন ধন ন হোবৈং থোর।
এসো কা বরখা বডী জোর॥"

গ. সহেলা

আমাদের দেশের মেযেদেব মধ্যে বহু প্রকারের গান করার রীতি এখনও বর্তমান। মেয়েদের এই সমবেত কণ্ঠের গানকে সহেলা বলে। এই গান বিবাহ, গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, খৎনা, কান ছেঁদানি প্রভৃতি উপলক্ষে মেযেদের দ্বারা গীত হয়। মেয়েই এই গানের গায়িকা ও মেয়েই এই গানের শ্রোত্রী। তাই এই গানের নাম সহেলা বা সখীদের মিলিত গান। চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত এমন একটি গান এইরূপ :

"সোনার নাপিতারে আঁআরো বাড়িত্ যাইবা।
সোনার নরৈং সোনার বাডি হোঁআরে করি নিবা॥
সোনার নাপিতাবে।
ভালো করি কামা নাপিত্
বাপের দুর্লভ্ পুত্রে।
চিয়ন্ করি কামা নাপিত
হুনর্ করি কামা নাপিত্
মায়ের দুর্লভ্ পুত্রে।
সোনার নাপিতারে।"

বিবাহের সময় নাপিত যখন বর কামাইতে আসে তখন এই জাতীয় গান গীত হয়। গানের তালে তালে সকলে মিলিয়া হাতে তালি বাজাইবার রীতিও কোথাও কোথাও দেখা যায়। হাততালিই এই গানের বাদ্য।

ঘ. শ্রম-সঙ্গীত

'লোক-সঙ্গীতে' অজস্র 'শ্রম-সঙ্গীতের' আলোচনাও উপেক্ষণীয় নহে। কাজ করিবার সময় শ্রম লাঘব করিবার জন্য কিংবা কাজে জোর ধরাইবার জন্য একজন গান ধরে এবং সকলে সমস্বরে গানের ধূয়াটি আওড়াইতে থাকে। শ্রম-সঙ্গীত এই কয় নামে পরিচিত, যথা—'সারি' বা 'সাইর' গান, 'বাইচ্যা' বা নৌকার বাইচ খেলার গান, 'ছাইত্যা' বা ছাতপেটার গান। এই গানগুলির অধিকাংশই সুরুচির পরিচায়ক নয়। এমন একটি গান এইরূপ :

ওরে ও রাইকিশোরী,
তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?
ঐ কাল জলে চান কবাব সই,
ও সইরে, ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করি।
তোর সনে মোব কথা ছিল কি ?
বেড়াই আমি তোমাব লাইগ্যা,
অন্নধারী হৈলাম সাথী তোমার লাইগ্যা ;
ঘুবছি আমি রাত্রি দিনে
করছ কেন ছল চাতুরি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?·

বলা বাহুল্য, শ্রমিকদের কাজে জোর ধরাইবার জন্য যে-গান কবা হয়, তার সাথে 'সারি', 'বাইচ্যা' বা 'ছাইত্যা' গানের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। এইগুলির কথাও অল্প, সুরও দমকা ! এই একটি নমুনা দেখুন :

"ওবে ও জোয়ান—
আরও জোবে—হেঁইও।
সাবাস জোয়ান--হেঁইও।
একটু আবও—হেঁইও।"

ঙ. কৃষি-সঙ্গীত

আমাদেব এই কৃষিপ্রধান দেশের 'লোক-সঙ্গীত' হইতে 'কৃষি-সঙ্গীত' বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের কৃষকেরা আজও যেমন উপেক্ষিত, তাহাদের গানও তেমন। কৃষকদের কর্ম অথবা অবসর সময়ে চাষাবাদকে কেন্দ্র করিয়া যে-সমস্ত গান গীত হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। কিন্তু আজিও পর্যাপ্ত পরিমাণে এই গান সংগৃহীত না হওয়ায়, আমরা ইহার অধিক সংবাদ রাখি না। এই কৃষি-সঙ্গীতের মধ্যে উত্তর-বঙ্গের 'জাগ' বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত দেশ জুড়িয়া 'কার্তিকা: ও 'পুষালি' গানের প্রচলনও আছে। রাত্রি জাগিয়া গান করা হয় বলিয়া উত্তর বঙ্গের 'জাগ' এই নামে পরিচিত হইয়াছে।

ইহা প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের, 'পুষালি' গান। পৌষমাসে সারা মাস ধরিয়া কৃষকেরা দিনান্তে দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া বেড়ায় এবং পৌষ-সংক্রান্তির দিন রাত জাগিয়া ভোজের উৎসব করে ও 'জাগ' গানের আসর জমায়। 'জাগ' গানে সোনাপীরের কাহিনী ও কৃষ্ণ-চৈতন্য আখ্যায়িকাও দেখা যায়।

কার্তিকা-গান কৃষকদের কার্তিক মাসের সঙ্গীত। ধান বুনার কাজ সারিয়া তাহারা প্রত্যেক দিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ধানের বাড়-বাড়তি লক্ষ্য করে। তখন বুনা ধানের কোন প্রকারের ক্ষতি হইতে দেখিলে দুঃখে তাহাদের বুক ফাটিয়া যায়। এই সময়ের একটি গান এইরূপ :

আরে রে বাবুই রে,
ক্ষেতের পাকনা ধান খাইলে।
উইড্যা উইড়্যা ধান খায়,
পইড়্যা পইড়্যা রং চায়,
সরাই নালের আগ বাসারে।
এক বাবুইরে ধলিয়া,
আর এক বাবুই কালিয়া
আর এক বাবুইর কপালে তিলক রে।
আরে রে বাবুই রে
ক্ষেতের পাকনা ধান খাইলে।"

'পুষালি-গান' পৌষ-পার্বণের উৎসব। ইহাই উত্তর-বঙ্গে 'জাগ' গানে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন এই গান অধিক শুনা যায়। এইদিন হিন্দুদের মধ্যে পিঠা-পুলি খাওয়ার রীতিও আছে। এই সময়েই কৃষক সংবৎসরের উপার্জন মাঠের ধান বাড়ির আঙিনায় পৌছাইয়া দিয়া কৃষাণ-বধূর জিম্মায় সোপর্দ করিয়া নিশ্চিত হ'তে চায়। কৃষাণ-বধূ সানন্দে তাহার জিম্মা বুঝিয়া লয়, বাড়ির আঙিনায় ধান মাড়ায় ও শুকায়। এমন সময় আঙিনায় বিছানো ধানে কাক বসিয়া যখন ধান খাইয়া লয়, আর কৃষক নীরবে দাওয়ায় বসিয়া আনমনে হুঁকা টানিতে থাকে, তখন কৃষাণ-বধূ গলায় ঝঙ্কার দিয়া গাহিয়া উঠে :

"ওরে, কাউয়া ধান খাইল রে।
আমার—খাওয়ার মানুষ আছেরে ভাই,
কামের মানুষ নাইরে।
ওরে, কাউয়া ধান খাইল রে।"

চ. অনুষ্ঠান-সঙ্গীত

আমাদের দেশের এক একটা অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করিয়া এই সঙ্গীতগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'ভাদুই', 'গাজন' ও 'গম্ভীরা'ই প্রধান। 'ভাদুই' ভাদ্র মাসের গীত ও 'গাজন' চৈত্র-সংক্রান্তিকে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের গান। 'গম্ভীরা' মালদহের গান। ইহা সারা বৈশাখ মাস ব্যাপিয়া গীত হয় এবং হিন্দু-মুসলমান সকলেই ইহাতে যোগদান করে। 'গম্ভীরা' প্রকৃতপক্ষে 'সাল-তামামী' গান, ভোলা (এখন, 'দাদা') বা শিবকে সুখ-দুঃখের নির্বিকার দর্শকরূপে

কল্পনা করিয়া জনসাধারণের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কাহিনী লইয়া এই গানগুলি বাঁধা হয়। এমন একটি গান এইরূপ :

"ও ভোলা--
বল্‌ব কি গান বাগানে নাই আম।
গাছে গাছে বেড়িয়া দেখ্‌ছি
নতুন-পুরাণ সব সমান।।
মনে মনে ভাব্‌ছি বৈসা,
কাজের কোনো পাইনা দিশা,
তেল ধান চাউলের দর খুব কশা,
ভুষার বেশী দাম।।
আর এক শুন কাহিনী,
ঠিক দুপুরে শিল আর পানি,
মাঠে হয় কিষাণ পেরেশানী
মরল ভোলা সব গহম।"

ছ. পটুয়া-সঙ্গীত

'পটুযা' মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গেব সঙ্গীত। পরে ইহা পূর্ববঙ্গেও চালু হইয়া থাকিবে। পশ্চিমবঙ্গেব পটুয়ারা এক শ্রেণীর হিন্দু চিত্রকব ; ইহাবা লৌকিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীর চিত্র আঁকিয়া গান গাহিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাহাদের এই গানের নাম 'পটুয়া-সঙ্গীত'। পূর্ববঙ্গেও এক শ্রেণীর পট বা চিত্র প্রস্তুত হয়, তাহাব নাম 'গাজীর পট'। গাজীর পট অবলম্বনেও গান রচিত হইযাছে।

জ. শোক-সঙ্গীত

সুখের ন্যায় শোকও মানব-জীবনের একটি প্রধান অনুভূতি। এই অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়াও আমাদের দেশে বহু গান রচিত হইয়াছে, কিন্তু সংগৃহীত হয় নাই। এই শ্রেণীর গানে 'জারী' ও 'কান্না' গানই প্রধান। আত্মীয়বিয়োগে আমাদের দেশে মেয়েরা গলা ছাড়িয়া বিনাইয়া বিনাইযা কাঁদে। এইগুলিই 'কান্না-গান'। পূববঙ্গের 'জারী-গান' চির প্রসিদ্ধ ; নৃত্যও ইহার একটি প্রধান সহচব। করুণ কারবালা-কাহিনীর বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া জারী-গান রচিত হয। ইহার একটি এইরূপ :

"চল চল, চল, সবে সমরখন্দে যাব।
এজিদে মারিয়া সবে সমুদ্রে ভাসাব।।
সাবাস, সাবাস, সাবাস ভাই,
জীও, জীও, জীও ভাই।
হানিফ বলে আয় মোর কোলে
জয়নাল বাছাধন।
ওই যে না পথে দিছেরে দুই ভাই

জোড়ের ভাই ইমাম হোসেন।
সেই না পথে যাব রে আমি,
করো আমার গোর কাফন॥
চল, চল, চল, সবে সমরখন্দে যাব।
এজিদে মারিয়া সবে সমুদ্রে ভাসাব॥"

ঝ. ভক্তি-সঙ্গীত

আমাদের দেশে ভক্তি-সঙ্গীতের সংখ্যাও কম নহে। শাক্ত-সঙ্গীত, সোনাপীর, বদরপীর প্রভৃতির গান, মানিকপীরের গান এবং ভাণ্ডারী-সংগীত প্রভৃতি ভক্তি-সঙ্গীতের অন্তর্গত। 'শাক্ত-সঙ্গীত' সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও অন্যান্য 'ভক্তি-সঙ্গীত' সংগৃহীত হয় নাই। 'বদর-সঙ্গীত' মাঝিমাল্লার গান। অধুনা এই গান একরূপ বিলুপ্ত। ইহার একটি এইরূপ :

"ওরে—নাইরে, নাইরে ডর।
আল্লা, নবী, পাঁচপীর, বদর বদর॥
ওরে—ঝড় তুফানে নাইরে ভয়।
সাম্‌নে চালাইলাম রে নাও।
সায়রে চালাইম নাও রে—
নাইরে, নাইরে, নাইরে, ডর।
আল্লা, নবী, পাঁচপীর, বদর বদর॥"

'ভাণ্ডারী-গান'গুলি চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার গ্রামের শাহ্ আহমদুল্লার দরগাহকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হয়। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের দশ তারিখে এই দরগাহে মেলা বসে ও গানগুলি নাচিয়া কুঁদিয়া তালি বাজাইয়া গাওয়া হয়। ইহাব একটি গান এইরূপ :

"গৌছল আজম মাইজ ভাণ্ডার।
বাতাস দেরে রাস্তারে খোদার।
হায় হায় করি যে ডাল ধরি,
সে ডাল ভাঙ্গি মাটিতে পড়ি,
ওরে ধূলত পড়ি গড়াগড়ি,
হৈল আমার জীবন খার॥"

ঞ. তত্ত্ব-সঙ্গীত

আমাদের 'তত্ত্ব-সঙ্গীত'গুলিও লোক-সঙ্গীতের অন্তর্গত। এইগুলি 'বাউল', 'মুর্শিদা', 'মারফতী', 'দেহতত্ত্ব' প্রভৃতি নামে আমাদের মধ্যে সুপরিচিত। আমাদের সমাজ-জীবনে নানা মত প্রচার ও প্রসারের ফলে যে একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটিয়াছে, এই গানগুলি তাহারই অভিব্যক্তি। লোক-সাধারণ নানা মত ও পথের ডামাডোলে বিভ্রান্ত না হইয়া যেন একটা সরল সহজ তত্ত্ব নিজেদের মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। ফলে, এই গানগুলির উৎপত্তি। এই গানগুলির সম্বন্ধে আমাদের অনেকেই অল্পবিস্তর অবহিত বলিয়া এইস্থানে ইহাদের কোন আলোচনা একরূপ অনাবশ্যক। তবুও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে পারি—

"মন তুমি কৃষি কার্য জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।'
কিংবা
"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেম্‌নে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনো-বেড়ি
দিতেম পাখীর পায়॥"

এই জাতীয় বহু গান এখন আমাদিগকে একতারার সুরে উদাস করে, বিবাগী বানায়।

উপসংহার

আমি উপসংহারে বলিতে চাই, আমাদের 'লোক-সাহিত্য' আমাদে" দেশের লোকের মতই উপেক্ষিত ও অনাদৃত। এতৎসত্ত্বেও, শিক্ষিত সমাজের 'শিষ্ট-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের আক্রমণ, এমন কি তাঁহাদের ব্যক্তিগত নাক-সিটকানি উপেক্ষা করিয়া আজ পর্যন্ত আমাদের 'লোক-সাহিত্য' জীবন্মৃত অবস্থায় হইলেও বাঁচিয়া বহিয়াছে। বোধ হইতেছে, এই অবস্থায় আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি আজ তাহাদের 'লোক-সাহিত্য' উদ্ধারের চেষ্টায় 'টেপ-রেকর্ডিং' হইতে আরম্ভ করিয়া যে-সমস্ত আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে, তাহার কথা না ভাবিয়াও বলিতে পাবি, আর কাল ক্ষয় না করিয়া আমাদেরও 'লোক-সাহিত্য' সংগ্রহে নামিয়া যাওয়া আবশ্যক। নতুবা, আমরা অচিরেই দেশের এমন এক সাংস্কৃতিক সম্পদ হারাইব, যাহার সন্ধান হাজার চেষ্টা করিলেও পাওয়া যাইবে না। আমি বিশ্বাস কবি, নূতন শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান- বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের মধ্যে যে সামাজিক বিবর্তন শুরু হইয়াছে, ইহার শেষ পবিণতি গ্রামীণ-সভ্যতার ধ্বংস ও শহুরে সভ্যতার ক্রমিক বিস্তার। এই অবস্থায় 'লোক-সাহিত্যে'র পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। তাই, 'লোক-সাহিত্যে'র পুনরুজ্জীবনের কথা না ভাবিয়া আমাদিগকে ইহা পুনরুদ্ধারের কথাই চিন্তা করা উচিত। বাংলার সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, মনো-বৈজ্ঞানিক, এমন কি, ঐতিহাসিক উপাদানও এই 'লোক-সাহিত্যে'র মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সত্যিকার ভাবে জাতিকে বুঝিতে ও জানিতে হইলে, আমাদের 'লোক-সাহিত্যে'র ব্যাপক উদ্ধার ও সম্যক্ সংরক্ষণ ব্যবস্থার আবশ্যক, যেন গভীর গবেষণার সাহায্যে নাড়ি-নক্ষত্রের পরিচয় লইতে পারা যায়।

এই যে 'লোক-সাহিত্য' সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক দিক,—ইহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিছক সাহিত্য বা রসের দিক হইতেও লোক-সাহিত্য উপেক্ষণীয় নহে। সুবিশাল ও সুবিস্তৃত 'লোক-সাহিত্যে'র অতি সামান্য অংশই এ-যাবৎ শিক্ষিত সমাজের গোচরীভূত হইয়াছে। ইহাতেই তাঁহারা লোক-সাহিত্যে'র সজীবতা সারল্য, সৌন্দর্য ও অনুভূতির গভীরতায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন। যে দিন এ-সাহিত্যে'র সকল দিক উদ্‌ঘাটিত হইবে, আশা করি সেই দিন ইহার বিপুল অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্যের সন্ধান লাভ করিয়া তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবেন। আমরা সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় সুদূব ভবিষ্যতের পথ-পানে চাহিয়া রহিলাম। "লোক সাহিত্য অমর হোক।"

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী

পূর্ব বাংলার লোক-সাহিত্য

পূর্ব বাংলার সমতলভূমি নদ-নদী-বিধৌত অঞ্চল। নদ-নদীগুলি ইহার প্রাণ-প্রবাহ্ শতধা বিভক্ত হইয়া দান করিয়াছে সতেজ সজীবতা, গড়িয়া তুলিয়াছে যোজনব্যাপী শ্যামল প্রান্তর, কুমুদ কহ্লার শতদল পরিশোভিত বিলঝিল। নদ-নদীগুলির বদৌলতে আমরা অন্তরে পাইয়াছি নম্র কমনীয়তা, ধর্ম-দর্শনের সহিত একটা দুর্দম তেজস্বিতা, দৃপ্ত-বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আর আত্মসম্মানবোধ, আত্মবিকাশের তীব্র আবেগ-অনুভূতি। নদ-নদীগুলির পীযূষ-প্রবাহে আমরা হইয়াছি প্রেমিক, নিঃস্বার্থ সেবাধর্মী, একান্ত গীতি-কাব্যপ্রবণ সরল স্বাভাবিক মনের অধিকারী ; ঐক্য ও সাম্য-সমন্বয় সাধনে মানবতার সক্রিয় আদর্শ ;—এক প্রাণ শত প্রাণে বিলাইয়া দিবার উদগ্র বাসনা ও কর্মপ্রচেষ্টায় অচল-অটল দরদী মনের সুন্দর আলেখ্য।

চির বিরহী নদ-নদীর কুল-কুল মুখরিত অবিরাম গতিবেগ আমাদের বিরহ বিধুর জীবন প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে করিয়াছে রসে আপ্লুত, ছন্দে লীলায়িত, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা ;—অসীমের অভিসারী।

ষড় ঋতুর লীলা বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য বিভাস এবং অন্তর প্রেরণা বাংলাদেশে যেমন হয় সম্যক্ বিকশিত ও কার্যকরী বিশ্বের কোথাও নয় তদ্রূপ। ষড় ঋতুর এই প্রভাব সহজ ভঙ্গিমায় স্থাবর জঙ্গম ও নদ-নদীর উপর পতিত হইয়া সকল ঐশ্বর্যসহ আমাদের মনের মণি-কোঠায় প্রবেশ করিয়া দিয়াছে মনের দুয়ার খুলিয়া, কোমল কঠোর শত ভাবের জন্ম, তীক্ষ্ণ ও গভীর অনুভূতি, জীবন ও জগতের দৃষ্টিভঙ্গীতে নিষ্কাম কর্মের দ্যোতনা, রূপায়নের বাস্তব প্রেরণা, উদ্ভাবনী কল্পনার মনোবল আর সত্য সুন্দর কল্যাণময় প্রকাশের বুদ্ধিকৌশল ; আমরা হইয়াছি নিখুঁত শিল্পী।

নদ-নদীর গতি প্রবাহে জাগিয়াছে আমাদের ইচ্ছা ও চলার বেগ। বাংলাদেশের জনসাধারণ চিরকাল বাস করিয়া আসিতেছে প্রকৃতির বুকে, পান করিতেছে প্রচুর রস। প্রকৃতি এমনিভাবে তাহার সকল ঐশ্বর্যসহ প্রাণের পরশ দিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে ওদের মনের সুকুমার বৃত্তি। ব্যক্তি মনের অভিব্যক্তি ছড়াইয়া পড়িতেছে সমাজ মনে। নিরক্ষর পল্লীবাসীর মানস উদ্যানে প্রস্ফুটিত হয় অযুত কুসুম ; রূপে-রসে-গন্ধ-মাধুর্যে অনুপম-মনোরম। বর্ষায় তাহাদের নিরুদ্ধ প্রেমের অন্তর্দাহ ক্রমে নব যৌবনের রঙীন স্বপ্নে, সুন্দরের সৃষ্টি উল্লাসে হইয়া উঠে চঞ্চল, মাতোয়ারা। তাহাদের মর্মবীণায় উঠে বিশ্ববিমোহন সুরের ঝংকার ; আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া দেয় গান আর গান ; সুরের কমল ভাসিয়া বেড়ায় কালের স্রোতে—এপারে সেপারে। সুখ-দুঃখ, মায়ামমতা, প্রেম-প্রীতি, বিরহ-বিচ্ছেদ, রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান, আশা-আকাঙ্ক্ষা আরও কত রঙ-বেরঙের পাপড়ি খুলিয়া দেয় ওদের মানস সরোবরের শতদল। বিশ্বের রূপপিয়াসী মধুপায়ী ভ্রমর তোলে অমিয় গুঞ্জন।

বাংলাদেশের প্রকৃতির প্রসাদাৎ আমরা বাহিরে পাইয়াছি ধ্বংসশীল বাস্তব প্রাচুর্যের মায়া-মোহ আর অন্তরে পাইয়াছি চিরমধুর শাশ্বত প্রেরণা।

আমাদের নিরক্ষর পল্লীবাসীরা বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে, চিত্ত বিনোদনের অবসরে কত কাল ধরিয়া যে জমাইয়াছে গানের আসর, রচনা করিয়াছে লোক-সাহিত্য, গড়িয়া তুলিয়াছে একটা সার্বজনীন কৃষ্টি (Folk culture) তাহার হদীস পাওয়া বড়ই মুশকিল। সুদূর প্রহেলিকাচ্ছন্ন নক্ষত্র নিচয় আমাদের জীবন পরিচালনের শত প্রয়োজনে কবে যে আমাদেরই ঘরে আসিয়া মৃৎপ্রদীপ রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কে জানে?

বৃহৎ বনানীর শ্যাম-সমারোহে ফুল-ফলের স্বাভাবিক অবদানে আমরা মুগ্ধ। কিন্তু কে কখন কবিল ইহার বীজ বপন, চারা রোপন, চারদিকে আলবাল রচনা করিয়া সরবরাহ করিল পানি আমবা কেহই রাখিনা তাহার খবর ; এতদ্ সম্বন্ধে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি না কোন কথা ; স্বভাবতই ইহার জন্ম। তেমনি লোক-সাহিত্যের সৃষ্টিতেও নাই কাহারো কোন প্রয়াস। মানব মনে তাহা আপনি জন্মিয়া আপনিই জাগাইতেছে দোলা, ফুটাইতেছে ফল, দান করিতেছে মধুর রস।

"আপন রচিত কাননের মাঝে
আপনি বহিল ফুটিয়া,
চির মুকুলিত আপনার পানে
পুষ্পকে রহিল চাহিয়া॥"

বাইরের লৌকিক ও প্রাকৃতিক জগতের অবিরাম কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে চলে মানবেব অন্তর্জগতে একটা গঠন কার্য। এই গঠন কার্যই দানা বাঁধিয়া উঠে সাহিত্য-সংস্কৃতিরূপে (Folk Literature and Folk Culture)। এই সাহিত্য-সংস্কৃতির গঠন কার্যকেই গ্রাম্য কবি ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া বানাইযাছেন নিত্য কালেব সামগ্রী। লোক-সাহিত্য (Unrecorded Literature) সেই নিত্যকালেব রচিত কুসুমাঞ্জলী আব অনন্ত কালের সহিত মানবাত্মার গোপন সুব সঙ্গাতব প্রকাশ (Expression of the hidden harmoney of the Soul)।

লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা বিষয়ে জানা যায়—অতীতের সংহত সমাজের মানুষ স্বকীয় জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতে,—স্নেহ-মমতায়, সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে, মানব-মানবীর স্বাভাবিক আকর্ষণে, আত্মার শাশ্বত প্রেরণায়, বিরহ-বিচ্ছেদের মর্মদাহে, আশা-আকাঙ্ক্ষায় বলিযাছে যে ছড়া, রূপকথা, গাহিয়াছে যে সঙ্গীত ইত্যাদি তাহাই হইল লোক-সাহিত্য। এই সাহিত্য ব্যষ্টি মনের সৃষ্টি হইয়াও শ্রুতি পরম্পরায় ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়াছে সমষ্টি মনের ব্যাপক সাধনায়।

লোক-সাহিত্য চিব সজীব ও চির সবল। কারণ, মানবজীবনের চিবন্তন চিন্তা স্রোতেব সহিত আছে ইহার স্বাভাবিক যোগসূত্র। ইহাব চির আচবিত অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের কারবার সম্ভূত স্মৃতি ও শ্রুতির নিদর্শন ; সামাজিক চিত্র। এই চিত্র মানব জাতির নিত্যকালের চাওয়া-পাওয়ার বিষয়বস্তু বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতেও থাকিয়া যায চিব উজ্জ্বল, চির-লোভনীয়।

বিশ্বের জাতিনিচয়ের লোক-সাহিত্যের ভাব ও বিষয়বস্তু এবং চিন্তাধারা পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, উহাদের মধ্যে আছে এক সর্বজনীন মানবীয় আবেদন। ইহারা কোনদিনই

আবদ্ধ নয় ভৌগোলিক সীমার গণ্ডীর মধ্যে। এরূপ হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে–বিশ্ব মানব জাতি একই আদিম মাতা–পিতার সন্তান (from the same blood) ; কালক্রমে বংশ বৃদ্ধির ফলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে নানা স্থানে, কিন্তু তাহাদের মূল সুরে ধ্বনিত হইতেছে ঐক্যের রাগিণী। স্থান–কাল–পাত্রভেদে মানব–মানবীয় স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের বিকাশে তারতম্য পরিলক্ষিত হইলেও ইহাদের মূল উৎস একই কেন্দ্রে আবদ্ধ। পক্ষান্তরে নানা চিন্তা ভাবনার মানব–মানবী উচ্চস্তরে আরোহণ করিলে তাহারা মিলিত হয় একই চিন্তার সমতল ক্ষেত্রে। এইভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে লোক–সাহিত্য বিশ্ব মানবের; ইহা কোন জাতি বিশেষের একচেটিয়া সম্পদ নয়। পরিবেশ প্রভাবে লোক–সাহিত্যের মধ্যে আঞ্চলিক প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও ইহাদের মূল–সুরের কোন অঙ্গহানি ঘটে নাই! বাংলাদেশের লোক–সাহিত্যের একটা সর্বজনস্বীকৃত বৈশিষ্ট্য আছে ; —আছে তাহাতে নারী প্রেমের মুক্তধারা বা স্বাধীন মতবাদ। এখানে যাহা কিছু রূপায়িত হইয়াছে, তাহাও পূর্ববর্তী সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া ধারণ করিয়াছে এক অপূর্ব রূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'জারী' বা কারবালার নৃশংস হত্যার আহাজারির কথা। মুসলমানেরা এই শোককাহিনী বর্ণনায় গ্রহণ করিয়াছে মণিপুরী ও সাঁওতালী নৃত্য এবং আরও অনেক কিছু। অর্থনৈতিক কারণে একদল মুসলমান সাপুড়ে বৃত্তি গ্রহণ করিয়া হইয়াছে 'বাদিয়া দল।" পটুয়া জাতির অনুকরণে একদল মুসলমান 'গাজী কালু'র পটধারী ব্যবসায়ী ইত্যাদি। ইসলামী তত্ত্ব–কথা, সাধন–ভজন, মারফতী বিদ্যা, পীর–মুরিদী প্রভৃতিতে লক্ষিত হয় ভিন্ন জাতির প্রভাব এবং রূপায়ন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সবকিছু আলোচনা অসম্ভব।

লোক–সাহিত্য আলোচনায় আমরা জানিতে পারি ব্যষ্টি ও সমষ্টি মনের ক্রম বিকাশের ধারা, ভাষার বিকাশ ও পরিবর্তন, সমাজের গঠন ও রূপ-প্রকৃতি, সমাজে নারী–পুরুষের স্থান ও অধিকার, জাতিত্বের মৌলিক উপাদান ও উৎপত্তি ; সংস্কৃতির বুনিয়াদ ও রূপান্তর, গণতন্ত্রের মৌলিক ভাবধারা ও ক্রম–বিকাশ। তারপর আরও লাভ করিযা থাকি নৃ–তত্ত্ব, ইতিহাসের মালমসলা ও সাহিত্যের উপকরণ-উপাদান। অনেকেই মনে করেন—বর্তমান বাংলা সাহিত্যের রোমান্স ও উপন্যাসের ধারা ছুটিয়া আসিয়াছে বাংলাদেশে—বিশেষতঃ পূর্ব–ময়মনসিংহের লোক–সাহিত্যের উৎসভূমি হইতে। একথা অতি সত্য যে, ময়মনসিংহের সম–সুশীতল ভূমিতেই উপ্ত হইয়াছিল লোক–সাহিত্যের চির–অমলিন, চির সুরভিত শতদল, মলুয়া-মহুয়া-চন্দ্রাবতী—আরও কত সুরভি কুসুম যেগুলো আকর্ষণ করিতেছে বিশ্বের নিমেষ–হারা নয়ন আর স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসামুখর বাণী।

লোক–সাহিত্যে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে মানুষের প্রাধান্যে ; নারী পুরুষের সহজ প্রেমের স্বাধীনতায়। লোক–সাহিত্যের সঙ্গীত শাখায় ফুটিয়াছে গুরু বা পীরবাদের তত্ত্বময় পুষ্প নিচয়; যাহাই হউক না কেন, লোক–সাহিত্যে যে যে অংশের সহিত একটি সর্বজনীন মানবিক আবেদন আছে, কেবল সেই সবই লোক–সাহিত্য পদ-বাচ্য হইতে পারে। যেগুলির এই আবেদন নাই বা যেগুলি নিগূঢ় রহস্যময় এবং মানব মনের রসবোধ ও সৌন্দর্যানুভূতি আর উন্নত জীবনের প্রেরণা জাগাইতে অক্ষম সেইগুলি সাহিত্য পদ-বাচ্য নহে।

লোক–সাহিত্যকে প্রধানত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এইসব প্রধান শ্রেণীর আছে আবার বহু উপশ্রেণী, শাখা–শ্রেণী। এই প্রবন্ধে প্রত্যেক শ্রেণীর আলোচনা সম্ভবপর নয়–মোটামুটি পরিচয় প্রদত্ত হইল। প্রধান শ্রেণীগুলি এই :

(১) ছড়া ; (২) ডাক ও খনার বচন ; (৩) ধাঁধা ও হেঁয়ালী ; (৪) প্রবাদ-প্রবচন ; (৫) গীতি ; (৬) গীতিকা ; (৭) রূপকথা-উপকথা ইত্যাদি।

ছড়া :

ছড়াগুলিকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (ক) শিশু ও ছেলে-মেয়ে বিষয়ক ছড়া এবং (খ) নানা বিষয়ক ছড়া। (ক) শিশুবিষয়ক ছড়া : লোক-সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে শিশু বিষয়ক ছড়াই আদিম ও প্রথম স্থানীয় ; যেহেতু শিশুই আদি মানব। মানব সভ্যতার কোন্ স্তরে আসিয়া যে রচিত হইয়াছিল এইসব ছড়া, কেহই দিতে পারে না ইহার সঠিক ইতিহাস। তবে একথা সত্য যে, শিশু ও ছেলে-মেয়ে বিষয়ক ছড়াগুলি অতি প্রাচীন ; স্বপ্নদর্শী অচেতন মনের সবল স্বাভাবিক প্রকাশ ; অকারণ আনন্দের সৃষ্টি এবং সমগ্র মানবগোষ্ঠীর লোক-সাহিত্যের বুনিয়াদ আর শিশু-সাহিত্যের রোমান্স। গিরি-কন্দরের ঘুমন্ত, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পর সে যেমন চারিপাশের বারিরাশি লইয়া পরিপুষ্ট হইয়া শত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতে চলিয়া যায় অনন্তের পথে, এ-ছড়াগুলিও তেমনি আদিকালের মানব-হৃদয়-কন্দর হইতে বর্হিগত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে আগত ও অনাগত শিশুরাজ্যে। এগুলি চির সুন্দর চির নতুন ও চির পুরাতন।

ছড়াগুলি শিশুদেব পক্ষে আনন্দের উৎস। এগুলির প্রকাশ নাই ভাবের সামঞ্জস্য, সুস্পষ্টতা ও পবিণতি, আছে কেবল দুর্লক্ষ্য আভাস ইংগিত, শব্দরূপের বৈচিত্র্য, শ্রুতিমধুর ধ্বনিব্যঞ্জনা, ছড়াব রাজ্যে বুদ্ধি ও বিচার অপেক্ষা রসের মূল্য বেশী ; যেহেতু শিশুরা বসানন্দেব অবদান। ছড়াগুলির বিচ্ছিন্ন ও সংগতিহীন ভাব সমন্বয়ে একটা অপূর্ব মনোরম ছবির সৃষ্টি কবিয়া ধ্বনিব্যঞ্জনাব সৃষ্টি করে সুরের দোলা—যাহা শিশুর পক্ষে একান্ত আনন্দবর্ধক ও শিশু মনের বিকাশের পক্ষে স্বতঃই অপরিহার্য। শিশু যে সব জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে সুপ্ত আছে ভবিষ্যতের শত সম্ভাবনা। স্বভাবের সক্রিয় প্রেরণায় শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি কৌতূহলপরায়ণ। এই সুপ্ত শক্তি বিকাশের পক্ষে ছড়াগুলি অমোঘ অস্ত্র। 'ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের আপনি অংকিত হইয়া আছে, ভাঙ্গাচোবা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়-বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কাল সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই দূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে ; আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অন্য বসে সজীব হইয়া উঠিতেছে।" (আশুতোষ ভট্টাচার্য)

শিশু বিষয়ক ছড়াগুলিকে আমরা আবার (ক) গোসল করাইবার ছড়া ; (খ) দুধ খাওয়ানোর ছড়া ; (গ) ঘুম পাড়াইবার ছড়া ; (ঘ) শিশুকে সান্ত্বনা প্রদান ও আনন্দ বর্ধনের ছড়া প্রভৃতি অনেক ভাগ কবিতে পারি।

গোসল করাইবার ছড়া : শিশুকে গোসল দিবার সময মা বা মাতৃস্থানীযরা নানা ছড়া আওড়াইয়া শিশুর গায়ে পানি দিয়া থাকেন।

(১)

আমার আবু গোসল করে সোনার খাটে বইয়া।
আবুর নানী চাইয়া রইছে দুধের বাটি লইয়া॥

আবুর গোসল হইয়া গেছে,
আপদ বালাই দূরে গেছে;
গাঙের পানি গাঙে গেছে,
আবুর শইল (শরীর) শুকাইয়া গেছে :
—জিও জিঁও জিঁও

(২)

হাবুৎ হুবুৎ গোসল করে আমার যাদু মণি।
হাত নাড়াইয়া পাও নাড়াইয়া কতই টানাটুনি॥
গোসল করে হাস্‌সিয়া
পানির উপুর ভাস্‌সিয়া
বেঙা-বেঙী কান্‌দিয়া মরে আবুর গোসল দেখ্‌খিয়া॥

দুধ খাওয়ানোর ছড়া :

(১)

আমার আবু টুকটুক
দুধ খায় ঢুক ঢুক।
এইত আবু খাইল দুধ
আচ্ছা বেটা বাপের পুত
সব দুধ খাইল
পেট তার ভর্‌ল॥

(২)

কা-কা কা কাকের ছা
ওরে খোকন দুধ খা।
খোকন আমার পেটের ছাওয়াল চাঁদপানা মুখ।
গাল বাইয়া দুধ পড়ে টুপ্‌-টুপ্‌ টুপ্‌।

ঘুম পাড়াইবাব ছড়া বা গান :

(১)

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি আমার বাড়ীত যাইও।
বাও বাতাসে ঘুম আনিয়া মণিব চোখে দিও॥
আয় ঘুম, ঘুম আয় সকল আবাম লইয়া।
ঘুমের বেসাত দিয়ে যাও মণির চোখে বইয়া॥
আয়রে ঘুম, ঘুম-ঘুমানি শীগ্‌ঘির করইয়া আয়।
বন-ভালুকের বাচ্চা আমার শুইয়া নিদ্রা যায়॥

(২)

আমার আবু ঘুমায় রে কানা বাদুরের ছাও।
বাদুর গেছে মধু খাইত শুইয়া নিদ্রা যাও॥

আমার আবু ঘুমায়রে থালের কচু খাইয়া॥
দুইডা ঢুপী মর্ইয়া রইছে আবুর নিশুন লইয়া॥
আবুর নানা সদাগর আত্তি কিন্নিয়া দিব॥
বাইস্যা মাস জলকৌষ লইয়া
নাইওর আইয়্যা নিব॥

শিশুর আনন্দ ও সাহস বর্ধনের ছড়া :

ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনে আনন্দের প্রভাব অপরিসীম। যে ব্যক্তি বা জাতি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে শিখে নাই বা আনন্দ প্রকাশ করিতে জানে না, সে ব্যক্তি বা জাতি স্থবির। শিশুর আনন্দ বর্ধন ও প্রকাশের নিমিত্ত বিবিধ ছড়া আছে :

(১)

আমার যাদু বীরের বেটা বন ভালুকের ছাও।
ঢাল–তল্ওয়ার লইয়া বাছা বাঘ মারিতে যাও॥
কিসের ডর, কিসের ভয়, কিসের আতাপাতা।
বাঘ মাবইয়া আইলে মাথয় ধরবাম সোনার ছাতা॥
ছাওযাল যায়রে বাঘ মারিতে ঢাল তল্ওয়ার লইয়া॥
মা–মসি চাইয়া হাসে মুখে কাপড় দিয়া॥

(২)

হেছ্কি লো হেছ্কি।
কই গেছলে?
ঢাকা গেছলাম।
ধান কেমন?
ছড়া ছড়া।
চাউল কেমন?
দুধে ভরা।
শাড়ি কেমন? বিলক্ষণ
কইন্যার কমর চিক্কণ।

ভাই–বোন এক বৃন্তের ফুল। একের অভাবে অন্যেব সৌন্দর্য ও আনন্দ ফুটিয়া উঠে না ; মনের সম্যক বিকাশ হয় না। ভাইবোনের কি অপরাপব ছেলেমেয়ের সমবেত খেলায বিকাশ পায় ওদের সামাজিক গুণ।

বড় বোন মাতৃবুকের দবদ লইয়া ছোট শিশু ভাইটির সহিত আমোদ করিবার উদ্দেশে তাহাকে পিঠে লইযা নানা তালে হাঁটিতে হাঁটিতে বলে :

ঘুঙ্গি লো ঘুঙ্গি, কই যাস্?
মামার বাড়ী।
ক্যারে যাস?
আন্ব আত্তি (হাতি)।

মারব লাথি।
আন্‌ব ঘোড়া।
বেশ বেশ, দিব দৌড়।

বোন একটু দৌড় দেয় আর ভাইটি খল্ খল্ করিয়া হাসে। বোনের আনন্দ আর ধরে না।

বোন আবার বলিয়া উঠে :

(২)

ঘুঙ্গি লো ঘুঙ্গি।
কি লো ঘুঙ্গি।
দাও দে !
দাও ক্যারে ?
বাঁশ কাটতাম।
বাঁশ ক্যারে ?
ঘর তুল্‌তাম।
ঘর ক্যারে ?
বুড়ী থাক্‌ত।
বুড়ী ক্যারে ?
হুতা কাটত ?
হুতা ক্যারে ?
কাপড় বুনত।
কাপড় ক্যারে ?
পিন্‌ত।
পিন্‌ত ক্যারে ?
কলা পাতা পিন্‌দিয়া থাকব কদ্দিন।

এই ছড়ার ভিতর দিয়া বোন তাহার ছোট ভাইটিকে আদিম যুগের মানুষের গাছের বাকল বা পাতা পরিধানের অবস্থা হইতে সুতাকাটা ও কাপড় বুনিবার কথা জানাইয়া দিল।

বোনের মনে কত বাসনা ঘুমাইয়া আছে। সে তাহার শিশু ভাইটিকে হাঁটা শিখাইবে। তাহার বীরত্ব জাগাইয়া তুলিবে; বোনের বাসনা চরিতার্থ হইবে। বোন বলে :

(১)

আমার ভাই হাঁটে রে সোনার নোপুর পায়।
হাঁটতে হাঁটতে ভাইটি আমার রাজ্যের দূর যায়॥
আমার ভাই হাঁটে রে টাপুর-টুপুর পায়।
এই উড়ে, এই পড়ে দুঃখু নাহি পায়॥
ভাই আইব বেড়াইয়া,
দুধ দিয়াম জুড়াইয়া
ভাই আইব দৌড়াইয়া ;

ভাত দিয়াম বাড়ইয়া।
দুধভাত খাইয়া ধুম।
আচ্ছা কর্ইয়া দিব ঘুম॥

(২)

ভাই যায় যুদ্ধে
ওরে তোরা পথ দে।
তল্‌ওয়ার হাতে দে॥
তার মত জোরওয়ার।
নাই কেউ নাই আর।
এই উড়ে ঝাণ্ডা।
দুশ্‌মন ঠাণ্ডা॥

ছেলে-মেয়েদের একত্র খেলার ছড়া :

প্রথমত ছেলে-মেয়েরা একত্র খেলা করিয়া থাকে। এই খেলার মধ্যে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ভাব ও বিষয় জড়িত আছে। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগরিত হইলে তাহারা পৃথক ভাবে খেলা করিয়া থাকে এবং বিবিধ ছড়াও আওড়াইয়া থাকে। মেয়েদের খেলায় মাতৃত্ব ও গিন্নিপনা এবং ছেলেদের খেলায় বীরত্ব আর বহির্জগতের বিবিধ কার্যকলাপ প্রকাশ পাইয়া থাকে :

(১)

ইছন বিছন দবগা বিছন।
উড উড বৌ গো,
মোমের ছাতি ধরগো,
মোমের ছাতি উভরা,
কাল দিয়া ধর দু'ঘরা।
এলপাত বেলপাত,
তুল্‌লিয়া নেও গা সোনায় হাত।

(২)

চাপিয়া চুপিলা
ঘন-ঘন মাজিলা।
শালের হুক্কা নলের বাঁশি।
নল ঘুরাইতে একাদশী।
একা নলের বেঁকা ফুল,
কে কে যাইবে গাঙের কূল।
গাঙের কূলে উঠছে পানি।
ভাই-এ বোনে টানাটানি॥

মেয়েদের পৃথক খেলার ছড়া :

(১)

আয়রে পুলাপুঁড়ি ফুল টুকানিত যাই।
ফুলের মালা গলায় দিয়া মামার বাড়ীত যাই॥
যেম্‌নি গেলাম ফুল টুকাইতে এমনি অইল বিয়া
পরের পুতে নিত আইছে ঢোলে বাড়ি দিয়া।
ঢোল বাজে টেনর টেনর শানাই বাজে রইয়া॥

(২)

তারামণি বারা ভানে ঢেকি উডে না
দুইখ্যার মা চাইয়া রইছে জামাই আইয়ে না।
আইব জামাই নিব ঝি
মার পরাণে কইব কি।
মায় কান্দে ভইনে কান্দে গলায় গলায় দিয়া।
পানিত কান্দে পানিকাউড়ি (পানকৌড়ি) শুকনায় কান্দে টিয়া॥

ছেলেদের পৃথক লেখার ছড়া :

ছেলেদের পৃথক খেলার মধ্যে হাডুডুডু খুব বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন অপরাপর খেলা এবং বিবিধ ছড়াও আছে :

(১)

উতুরী ধুতুরী কৈতরী ভাজা
ভাংনা মাছে ধরছে খাজা।
ভাংনা মাছে ঘাড় তেল
ধুইতে ধুইতে পরাণ গেল।
ছি ধর কটরা ধর।
বাইন্যা বাড়ির পুলা ধর।
পুলার আতে বলার চাক।
ওরে পুলা বাপ ডাক।

অনেক সময় ছেলেরা বড়শি দিয়া মাছ ধরিতে গিয়া বড়শি ফেলিয়া বলে।

ধর ধর ধামাল্যা ধর
যেই না জাগায় মাছের ঘর
হেইখান গিয়া বড়শি পড়।
ধর ধর ধামাল্যা ধর
সিঙ্গে ধর মাগুরে ধর
কই–এ লইয়া উড়া কর।
আমার বড়শিতে হবরী কলা
টক্কাত দিয়া গিল্যা ফালা।

একটা মাছ ধরিলে খালইতে রাখিয়া বলে :

ভর গণ্ডা ভর
এক চুপড়া ভর, দুই চুপড়া ভর।
বাড়ী যাইবার পথ কর
পাড়া পড়শির আশা কর।

নীচের ছড়াটিতে মা-বাবার অন্তর্নিহিত আশার বাণী ছেলেদের আনন্দানুভূতিতে প্রকাশ পাইয়াছে :

কামার ভাই
দাও চাই।
দাও ক্যা?
কাটতাম ঘাস।
ঘাস ক্যা?
খাইত গাই।
খাইত ক্যা?
দিত দুধ।
দুধ ক্যা?
খাইত পুতু।
খাইত ক্যা?
অইছে পুতু
খাইব দুধু
ডাকব বাপ
তবে যাইব মনের তাপ॥

এইরূপ ছেলেমেয়ে বিষয়ক বহু ছড়া পল্লীর আনাচে কানাচে সংগৃহীত হইবার প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতেছে।

নানা বিষয়ক ছড়ার মধ্যে মেয়েলী বা গিন্নিপনা বিষয়ক ছড়া ; নৈগর্সিক ছড়া ; ঐতিহাসিক ছড়া ; রূপকথা-উপকথার ছড়া ; নারী-পুরুষের চরিত্র বিষয়ক ছড়া ; ঝাড়া ফুঁকার ছড়া ; সামাজিক নীতি ও প্রতিক্রিয়ামূলক ছড়া ; কৃষি বিষয়ক ছড়া ; হাস্য-রসের ছড়া, বিবিধ ব্রত ও সিন্নির ছড়া (মঙ্গল ছড়া), গোরক্ষনাথের ছড়া প্রভৃতি প্রধান। এখানে নানা বিষয়ক ছড়ার দুই-একটি প্রদান করিলাম।

কৃষকেরা গরু হালে অভ্যস্ত করিবার সময় বলিয়া থাকে :

সইল, সইল সইল।
সইল কান্দে লইল ভার
দুঃখু নাই ওর বেশ আর।
সোনার লাঙল রূপাব ফাল
বাঘে মইষে জুড়ছি হাল।
হালের বেলা হাল
মই-এর বেলা জোড় ফাল।

তর মা আছিল কানি
সারাদিন হাল মারানি।
তর বাপ আছিল গড়ইয়া।
চাষা–এ খাইছিল পুড়ইয়া
আইল খাইক্যা হকুনী চার।
গড়ইয়া ঢিলার বুক খোয়াইয়া খায়।
হাজী গেল গাজীপুর
ক্ষেত অইল কাম সিন্দুর।
সইল, সইল, সইল॥

একটি হাস্য রসের ছড়া। এক বুড়া তাহার বুড়ীকে মারিয়াছে। বুড়ী মাতব্বরদের কাছে নালিশ করিতেছে :

বুড়া আমায় মারিছে।
আঙ্গুল আমার কাটিছে।
কাটা আঙ্গুলে আমার আংটি পরাইছে।
তোম্‌রা হাস্য না গো বাপুরা, বুড়া আমায় মারিছে॥
বুড়া আমায় মারিছে।
হাত আমার ভাঙ্গিছে।
দেখ আমার ভাঙ্গা হাতে চুড়ি পরাইছে।
তোম্‌রা হাস্য না গো . আমায় মারিছে.।
বুড়া আমায় মাবিছে।
পাও আমার ভাঙ্গিছে।
দেখ আমার ভাঙ্গা পায়ে নূপুর পরাইছে।
তোমরা. ... আমায় মারিছে।
বুড়া আমায় মাবিছে।
কোমর আমার ভাঙ্গিছে।
ভাঙ্গা কোমরে আমার বিছা পরাইছে॥
তোমরা... ... আমায় মারিছে॥
বুড়া আমায় মারিছে
চুল আমার কাটিছে।
কাটা চুলে দেখ আমার ঝুমকা পরাইছে॥
তোমরা... ... আমায় মারিছে॥
বুড়া আমায় মারিছে।
গলা আমার কাটিছে।
দেখ আমার কাটা গলায় হার পরাইছে।
তোমরা ... . আমায় মারিছে॥

এই সব নালিশের পর বুড়ী বাপের বাড়ী রওয়ানা হইলে বুড়া বলে :

আম ধরে ঝুঁকা ঝুঁকা

তেঁতুল ধরে বেঁকা।
দেশের বন্ধু বৈদেশ গেলে
আর না অইব দেখা॥
আমলি পাতা চিরল চিরল
বিন্না পাতা সই।
রঙ্গে রঙ্গে হাঙ্গা বইছ
অখন যাইবা কই॥

বুড়ী আবার বলে :

ছম্ ছম্ বাতেনা
হাতে কেন লাগেনা।
হাঙ্গা বইছি রঙ্গে
ভাত খাইব টেংগে॥

ছেলে–মেয়েরা বুড়াবুড়ী সাজিয়া এই ছড়ার অভিনয় দ্বারা বেশ আমোদ করিয়া থাকে

ধাঁধা ও হেঁয়ালী :

লোক–সাহিত্যে ধাঁধা ও হেঁয়ালীসমূহ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এগুলো বিশেষ বুদ্ধি ও মনোবিকাশের পরিচায়ক। ধাঁধা ও হেঁয়ালীর উৎপত্তি কালে মানব সমাজ বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিবার নানা কারণ আছে ; বুদ্ধিমান মাত্রই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মানবের মনোবিকাশ ও জ্ঞান বুদ্ধির পক্ষে ধাঁধা ও হেঁয়ালীসমূহ অমোঘ অস্ত্র। ধাঁধার পূর্ব নির্দিষ্ট উত্তর থাকে ; হেঁয়ালী গুলোর উত্তর না–ও দিতে পারে। ধাঁধা ও হেঁয়ালীতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। এই দুইটি শব্দ প্রায় সমার্থক। পল্লী গ্রামে এখনো বিবাহ মজলিসে বরপক্ষ ও কনে পক্ষের মধ্যে বহু ধাঁধা ও হেঁয়ালীর প্রচলন দেখা যায়। এগুলোকে “শিলোক পাঠ” বলে। ধাঁধা বা হেঁয়ালী সমূহের অর্থ এক হইলেও বিভিন্ন অঞ্চলে বা দেশে ইহার গঠনের বহু তারতম্য পরিলক্ষিত হয় ; পাঠান্তরও বহু আছে। এই সময়ের মধ্যে সমাজ চিত্রও আছে।

ধাঁধা :

(১)

চোখে চোখে রাখে মোরে পুরুষ রমণী।
সকলের শেষে মোর আছেন জননী॥
—চশমা

(২)

ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি,
মুখ করছ কালা।
ঠেলেঠুলে দিলে
তোমারও ভালা আমারও ভালা॥
—হাতে চুড়ি পরানো

হেঁয়ালী :

সাত অক্ষরে নাম তার জাতে কর্মকার।
ডানে বামে পড়ে যাও এক নাম যার।
বল দেখি নাম তার সুবোধ সুজন,
গরু হইয়া ঘাস খায়, না পারে যে জন।
—রমা কান্ত কামার

সিন্ধু বিন্দু দড় করি
বাণ দ্বিগুণ করি ১
দেখ সখী একত্র করিয়া।
নিদয় নিঠুর হরি
ছাড়িয়া এ মধুপুরী ১=৮০=আশি।
চলে গেল হেন কথা কইয়া॥
মণি ত্রিগুণ করি
বেদে মিশাইয়া পুরী
লও সখী একত্র করিয়া।
আমি নারী অবলা
বিধি যদি করে ভালা =২০=বিষ
গ্রাসিব-বাণ গুছাইয়া

প্রবাদ-প্রবচন (Proverbs and Wise sayings) :

প্রবাদ-প্রবচনগুলি অতি প্রাচীন। বেদেও প্রবাদের ব্যবহার আছে। সক্রেটিস প্রবাদ সংগ্রহের প্রথম ব্যক্তি। প্রবাদগুলি রসময বাক্যেব শাসনযন্ত্র। এইগুলির ব্যবহারে বেশ রসের সৃষ্টি হয় এবং সমাজ শাসনের কাজে লাগে। প্রবাদসমূহ প্রাচীন হইলেও নতুন। কারণ প্রাচীন ভাবপ্রকাশে যেমন করিত সাহায্য, বর্তমান ভাবপ্রকাশে ঠিক তেমনি করিয়া থাকে পোষণ। প্রবাদের যেগুলি রসসিক্ত হইয়াও গভীর উপদেশ ও তত্ত্বপূর্ণ সেইগুলি প্রবচন। প্রবাদের খেলা সমাজ শাসনে আব প্রবচনেব লীলা জীবন, জগৎ ও পরকাল ব্যাপিয়া প্রকটিত। প্রবাদগুলি ভাষার অলঙ্কাব।

প্রবাদ :

(ক) গাঁযে মানে না আপনি মোড়ল
(খ) মায়ের নাম কেতরী বান্দী
পুতের নাম সুলতান খাঁ।
(গ) বাপ নাই ঘর,
হাত পুত মড়ল।
(ঘ) হউরী পিন্দে চেরা তেনা,
বউ-য় পিন্ধে ঢাকাই শাড়ী।
(ঙ) উড়ে উঠ্যা কত্তার ডর।

প্রবচন :

(ক) যথা ধর্ম তথা জয়।
(খ) পাপে বাপ ছাড়ে না।
(গ) পরের ভালায় নিজের ভালা।
(ঘ) সেবায় সেবায় সেবা মিলে।
(ঙ) সাধনায় মিলে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।

গীতি-গীতিকা (Folk songs and Ballads) :

নদীর কল্লোল, পবনের স্বপ্ন, ঝরণার লাস্যনিক্কন, বন-বিহঙ্গের ললিত গীতি প্রভৃতির ঐকতান সভ্যতার কোন্ স্তরে আসিয়া যে মানুষের মনোভাবের দিয়াছে বাণী-রূপ, ফুটাইয়া তুলিয়াছে সুরের কমল, ভাসাইয়া দিয়াছে অনন্তকাল স্রোতে তাহা আমাদের অজ্ঞাত। আমরা কেবল সুর-সোহাগে তন্ময়। কাল স্রোতে ভাসমান সুরের কমল স্মৃতি সূত্রে গ্রথিত হইয়া লোক-সাহিত্যে জমাইয়াছে গানের আসর। আমাদের লোক-সাহিত্যের এই আসর বা শাখা বড়ই ঋদ্ধি সম্পন্ন-গভীর ও ব্যাপক অনুভূতির প্রকাশ। লোক-সাহিত্যের এমন জনপ্রিয় বিশাল শাখা আর দ্বিতীয়টি নাই। এই শাখার আছে বিভিন্ন প্রশাখা। লোক-সাহিত্যের সঙ্গীত সমগ্র জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ।

লোক-সাহিত্যের সঙ্গীত শাখাকে আমরা দুই প্রধান অংশে ভাগ করিতে পারি : গীতি ও গীতিকা। কোন খণ্ড ভাবের বাণীরূপ সুরসংযোগে গীত হইলে তাহাকে গীতি বা সঙ্গীত বলে। কোন অখণ্ড বা সমগ্র ভাবের বাণীরূপ সুদীর্ঘ সময় গীত হইলে তাকে বলে গীতিকা (গ্রামে বলে লম্বা গীত বা পালাগান)। গীতি বা সঙ্গীতগুলিকে আমরা বাউল সঙ্গীত, বৈষ্ণব পদাবলী, লৌকিক ও অধ্যাত্ম প্রেম-সঙ্গীত, আঞ্চলিক গীতি, জারী-সারি ও ঘাটুগান, বিবিধ কর্ম সঙ্গীত, পটুয়া-ঝুমুর-মালসী-গম্ভীরা-জাগ সঙ্গীত, মেয়েলী সঙ্গীত সন্ন্যাস বা শোক-সঙ্গীত, বিরহ-ভাটিয়ালী ও বারমাসী, কবিগান প্রভৃতি বিখ্যাত। ভবাই, ঘাটুগান প্রভৃতি দ্বারা সামাজিক আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বর্তমানে লুপ্ত প্রায়।

'গীতিকা' ও 'বারমাসী' বড়ই জনপ্রিয়। গাঁয়ের চাষী ভাইরা আসর জমাইয়া সারারাত এইসব পালাগান শুনিয়া থাকে ; বারমাসীর বিরহ উত্তাপে গলিয়া ঝরিয়া পড়ে। 'গীতিকা' বা 'পালাগান' সাধারণত দুই প্রকার—'নর নারীর প্রেম-ধর্মী আর 'ঐতিহাসিকা। এইসব পালাগানে আমরা সমাজ সম্বন্ধে এবং সমাজে নারীর স্থান আর বাংলাদেশের বীরত্ব-ধীরত্ব ও ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে অনেক কথা অবগত হইতে পারি। এই পালাগানের ও বারমাসীর বহু সংস্করণ বা পাঠান্তর পরিলক্ষিত হয়। 'ময়মনসিংহ গীতিকা" ও "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" পালাগানের সংগ্রহ ভাণ্ডার। এতদ্ভিন্ন বহু পালাগান আজ পর্যন্ত অসংগৃহীত আছে। এখানে কয়েকটি, জাতীয় সঙ্গীতের উদাহরণ দিলাম :

১ বিরহ সঙ্গীত : (১)

বিরহ-বিচ্ছেদের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না, একি যন্ত্রণা ;
প্রেম করিয়া দুই দিন আমার সুখে গেল না।
লোকে মোরে করছিল গো মানা,

কঠিনের প্রেমে আর মইজ্য না ;
নয়ালী যয়বন দিলাম, মন্ত পাইলাম না।।

(২)

প্রাণ বন্ধুয়া বিনে গো, আমার চিত্তের বেদন কেউ জানে না।
যারে বলি আপন আপন সে আমায় আপন বলে না।।
বন্ধু আমার নাই গো দেশে
মৈলাম আমি হা-হুতাশে, হায় রে কেউ ত দেখে না।
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম বিধি কেন পাখা দিল না।।
গহীন গাঙের শীতল জলে
ডুবলাম শান্তি পাইবাম বইলে, হায় রে জ্বালা নিভে না।
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে গো আগুন আর নিভে না।।
মাকালের রঙ দেখতে ভাল
উপরে লাল তার ভিতর কাল, হায় রে আগে জানি না।
না জাইনে গরল খাইয়া গো, বিষের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।।
যার অন্তরে প্রেমের ব্যাধি
সেই ত জানে নিরবধি হায় রে অন্যে জানে না।
শত রোগের বৈদ্যি মিলে গো, এই ব্যাধির ওষুধ মিলে না।।

(৩)

কঠিন বন্ধুয়ারে সুখে রইতে না দিলে ঘরে।
নয়ান ভরিয়া রূপ না দেখিলাম তরে।।
ভাবিতে পাঞ্জর শুষে মুখে নাই সে বাও।
নিরবধি ডাকি বন্ধু ফিবিযা না চাও।।
মুক্তি যদি জানিতু বন্ধু কঠিন তোর হিয়া।
না বাড়াইতাম পিরীত খানি থাকতাম বসিয়া।।
দারুণ কোকিলার রবে শরীল কল্লাম কালা।
কত দুঃখ সহিবাম প্রাণে বন্ধুয়ার বিষম জ্বালা।।
এমন দরদী নাই রে কহে বন্ধুর কথা।
উদ্দিশ করিয়া মুক্তি বিচারিব তথা।।
বসন্ত সময় অইলে ফুটে নানান ফুল।
কহে ফকীর ভেলাশায় হইয়া বেভুল।।
ফরহাদ হইয়া কেন আমি শিরি পাইলাম না।
হায়রে মানব জন্ম বৃথা গেল পীরিত করলাম না।

২. প্রেম সঙ্গীত :

এমন রসের প্রেম দরিয়ায় ডুব দিয়া দেখলাম না।
জীবন আমার বৃথা গেল পীরিত করলাম না।।
পীরিত রতন, পীরিত যতন পীরিত গলাব হার।
পীরিত কইরা যে জন মরছে সফল জীবন তার।।

লাইলীর পীরিতে মজনু কান্দিয়া হয়রান।
তার চোখের জলে নদী বইল গলিয়া পাষাণ॥

৩. সারিগান (হাইর) : (বর্তমানরূপ)

আরেহ হিজল কাঠের নাও।
নাওরে শূন্য ভরে উড়ে দিয়া যাও।
হিজল কাঠের নাও খানিরে সুবন্যের গুড়া।
মন পবনে বাদাম দিয়া শূন্যে দিও উড়া।
রে হিজল... ॥
সোনার মাঠে ধান কাটিতে চলনা রে ভাই চল,
মাছে ভাতে পেট ভরিয়া বাড়াই বুকের বল
রে হিজল..... ॥
ধান ফলাইয়াম গম ফলাইয়াম—খাইবার ভাবনা কি।
বাটি ভরাইয়া দুধ খাইবাম গরম ভাতে ঘি।
রে হিজল... ॥
ভাগ্যিগুণে পাইলাম রে ভাই বুনিয়াদি শাসন,
এই শাসনে গডব রে দেশ রাখব সবার মন।
রে হিজল.. ॥
মোদের শাসন সবার সেরা দেখবে চাইয়া।
দুঃখের সাগর পাড়ি দিবাম আনন্দের গান গাইযা।
রে হিজল.. ॥

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

বঙ্গের গ্রাম্য সাহিত্য

যাঁহাবা বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু খবর বাখেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, এক সময়ে বঙ্গদেশে অপেক্ষাকৃত খুব বেশী সাহিত্যচর্চা ছিল। শুধু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে সাহিত্যসেবা দ্বারা আমোদ উপভোগ করিতেন এমন নহে, নিরক্ষর লোকেবাও শিক্ষিত লোকের মুখে সাহিত্যসুধা পানে একান্ত আগ্রহান্বিত ছিল। হিন্দুর গৃহে রামায়ণ, মহাভারত আর মুসলমানের গৃহে পদ্মাবতী প্রভৃতি পুঁথি এক সময়ে আবালবৃদ্ধ নর-নাবীর হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আন্দনধারা ঢালিয়া দিত। বৃদ্ধা ঠাকুরমার ঝুলিতে অলিখিত সাহিত্যের কত আনন্দপ্রস্রবণ লুক্কায়িত ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। আজ সেই আনন্দের ফোয়াবা সম্পূর্ণ বিশুষ্ক হয় নাই,—আজও তাহার দুই একটি ক্ষীণ রেখা নয়নপথে পতিত হইয়া অতীত স্মৃতি জাগাইয়া তোলে।

কিন্তু সেই একদিন আব এই একদিন! দেশ যখন ধনধান্যে পূর্ণ ছিল, অন্নবস্ত্রেব জন্য লোককে যখন গলদঘর্ম্ম হইতে হইত না, তখন যে ভাবে সাহিত্যর সেবা ও উপভোগ করা চলিত, অধুনা এই জীবন-সঙ্কটেব দিনে আমাদের তেমন চলিতে পারে কি? তখন সাহিত্যচর্চা হইত শুধু আনন্দেব জন্য,—কেবল সাহিত্যচচার খাতিবে আর এখন আমবা সাহিত্যসেবা করি অর্থেব লোভে, যশোলাভের উদ্দেশ্যে। এইজন্য তৎকালীন সাহিত্যে আমবা আধুনিক সাহিত্যাপেক্ষা অধিকতব সবলতা ও আন্তরিকতা দেখিতে পাই। বাঙ্গালী হৃদয়ের খাঁটি প্রতিচ্ছবি দর্শন একমাত্র প্রাচীন সাহিত্যেই সম্ভব। আমাদের আধুনিক সাহিত্য পঙ্কিল ভাব-দুষ্ট, তাহাতে খাঁটি হৃদয় খুঁটিয়া পাওয়া নিতান্ত দুষ্কর। এই বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যের সহিত বর্তমান সাহিত্যেব তুলনাই হয না। প্রাচীন সাহিত্যের সংরক্ষণে সেকালের বাঙ্গালী হৃদয়ের ফটো রক্ষাবই কাজ হয়। এইজন্য প্রাচীন সাহিত্য রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

আধুনিক সাহিত্যের মত ততটা নানাদিকপ্রসাবী না হইলেও আমাদেব প্রাচীন সাহিত্য বড় সঙ্কীর্ণায়তন ছিল বলিয়া কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। প্রাচীন কবিগণ একটা নির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ পথে চলিলেও তাঁহারা আমাদিগকে অল্প সম্পদ দিয়া যান নাই। দুঃখেব বিষয়, লোকেব অনাদবে, কালেব প্রভাবে ও মুদ্রণযন্ত্রের অভাবে প্রাচীন সাহিত্যেব ভূরিষ্ঠাংশ বিস্মৃতিব অতল সলিলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কালেব সহিত সংগ্রাম করিয়া যাহা অদ্যাপি বাঁচিয়া আছে, তাহার সর্ব্বাংশ উদ্ধাবের জন্য কোন সমুচিত উপায়বলম্বন আশু-আবশ্যক। বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 'সাহিত্য পরিষদেব' শাখা স্থাপিত হওয়ায এখন প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহের একটা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীন পুঁথি ভিন্ন বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে এমন অনেক জিনিস আছে, সাহিত্য ও ইতিহাসের খাতিরে যাহার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একান্ত

প্রয়োজনীয়। বারমাস্যা, চৌতিশা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, সারিগান, হেঁয়ালী, গীত, কবিতা ও হকিয়ত প্রভৃতিতে প্রাচীন সাহিত্যের একাঙ্গ গঠিত রহিয়াছে। উন্নত সাহিত্য রক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিলে গ্রাম্য সাহিত্য সংরক্ষণের আবশ্যকতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কেন না, গ্রাম্য সাহিত্যই ব্যবহৃত হইয়া কালক্রমে উন্নত সাহিত্যে পরিণত হইয়া থাকে। মানব হৃদয় ও উন্নত সাহিত্যের ক্রমাভিব্যক্তি প্রদর্শন জন্যও গ্রাম্য সাহিত্য রক্ষার বিলক্ষণ আবশ্যকতা আছে। আবার গ্রাম্য সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের প্রভূত উপকবণ নিহিত থাকে বলিয়াও তাহা বিশেষ সমাদরযোগ্য। সেগুলি সংরক্ষিত না হইলে এক দিকে সাহিত্যের একাঙ্গ হানি ঘটিবে, অন্য দিকে সামাজিক ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আশাকরি, মাতৃভাষানুরাগী কোন ব্যক্তিই অন্ততঃ এজন্যও গ্রাম্য সাহিত্যের বিলোপসাধন বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন না। এ বিষয়ে বঙ্গের শিক্ষিত সাধারণের ও লেখকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা নিম্নে কতকগুলি ছেলেভুলান "হেঁয়ালী" প্রকাশ করিতেছি। আমরা ইহাদের যে নামকরণ করিলাম, তাহা ঠিক হইল কি না নিশ্চয় বলিতে পারি না। তবে এগুলি যে গ্রাম্য কবির রচিত ও গ্রাম্য সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাঠকগণ দেখিবেন এ সকল অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবিব বস্তুজ্ঞান-বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি কত বেশী ও ছেলেদের কোমল হৃদয়ে বস্তুজ্ঞানস্ফূরণের পক্ষে এ সমস্ত কবিতার কার্যকাবিতা কত অধিক। এ সকল 'হেঁয়ালীর' আলোচনা করিয়া ছেলেরা একাধারে শিক্ষা ও আমোদ উভয়ই পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ সকল অদ্যাপি লোকমুখেই—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকমুখেই বিরাজিত রহিয়াছে। চেষ্টা কবিলে দেশমধ্যে এ রকম কত জিনিষ যে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভব নহে।

আমরা যে সকল হেঁয়ালী প্রকাশ করিলাম, তন্মধ্যে অনেকটাই খাঁটি চট্টগ্রামী ভাষায় নিবদ্ধ ছিল। খাঁটি চট্টগ্রামী ভাষা অন্য দেশবাসীব পক্ষে সহজ বোধ্য হইবে না জানিয়া কোন কোন হেঁযালীব ভাষাকে স্থানে স্থানে সামান্য রূপান্তরিত ও পরিমার্জ্জিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের মৌলিকতা রক্ষার পক্ষে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

হেঁযালীগুলি এই :

১ দুই অক্ষরে নাম ধরে তার নাম কি
বৃষ্টি হইলে তারে জলে ফেলাই দি।
জলে ফেলাই দিলে তার পেটে হয় ছা[১]
মোহাম্মদ জমা কহে এবে তুলি চা[২] ॥
উত্তর—'চাই' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

২ কালা মুড়ায়[৩] হরিণ চবে।
দশ জনে দৌড়াই দুই জনে ধরে॥
উত্তর-উকুন।

১. ছা—শাবক
২. চা—চাও
৩. মুড়া--বন

৩. এই ঘরের বেটী অই ঘরে যায়।
চাইল চাবায় আর গীত গায়॥
উত্তর—চরকা।

৪. বাইশ মর্দ্দে[৪] ঘিরে পাঁচ মর্দ্দে ধরে।
আর এক মর্দ্দে টেক্কা মারি দরিবার মুড়ে এড়ে[৫]॥
উত্তর—ভাত।

৫. কাঁধে আসে কাঁধে যায়।
সে কেন এত মারণ খায়॥
উত্তর—ঢোল।

৬. কাঁধে করি লৈয়া যায়।
ধুপুর করি ফেলি।
দুই হাতে চাপি ধরি
আলগা করি যায়।
আলগাইলে কিছু নাই।
চল রে পুত ঘরে যাই॥
উত্তর—'লুই' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

৭. বনে থাকে সুবোল বোলে
নয় পাখীর ছা
হাতে লইলে ছটক মাবে
ভুমিতে না দেয় পা॥
উত্তর-সাবি‌ন্দা।

৮ কাকের ওঠ কাকেব ঠোঁট
কাক নয় কিন্তু॥
ঝাঁপ দি পড়ি মাছ ধরে
কুরগালও নয় কিন্তু॥
উত্তর-মেহেতারা নামক পক্ষী।

৯. গাছের উপর গাছ তার উপব চিন্তা।
জামাই কন্যা সহমৃত্যু যায়
সঙ্গে যায় তার পিতা॥
উত্তর-প্রদীপ॥

১০. হিলে লুটে বিলে লুটে।
লেঞ্জে ধরলে ফাল্[৬] দি উঠে॥
উত্তর-ঢেঁকি।

৪. মর্দ্দ—পুরুষ
৫ মুড়ে এড়ে—তলায় রাখে
৬. ফাল—লাফ

১১. ছাগল লুটে।
দড়ি হাঁটে॥
উত্তর--কুমড়া।

১২. হংস নয় বক নয় জলে চরি খায়।
উদরটি ভরিলে তথা মরি যায়॥
মৈলে সে বাদ্য বাজে ফেলাই দেয় নি' তথা
মরি যাইতে কহে সেই স্বর্গপুরীর কথা॥

১৩ মৎস্য নয় কুম্ভীর নয় জলেতে ভাসে।
হীরা নয় মণি নয় মানিক আছে তাতে॥
পণ্ডিতে ভাঙ্গি দিব বছরে ছয় মাসে।
মূর্খে ভাঙ্গি দিব জীবনের শেষে॥
উত্তর–চক্ষু।

১৪. দশ–শিরা রূপ ধরে নয় ত রাবণ।
মানুষের ভক্ষণ করে অমৃত ব্যঞ্জন॥
উত্তর—'ঝিঙ্গা' নামক তরকারী।

১৫. আগে জন্মিলাম আমি বরুণার শশী।
মার কোলেতে দুগ্ধ না খাইলাম বসি॥
বাপের গিবার ধন না করিলাম ক্ষয
এই প্রস্তাব ভাঙ্গি দেও গুরু মহাশয়॥
উত্তর—উত্তর মরা সন্তান।

১৬ কান্ধির উপর কান্ধি।
এ কথা যে ভঙ্গি দিতে না পারে
সে আমার বান্দী॥
উত্তর--কলার ছড়া।

১৭ পোঁদে ঠেলে মুখে খায়।
পেট ভরিলে ঘরে যায়॥
উত্তর–কলসী।

১৮. উড়ি' যায় পক্ষী লুটি খায় বিল।
শক্ত শরীর লোহার খিল॥
উত্তর–লাঙ্গল॥

১৯ এক ঘরে তিন জন চতুর
এক জন মৈলে দুই জন আতুর॥
উত্তর—'তিন টিহরি' নামক চুলা।

২০. গলা আছে তলা নাই।
পেট আছে আঁতুরি নাই॥
উত্তর—'পল' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

২১. হিজলী গাছের বিজলী লতা বেড়াই তেড়াই ধরে।
চিকণ জুরির পেয়াদা আইলে ঝরি ঝরি পড়ে॥
উত্তর–শিশির।

২২. এক কুনি ভুঁইয়ের গুয়া নারিকেল
তিন কুনি ভুঁই জুড়ে।
বাও নাই বাতাস নাই
বিনা চামরে ঢুলে॥

২৩. জলেতে উৎপত্তি নারী
জল ছুঁইলে মরে।
পবনের উপর ভার করি
সিংহ নাদে চলে॥
উত্তর–ঘুড়ি।

২৪ এক গাছের বার ঠেইল[৭]
বার ঠেইলের বার নাম।
সদাপতি গাছের নাম
শারি শুযা পাতার নাম॥
উত্তব–বৎসর।

২৫. কুঠী কুঠী ভুই কুঠী কুঠী আইল
কি ধান রুইলাম নানান শাইল॥
ফুলও হয় না পাকেও না।
রাত হইলে থাকেও না॥
উত্তর–হাট।

২৬. জলে থাকে সুডাক ডাকে
নয় পাখীর ছা।
হাতে লৈলে চীৎকার ছাড়ে
ভূমিত্ না দেয পা॥
উত্তর—শঙ্খ।

২৭. খাইতে খায
হাগুতে[৮] চেঁচায॥
উত্তর––বন্দুক।

২৮. বাহিরে অস্থি ভিতরে চাম[৯]।
কেমন মর্দ্দের ফিকিরী কাম॥
উত্তর—"জুঁইর" নামক ছাতা বিশেষ।

---

৭ ঠেইল—ডাল, শাখা
৮ হাগুতে—মলত্যাগ করিতে।
৯ চাম—চর্ম্ম।

২৯. এই ঘরের বেটী অই ঘরে যায়।
ধুপুর ধুপুর আছাড় খায়॥
উত্তর–সম্মার্জ্জনী

৩০. তরু নহে লতা নহে ফল বহুত ধরে।
শবের সমাধি নহে বৈসে স্তরে স্তরে॥
সিন্ধু পুষ্কর্ণী নহে নাই তথা বারি।
আনল সমান তথা বৈসে সারি সারি॥
কহে হীন ভূয়া গাজী হেঁয়ালী বচন।
দুই অক্ষরে নাম জান ঘোষে সর্বজন॥

পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, এই সকল হেঁয়ালীর মধ্যে অধিকাংশই লোকমুখাৎ সংগৃহীত হইয়াছে ; অল্প কয়েকটা মাত্র প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতির ভিতর পাওয়া গিয়াছে। লোকমুখে প্রচলিত হেঁয়ালীগুলি যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে ; এইজন্য তাহাদের কোন নির্দিষ্ট আকার স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে নাই বলিয়া একই হেঁয়ালীর এখন নানারূপ পাঠ দেখা যায়। আবাব অশিক্ষিত লোকেরা বুঝিতে না পাবিযাও অনেক হেঁয়ালীর পাঠবিকৃতি ঘটাইয়াছে। যাহা হউক, আমরা পাঠান্তরাদি না দিয়া একটি হেঁয়ালীর একটা রূপই প্রদর্শন করিতেছি।

ভাষাতত্ত্ব আলোচনার পক্ষে এই সকল হেঁয়ালী যে বিশেষ প্রয়োজনে লাগিতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য। মানবহৃদয়ের ক্রম–বিকাশ বুঝিবাব পক্ষে ও ভাষার গতিনির্ণয়েও ইহাদের কার্য্যকারিতা কম নহে। পাঠকগণ হেঁয়ালীগুলি আলোচনা করিয়া তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। হেঁয়ালীগুলিতে অশিক্ষিত গ্রাম্য–কবিগণের যে স্বাভাবিক সরল–জ্ঞান পরিস্ফুট হইযাছে, তাহা বাস্তবিক বড়ই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক। তাহাতে একাধারে শিক্ষা ও আমোদ উভয়ই পাওয়া যাইতে পারে।

বিভিন্ন দেশের হেঁয়ালীগুলির মধ্যে বিষয সাদৃশ্য দেখিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয। সকল দেশেই হেঁয়ালগুলি গৃহস্থালীর একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওযা যায়। তাহা হইলেও গ্রাম্য কবিগণের পক্ষে ইহা একান্ত স্বাভাবিক হইয়াছে বলিতে হইবে। যে সকল দ্রব্যাদি সম্বন্ধে হেঁয়ালীগুলি রচিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অশিক্ষিত রচযিতৃগণেব অন্তর্দৃষ্টি কত বেশী, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। হেঁয়ালীগুলির উপলক্ষিত দ্রব্যাদিব সহিত পরিচয় না থাকিলে তৎসমস্ত হেয়ালীর সৌন্দর্যানুভূতি বা রসবোধ হওযা সুকঠিন। এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হেঁয়ালী সকল চট্টগ্রামে প্রচলিত এমন দ্রব্যাদি লইযা রচিত হইয়াছে, যাহার অনেকটিই চট্টগ্রাম ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায না, অথবা পাওয়া গেলেও তাহা হয়ত অন্য নামে পরিচিত। বংশনির্ম্মিত যে সকল দ্রব্যাদির নামোল্লেখ কবা গিয়াছে, পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই তাহা চিনিতে পারিবেন কি না বলা যায় না। যাহা হউক সে বিষয়ে আমরা নাচার। ফুটনোটে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলিব টীকা প্রদান কবিয়া নিম্মে হেঁয়ালীগুলি প্রকাশ করিলাম।

৩১. চতুর্মুখ বটে নহে হংসের বাহন।
বিপদেতে রক্ষা করে নহে নারায়ণ

জটাধারী নহে শিব কহে কালিদাস।
জন্মদাতা করে তাঁর উদরে প্রবেশ।।

৩২. উদ্যাবিলের[১০] মাঝে মরায় জীয়তা খায়।।
ওস্তাদে লাগ পাইলে পোঁদ চিরি চায়।।
উত্তর—'চাই' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

৩৩. হস্ত নাই কোঁড়ে[১১] মাটি।
পদ নাই যায় হাঁটি।।
চর্ম্ম নাই আছে গা।
মুখ নাই করে হা[১২] ।।
উত্তর—জল।

৩৪. দোন পাহালা[১৩] কান।
পেট ভরিলে ঘরে আন।।
উত্তর—'লাই' নামক বংশ-নির্ম্মিত ঝুড়ি (basket) বিশেষ।

৩৫ হাজাইলে[১৪] চিজ
পাইলে ফেলি যায়।।
উত্তর—রাস্তা।

৩৬. হস্ত নাই পা নাই, নাই দুই কান।
বুকে ছেছড় পাড়ে না রেখে নয়ান।।
উত্তর—কেঁচো।

৩৭. তিন তের দিয়া বারো
নয় দিয়া পূরণ কর।
এই কহিলাম স্বামীর নাম।
ঘাট পার করি দেও নাইয়র যাম্[১৫] ।।
উত্তর—(স্বামীর নাম) ৬০=ষষ্ঠী (চরণ)

১০. উদ্যাবিল—খোলা মাঠ।
১১ কোঁড়ে-খনন করে।
১২. অন্যত্র ইহার এই রকম পাঠ দেখা যায়—
সাথে পাছে বলাবল। দিবারাতি চলাচল।।
হস্ত নাই কোঁড়ে মাটি। পদ নাই চলে হাঁটি।।
মুখ নাই করে রাও। চর্ম্ম নাই আছে গাও।।
১৩ দোন পাহালা—দুই দিক।
১৪ হাজাইলে-হারাইলে।
১৫ নাইয়র—স্ত্রীলোকদের পিতৃগৃহে বা অপর আত্মীয়দের বাড়ীতে বেড়াইতে যাওয়াকে 'নাইয়র' যাওয়া বলে। যাম—যাব।

এই হেঁয়ালী সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি অত্যাচার-পীড়িতা যুবতী স্ত্রীলোক স্বামী-গৃহ ত্যাগ করিয়া গোপনে বাপের বাড়ী যাইতেছিল। পথে একটা খেওয়া ঘাটে উপস্থিত হইয়া ঘাটোয়ালকে ঘাট পার করাইয়া দিতে বলিলে সে স্ত্রীলোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকেরা স্বামীর নাম মুখে আনে না। এই স্ত্রীলোকটিও স্বামীর নাম করিতে চাহিল না। কিন্তু ঘাটোয়াল কিছুতেই ছাড়ে না দেখিয়া অগত্যা স্ত্রীলোকটি এই শ্লোকে স্বামীর নাম সঙ্কেত করিয়া ঘাটোয়ালকে সন্তুষ্ট করতঃ ঘাট পার হইয়া পিতৃগৃহে উপস্থিত হইল।

৩৮. ও ফুল ফুলনী।
গাছের আগায় ঢুলনী॥
পাকিলে সকলে খায়।
হাটে যাইতে লেংটা যায়॥
উত্তর—চাউল।

৩৯. তিন অক্ষরে নাম যার, বৃক্ষমূলে বাসা তার,
আকাশ উপরে থাকে বসি।
বসতি সুমেরু পরে, শোণিত ভক্ষণ করে,
স্বর্গে থাকে নহে রবি শশী॥
নহে সিংহ ঐরাবত, বনে বঞ্চে অবিরত,
পুত্র কন্যা পরিবার সনে।
পরিচিহ্ন করি তাহে, পক্ষী নহে ডিম্ব পাড়ে,
জনম গোঞায় বিজু বনে॥
শুক্রদৃষ্টি যদি পড়ে, সমান অর্দ্ধেক মরে,
বাল্য বৃদ্ধ যুবা যত জন॥
শনিদৃষ্টি যদি হয়, বংশে কেহ না বাঁচয়,
গোত্র সমে-সকলি নিধন॥
দশে মিলি আনে ধরি, বিপিনে বিচার করি,
দুই বিন্দু করয়ে সংহার।
রত্নমণি দাসে কয়, যাবে নষ্ট যে করয,
তার লাগি কান্দে পুনর্ব্বার॥
উত্তর—উকুন।

৪০. ঐ সে মাত্র নাম তাব ঐ সে মাত্র সার।
তৃণেব উপর ভার করি গোপনেতে যায়॥
মেঘ রায় বাদ্য শুনি ফের করি চলে।
নবলোকে পাইলে তারে বেড়াই-তেড়াই ধরে॥
উত্তর—কই-মাছ*।

৪১. উড়িতে ঝম্ ঝম্ পড়িতে পাক খায়।
আপনার আধার লই পরবে যোগায়॥
উত্তর—'ঝাঞি' নামক মাছ ধরিবার জাল।

৪২. আকাশেতে ঢুলু-মুলু কাগজের ছানি।
কোন্ খোদায় তুলি দিল গাছের আগায় পানি॥

*বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে নব বর্ষাগমে সকল মৎস্যেবই বিকাব হইয়া থাকে। তখন বৃষ্টিপাত হইলে বাত্রে কই মাছ প্রভৃতি পুকুব হইতে উঠিয়া যাইতে আবম্ভ করে। কিন্তু মানুষও কম সেয়ানা নহে। তাহাবা মশাল হস্তে মৎস্য শিকারে বহির্গত হইযা তাহাদেব অনেকটাকেই ধবিযা ফেলে। এই ক্ষুদ্র কবিতায সেই কথাই বলা হইযাছে।

উত্তর—খর্জ্জুরের রস।

৪৩. লাই এর উপর লাই টেপ পড়ি গেল কাই।
সোনার মাদল ভাঙ্গি গেলে যোড়া-
দেওন্যা[১৬] নাই॥
উত্তর—ডিম্ব।

৪৪. উড়ে পক্ষী যোড়ে বিল।
সোনার ঢাকনী রূপার খিল॥
উত্তর—ছত্র।

৪৫. আগা ছোট পাছা ছোট শৃঙ্গ দুই গোটা।
উদরে ভক্ষণ করে কর্ণে বাহি ধায়।
মুষিক নহে ভুজঙ্গ নহে সুরঙ্গে আসে যায়।

৪৬. তিন নয়ান যার একই চরণ।
মুখ আছে মাৎ নাই অতি মহাজন॥
খেনে খেনে জলে উঠে করিতে আহার।
তাহার নিষ্পন্ন লই সংসার বিচার॥
শুন শুন পণ্ডিত ভাই হেঁয়ালীর ভায়!
বস্ত্র গিলিয়া বেটা ল্যাংটা বেড়ায়॥

৪৭. তারা বাপে পুতে তারা বাপে পুতে
নারিকেল পাড়ে জুতে জুতে।
নারিকেল পাড়ে তিনটা,—
জনে জনে চায একটা।
উত্তর—পিতা, পুত্র ও পৌত্র।

৪৮. এক গাছে ধরিয়াছে দুই গোটা ফুল
হীরা মণি মাণিক্য নহে তার সমতুল॥
রাত্রিতে মুদিয়া থাকে দিনেতে প্রকাশ।
এই মতে অনুদিন থাকে বার মাস॥
হস্ত বাড়াইলে হস্তে লাগত্ পায়।
বাজারে নিলে তারে বেচা নাহি যায়॥
উত্তর--চক্ষু।

৪৯. কুটে কিন্তু না বাঁধে। খায় কিন্তু না গিলে॥
উত্তর—দাঁতের খড়িয়া বা খেলান।

৫০. চন্দ্রের জ্যোতি লোহার পাতি।
আগের হরফ ক॥
মাঝের হরফ না জানম্।
পিছের হরফ ত॥

১৬. যোড়া-দেওন্যা—জোড়া-দাতা।

৫১. উপরথুন পৈল লাঠি।
লাঠি গেল্ পাতাল হাঁটি॥

৫২. আমার মা বাপেরে কৈয়,
আমি গুচি ভিতর আছি।
হঁচা গুড়া দি ভাত খাই
তুরুৎ তুরুৎ নাচি॥

৫৩. মামার পুকুরে সিন্দুর ভাসে।
দেখিয়াছে গোকুল দাসে॥
উত্তর–শৈল মাছের 'বাইস' বা ছানা।

৫৪. আগা লক–লকে পাতা খস্–খসে
ধরে ধুম–ধুমে॥
উত্তর—মিঠা কুমড়া।

৫৫ আচমানে শিরা জমিনে গিরা
পানিতে বাকল।
এই কেচ্ছা যে ভাঙ্গি দিতে পারে,
তার বড় আকল॥

৫৬. ছাড় কাপুড়ে পোঁদে দাড়ি॥
উত্তর–রসুন।

৫৭. কাঁচা অক্তে লুতুর মুতুর[১৭]
পাকিলে লাল সিন্দুর॥
উত্তর–মৃৎ–পাত্রাদি।

৫৮. আগা চল–মল পাতা কপিলাস।
ফুলও না ফলও না ধরে বার মাস॥
উত্তর—পান।

৫৯. আগা চিকন গোড়া মোটা।
তার ভিতর ছ'কুঁড়ি গোটা॥
উত্তর—ধান্য।

৬০. তক্তার উপর তক্তা, তার উপর তবল
বার বছরে ফল ধরেছে তার নাই বাকল॥

৬১. হাঁসের ন্যায় ডুব মারে.
শোলার ন্যায় ভাসে,
বাঘের ন্যায় ঝাপটা মারে,
পণ্ডিতের ন্যায় চাহে॥

১৭. অক্তে—সময়ে। লুতুব-মুতুর—নবম।

৬২. বাড়ীর পিছে ফলন্ত গাছ।
গোটা এড়ি পাতা খাস্॥
চর্ম্ম দিয়া কর্ম্ম করে।
অস্থি দিয়া যজ্ঞ করে॥
উত্তর—নারিচ গাছ।

৬৩. উঠান ছট্ ফটি পিরা নিল সোঁতে।[১৮]
গঙ্গা মরে জলতিরাসে ব্রহ্মা মরে শীতে॥

৬৪. কাল বর্ণ পাখী দেখিতে বিচিত্র।
মাথার উপরে দাড়ি নাড়ে ঘন ঘন॥
দুর্গন্ধ সুগন্ধ তার নাহিক বিচার।
দ্রৌপদীর হস্তে ধরি করেন্ত আহার॥
উত্তব—মক্ষিকা।

৬৫. লাড়ন্ত চারন্ত উপরা-উপরি তিন ফু মারন্ত।
লাল দেখিল যখন ভরি দিল তখন॥
উত্তব—আগুন ধবাইবাব খড়েব 'নুড়া'।

৬৬. কাকে কাঁঠাল খাইতে পড়ি যায় ঘি। (?)
আঠার আলাম মাঝে না নড়ে কি?
উত্তব—দিক চতুষ্টয।

৬৭. ছোট মোট পুকুব গা ইঁচা মাছে ভরা॥
উত্তর—লেমু।

৬৮. রাজার গড়ে গড়ে হাটে।
একটু ধরিলে চিৎ হই কাত্ হই পড়ে।
উত্তব—শামুক।

৬৯. একটুখানি লোক। বালু পাহান[১৯] চোখ।
পর্ব্বত খায়,
বড় বড় বৃক্ষেব সঙ্গে যুদ্ধ কবিতে যায়॥
উত্তর-উই পোকা।

৭০. বড়লোকে পাইলে তারে জেবের ভিতর ভরে।
ছোট লোকে পাইলে তারে দূর করিয়া ফেলে॥
উত্তর-সর্দ্দির প্রকোপে নাক দিয়া যে শ্লেষ্মাদি বাহির হয়।[২০]

৭১. জোড়ে আইসে জোড়ে যায়।
সর্বলোকে তামসা চায়॥
উত্তর—বিবাহ

১৮. পিরা—গৃহেব অংশ-বিশেষেব নাম। সোঁতে-স্রোতে।
১৯. পাহান-সমান।
২০. বড়লোকেবা রুমাল ব্যবহাব কবেন। তদ্দ্বাবা নাক মুছিয়া তাঁহাবা রুমাল পকেটে বাখেন।

৭২. দামুয়া[২১] পুকুরে শৈল নাচে
লট্যা মাছে খট্‌খটাইয়া হাসে।

৭৩. তোপের উপর তোপ।
যে ভাঙ্গি দিতে না পারে তার বাপ বোব॥
উত্তর—গুরুর 'লাদ।

৭৪. বুক খোলা পিঠ টান।
বাত্যা ইন্দুরের চারি কান॥
উত্তর—গৃহ।

৭৫. না ভরে কলসী ডুবয় হাতী।
একি অপরূপ এ সব ভাতি॥

৭৬. জানের[২২] বগা জানে থাকে।
জান শুকাইলে বগা[২৩] ধায়॥
উত্তব—প্রদীপ।

৭৭. 'ক' এতে আকার দিয়া গজ সঙ্গে করি।
সকলে ডাকেন্ত মোবে এই নাম ধরি॥
উত্তর—কাগজ।

৭৮ পাণ্ডবের পঞ্চ পুত্র তারা পঞ্চ ভাই।
ফলেব ভিতর ন মণ গোটা ভিতরে কিছু নাই॥

৭৯. হাটে নিলে কাড়া-কাড়ি অল্প তার মূল।
কীর্ত্তিচাঁদ ভট্ট কহে ফলের ভিতর ফুল॥
উত্তর—চালিতা।

৮০. সর্বঙ্গসুন্দর তার মুখখানি মৈলান[২৪]।
ভয়ঙ্কর নহে সে নিত্য করে পান॥
ঈশ্বব নহে সে শিশুগণ তোযে।
কাম-কালা রতি-বস তাহাতে যে বৈসে॥
কামিল ফকির কহে শুন সর্বজন।
এমন মোহনী জানে কবায় বন্ধন॥
উত্তর—রমণীর স্তন।

৮১. মকরেতে জন্ম তার কুম্ভে দেখা যায়।
মীনের সহিতে তারে অল্প অল্প খায়॥

২১ দামুয়া—শৈবালাদি-সমাচ্ছন্ন
২২. জান-পুকুব হইতে জল বাহিব হইবাব পথ
২৩ বগা—বক
২৪. মৈলান—মলিন

ভালোমতে খায় তারে মেষে আর বৃষে।
আগে বুঝে পণ্ডিতে মূর্খে বুঝে শেষে॥
উত্তর—আম।

৮২. দেখিতে সুন্দর তনু জাতে বেটা হট(?)।
যোগী নহে সন্ন্যাসী নহে মাথে ধরে জট॥
ব্রাহ্মণ নহে পণ্ডিত নহে রাত্রিমান বুঝে
ঢাল নাহি তরোয়াল নাহি বিনি হাতিয়ারে যুঝে॥
উত্তর—কুক্কুট

৮৩. সহজে ভুজঙ্গ নহে ভুজঙ্গ সমান।
বিপরীত দেখ তার জিহ্বা দুইখান॥
হস্ত নাই পদ নাই নাই তেজ-বল
পর হস্তে থাকি মারে বজ্র কামড়॥
নয়ানে কাজল ছিঁড়ে নহে অধিকারী॥
রাজকর্ম অবিশ্রাম করে নিরন্তর।
খেনেক বিশ্রাম করে কর্ণের উপর॥
উত্তর—কলম।

৮৪. লাল বর্ণ অঙ্গ তার পৃষ্ঠে চারি ফইর[২৫]
দুইখানি মোজ তার দেখিতে সুন্দর॥
মোহন তনয়ে কহে অন্য নহে চোর (?)।
থাক মুর্খে বুঝিব পণ্ডিতে না পায় ওর॥

৮৫. দেখিয়া সুন্দর ফল দেবগণ ভোলা।
মায়ের গর্ভে জন্ম তার অযোনি-সম্ভবা॥
মায়ের গর্ভে থাকে সে মায়ের মাংস খায়।
ভূমিতে পড়িয়া সে ছয় ঠেঙ্গে[২৬] গড়ায়।

৮৬. পত্র যার খড়গ ধার করাতের প্রায়।
গোটা যার রক্ত বর্ণ চক্ষু সর্ব্বগায়॥
এক বৃক্ষ হোতে যার আর বৃক্ষ মাতে।
কহেন বল্লভদাসে বুঝহ সভাতে॥
উত্তর—আনারস।

৮৭. রাজারো ঘুড়ী এক বিয়ানে বুড়ী॥
উত্তর—কলাগাছ।

৮৮. এক শিশু জন্মিলেক জননী উদরে।
জন্মিবার কালে কিন্তু মা না ছিল ঘরে॥

২৫. ফইব—পালক
২৬. ঠেঙ্গে—পায়ে।

জন্ম দিল যে দাদা হৈল সে।
ভগ্নী হইল মাতা, পিতা হৈল কে?
উত্তর—লবকুশ।

৮৯. দেখহ অপূর্ব্ব সখি রূপেতে অতুল।
বৃক্ষ না জন্মিতে তার আগে জন্মে ফুল॥
ডাল নাই পাতা আছে ফল নাহি ধরে।
বসন্তে উৎপত্তি তার হেমন্তেতে মরে॥
উত্তর—ভূঁইচাঁপা।

৯০. কোন দুই পক্ষী-সুত উড়িয়া না যায়।
মৎস্য নহে মকর নহে জলেতে বেড়ায়॥
জল ধরে মেঘ নহে নহে (?) সর্ব নরে।
নানারূপে বিক্রি করে নহে সদাগর॥
হীরা মণি মাণিক্য নহে মুনির মন হরে।
এক স্থানে বসি সেই বেড়ায় নগরে॥

৯১. পক্ষী হেন নাম ধরে অম্বরের বৈরী।
ঝাড়িলে সে নাহি পড়ে এই দুঃখে মরি॥
কহে হীন আবঝলে প্রাণের তনয়।
একে একে বাছিলে সে পরিত্রাণ হয়॥
উত্তর—'ভাড়াইয়া' নামক এক প্রকার তৃণ।

৯২. নাম তার বিষধর দন্ত বহুতর।
বিজয় করিতে গেল বিজয়া নগর॥
বিজয়া নগরে গিয়া ভাঙ্গে বিজুবন।
দন্তে ধরি আনে পশু না লয় জীবন॥
উত্তর—চিরুণী

৯৩. বাটীর মধ্যে স্থিতি করে, মাথায় মুকুট ধরে,
কতেক প্রাণী বন্দি করে তাতে।
তাহার এমনি গুণ, লোকের আহার করে খুন,
শুনিতে লাগয় চমৎকার॥
ষষ্ঠীচরণ দাসে কহে, এই কথাটুকু মিথ্যা নহে,
যথার্থ লোকের ব্যবহার॥

৯৪ চক্ষু বদন আছে নাহি তার দন্ত।
সপ্ত শরীর আছে নাহি তার অন্ত॥
পূর্বে মনুষ্য খাইত অখন নাহি খায়।
কহে আলী মোহাম্মদ বুঝহ সভায়॥

৯৫. দিবসেতে বৃদ্ধ যুবা হয় একবার।
মনুষ্য ভক্ষণ করে চক্ষু নাহি তার॥

সেই তার জননীর আদ্য নাম বতি (রতি)
ত্রিপুরারী নাম ধরে তার নিজ পতি॥
কহে আলী মোহাম্মদে হেঁয়ালীর সন্ধি।
মুর্খে বুঝিব থাক পণ্ডিত হয় বন্দী॥

৯৬. পানিতে থাকে মাছ নয়
দুই শিং নাড়ে মৈষ নয়॥
উত্তরে—শামূক।

৯৭. ভাঙ্গা ফকীর নাচে॥
উত্তর–খই

৯৮. ধর্‌তে উহুত মার্‌তে চিৎ।
ভিতরে গেলে মন পিরীত॥
উত্তর—ভাতের গ্রাস।

৯৯. এক হাত বাঁশ হাঙ্গে[২৭] বার মাস॥
উত্তর—চুল।

১০০. এক সুপারি তিন বেপারী।
ভাঙ্গি দিতে না পার্‌লে কান–মোচড়ি॥
উত্তর—টেইয়া' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

সংগ্রহ কবিতে না পারায় অনেকগুলি হেঁয়ালীর উত্তর দিতে পারিলাম না। এ বিষয় পাঠকগণের সহায়তা একান্ত প্রার্থনীয়।

২৭. হাঙ্গে—জ্বলে।

ইব্রাহীম খাঁ

পল্লী-সাহিত্যের কথা

অতীত অতীত হয়েও অতীত হয় না; চোখের সামনে থেকে চলে যায়, চোখের আড়ালে গিয়েও তা বেঁচে থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা চোখের সামনে থেকে কত কাল হয় মরে গেছেন, কিন্তু তাঁরা অলক্ষ্যে আমাদের মধ্যে আজো বেঁচে আছেন।

আমরা কারো পেয়েছি দেহের কদ, কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবয়ব, কারো গায়ের রং, কারো বা মন মেজাজ অর্থাৎ তাঁদের দেহ, মন বা চিত্তের উত্তরাধিকার আমরা কিছু না কিছু ভোগ করে আসছি।

বাইরের ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারের চেয়ে এ উত্তরাধিকারের দাম কম নয়, অনেকাংশে বেশী। পিতার কাছ থেকে পাওয়া ধন ঐশ্বর্য ডাকাতে লুটে নিতে পারে, তাদের রেখে যাওয়া পাকা বাড়ি ভূমিকম্পে ভূমিস্যাৎ হতে পারে, পৈতৃক ভিটা ভূমি ছেড়ে দেশান্তরী হওয়ারও দরকার হতে পারে, কিন্তু দেহ-মন-চিত্তের এ উত্তরাধিকার আমরণ টিকে থাকে।

এই জন্য মানুষ বহু কাল থেকে বর্তমানকে বুঝবার জন্য অতীতের সন্ধান করে আসছে। বিয়ের প্রস্তাব উপস্থিত। ছেলের বাপ মেয়ের বাপ-দাদা, মামু-নানা উভয় বংশের পরিচয় নেন। অনুসন্ধান করে বুঝতে চেষ্টা করেন, কি ছিল তাঁদের মর্জি মেজাজ, চিন্তা ভাবনা, আদর্শ অনুধ্যান। কারণ ওসবের কিছু না কিছু তো বর কনের জীবনে রূপায়িত হবেই।

কোন জাতিকে বুঝতে চাইলে আমরা সে জাতির ইতিহাস পড়ি। কিন্তু ইতিহাসে সব সময় জাতির অতীতের সম্যক পরিচয় মিলে না। কাগজে লেখা ইতিহাস উভয়ের সব সময় জাতির অতীতের সম্যক পরিচয় মিলে না। কাগজে লেখা ইতিহাস উভয়ের মুখে পড়তে পারে, অযত্নে মাটিতে পড়ে পঁচতে পারে, আগুনে পুড়ে ছাই হতে পারে, অথবা কোন হালাকু খাঁর দৌবাত্মে নদীগর্ভে আশ্রয় নিতে পারে। চামড়ার উপরের লেখারও অমন ভাগ্য ঘটতে পারে। ধাতুর উপরের লেখার অমন বিপযয় ঘটে না। বহু বছর পর মাটি পানির তল হতে তুলে এনেও তার লেখা থেকে ইতিহাসের কোন লুপ্ত তথ্যের উদ্ধার সরব হয়ে উঠে।

কিন্তু লেখা ইতিহাসের চেয়ে ব্যক্তি ও জাতির অধিকতর অন্তরঙ্গ পবিচয় মিলে জাতির ছড়া, গান, কবিতা, কাব্য-কাহিনী থেকে। রাজ্যের ইতিহাস লেখক রাজার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হলে রাজার গুণের অতিরঞ্জন করে, শত্রুভাবাপন্ন হলে রাজার দোষের অতিরঞ্জন করে। সমসাময়িকদের মধ্যে নিরপেক্ষ লেখক আবিষ্কার দুরূহ। পরবর্তীকালে নিরপেক্ষ লেখক পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তাঁকেও যে ফের পরেব কানে শোনা, পরের চোখে দেখা তথ্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়।

এইজন্য ব্যক্তি ও জাতির মানস জগতের সত্যিকার সংবাদ পাওয়ার জন্য প্রচলিত ইতিহাসের চেয়ে অধিকতর নির্ভযোগ্য হচ্ছে সে ব্যক্তি ও জাতির গান, কাহিনী ও কাব্য।

পল্লীর রচয়িতা প্রায়শ কারো মুখের পানে চেয়ে রচনা করেন না। তারা রচনা করেন মনের স্বতঃস্ফূর্ত পূলক বেদনায়। কোকিল, পাপিয়ারা কারো কাছে টাকা কড়ির বায়না ধরে না, মনের আনন্দে গেয়ে যায়। পল্লী কবিদের আনন্দে ভেজাল নাই, তাঁদের সে আনন্দ প্রকাশের ভাষাতেও ভেজাল নাই।

এইজন্য শহুরে সাহিত্যের চেয়ে পল্লীর সাহিত্যে অকৃত্রিমতার পরিমাণ বেশী ; আর অকৃত্রিমতার পরিমাণ বেশী বলেই এ সাহিত্য শহুরে সাহিত্যের তুলনায় অধিকতর মর্মস্পর্শী। তাই লোক-সাহিত্য বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে।

আরো একটি বড় প্রয়োজনে লোক-সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আধুনিক কালের শহুরে জীবন হয়ে উঠেছে একান্ত অবসরহীন : নিরিবিলি বসে একটুখানি হাওয়ায় হাত পা মিলিয়ে একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার অবকাশ নাই।

তাই শহুরে মানুষের মন মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠে। বিজলী বাতির আলো ছাড়া মাঝে মাঝে চাই চাঁদের আলো-বিজলী পাংখার হাওয়া ছড়া চাই বাইরের মলয়। তাই তারা ফাঁপড় হয়ে মাঝে মাঝে পল্লীর পানে ছোটে, দেশের বাড়িতে দিন কয়েক থেকে প্রকৃতির সঙ্গে নতুন পর্যায়ে পরিচয় স্থাপন করে।

ঐ একই কারণে শহরের সহস্র সমস্যাপীড়িত মানুষ মাঝে মাঝে পল্লী সাহিত্য পানে ছুঁটে যায়। পুঁজি, শ্রম সমস্যা, বস্ত্র, খাদ্য সমস্যা, আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধে অবনতি, আণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা—সাময়িকভাবে হলেও,—এ সবের নিষ্করুণ বাহুপাশ থেকে মনকে মুক্ত করে পল্লীর অবসর সুন্দর সাহিত্যের উপর চোখ বুলানো, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ মধুর পল্লীচিত্তের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন, ঝঞ্ঝাট বিরল উদার জীবনের প্রশান্তির গভীর মাধুয উপলব্ধি—হয় তো কণ্ঠ হতে অলক্ষ্যে উদ্‌গত সুরধ্বনি :

অন্তরে মোর
বৈরাগী নাচে
তাইরে নাইরে
নাইরে না—

কর্মক্লান্ত জীবনে এ এক অপরিমেয় নিয়ামত।

যতদূর মনে হয়, ছড়া দিয়েই সর্বত্র লোক-সাহিত্যের শুরু হয়। দুই চারটা ছড়ার কথা মনে পড়ে :

মামুগরে বাড়ী বৌড়া বাঁশ
কাটতে লাগে আড়াই মাস।
মামু তুমি সাক্ষী
পানির তলে পক্ষী।
নোটা আন ফোটা দেই,
কন্যা আন বিয়া দেই।

লক্ষণীয়, সে কালের সমাজে মামুর বাড়ি একটা পরম আকর্ষণের স্থান ছিল। কেবল নানারা নহেন, মামুরাও একান্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন তাই প্রবাদ ছিল :

ধানের মধ্যে চামরা
খেশীর মধ্যে মামারা।

ভাগ্নে-ভাগ্নীরা মামুর বাড়ির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। মামুর বাড়ির যে বাঁশ, তা জাতে বড় ; সেও আবার এমন বড় যে তা কাটতে আড়াই মাস লাগে।

এটুকু তো সহজেই বোঝা গেল। কিন্তু হঠাৎ পানির তলে পক্ষীই বা কি করে এল, আর মামুকেই বা কেন সাক্ষী হওয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে? তার পরেই আবার কন্যাকে ঝটপট বিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা।

এ সবের মানে স্পষ্ট বোঝা যায় না। একটা দূরাগত মানে মনের দিগন্তে অস্পষ্ট ভেসে ওঠে : বাড়িতে কুমারী কন্যা বড় হয়েছে—পানির তলের গুপ্ত পাখীর মত তার মাতৃ—আকাঙ্খা সন্তানের স্বপ্নরূপ ধরে অলক্ষ্যে তার চিত্তের গহীনে জেগে উঠেছে। মামু, তুমি সাক্ষী থাক, আর ভাল বরের অপেক্ষায় বসে থাকা চলবে না—জলদী কন্যার বিয়ের জোগাড় করতে হয়। সেকালে কন্যা বালেগা হওয়া মাত্র তাকে বিয়ে দেওয়ার তাগিদ ছিল—এর থেকে এও বোঝা যায়।

এ মানে সকলের মনে লাগবে না, বুঝি ; কিন্তু আশ্চর্য এই যে মনের দিকে লক্ষ্য না করেই সকলে ছড়াটিকে ভালবাসে।

কিন্তু আমরা বুঝতে চেয়েছিলাম, অতীতের অবদান হিসাবে পল্লীসাহিত্যের মূল্যের কথা।

বলছিলাম, সাধারণ ইতিহাসের মামুলী মালমসলা—পাতায়, কাগজে, হাড়কাঠের উপর লেখা, ইটপাথরের দালান ইমারত—কালক্রমে অনেক সময় এসব পুড়ে যায়, পঁচে যায়, ডুবে যায়, ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ধাতুর উপরের লেখাগুলি বেঁচে থাকে।

গজারী গড়ের খবর যারা রাখেন, তাঁরা জানেন, পুরানা গজারী গড়ের ভিতরে গেলে দেখা যায়, দীর্ঘকালের পড়া বহু বহু গাছ মাটিতে শুয়ে আছে। এদের কতকগুলি পড়েছিল হয় তো ঝড়ের তাণ্ডবে, বাকীগুলি পড়েছিল বার্ধক্য বেরামে শিকড়-পঁচা হযে।

বাতাসে, বৃষ্টিতে, রোদে মাটিতে অযত্নে পড়ে থাকার ফলে এর বারো চৌদ্দ আনা গাছই পঁচে গেছে। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক হলেও এর মধ্যে কতকগুলি গাছ আছে যার উপরের বাকলটুকু কেবল পঁচে গেছে, ভিতরের সার অটুট আছে। এগুলি সাধারণত টীলার উপর জন্মা ঝড়তুফানের সঙ্গে সংগ্রাম করে বড় হওয়া গাছ। দৈর্ঘে প্রস্থে এগুলি হয় তো বড নয়, কিন্তু এদের ভিতর নিরেট সারে শক্তিমান।

কাঠ যারা চিনে তারা এগুলিকে সযত্নে কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যায়।

এই তাম্র মুদ্রা, এই অবজ্ঞাত সারবান গাছ—এরাই আমাদের অতীত পল্লীসাহিত্যের প্রতীক।

দূর অতীতের পল্লীবাসী : বহু দুঃখ-দৈন্যের ভিতর দিয়ে তাদের কেটেছে জীবন, আনন্দের সাক্ষাতও তারা জীবনে বহুবার পেয়েছে। কিন্তু শহুরে সভ্যতার চোখে তাবা কখনো বড় ব'লে প্রতিভাত হয় নাই। সেই অজ্ঞাত পল্লীজীবনে তারা নিজ সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা নিজ রচিত গানে, কবিতায় কাহিনীতে, কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছে। তাদের

সে রচনা সভ্যসমাজের কেউ লিখে রাখে নাই। পল্লীর মানুষ যুগে যুগে কণ্ঠে কণ্ঠে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু তাদের সমস্ত রচনা বাঁচে নাই। যেগুলির ভিতর প্রাণশক্তি পরিমাণে কম ছিল, কালক্রমে লোকের স্মৃতির বোঁটা থেকে তা খসে পড়েছে। যেগুলির ভিতরে সত্যিকার পদার্থ ছিল, সেগুলি ঐ জঙ্গলে পড়ে-থাকা সারবান গাছের মত নিজ অধিকারে টিকে আছে মহাকালের যাচাইয়ে তারা বাদ পড়ে নাই।

সুতরাং প্রাচীন পল্লী-সাহিত্য নানা কারণে আমাদের অমূল্য সম্পদ।

উপরে বলেছি, মহাকালের বিচারে পল্লী-সাহিত্যের একাংশ বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করেছে। সুতরাং শুধু সাহিত্য হিসাবেই এর মূল্য অনস্বীকার্য।

অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারার মত আমাদের অতীতের পল্লী-সাহিত্য আমাদের বর্তমান সাহিত্যের প্রাণশক্তিকে অনেকাংশে উজ্জীবিত করে রেখেছে। আমাদের সমাজ-মানসের অতীত-পরিচয় হিসাবেও পল্লী-সাহিত্যের দাম নগণ্য নয়।

বলেছি, ছড়া দিয়েই সর্বত্র পল্লী সাহিত্যের শুরু। দুই চারটি ছড়ার কথা মনে পড়ে :

"খোকা ঘুমালো
পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলীতে ধান খাইল
খাজনা দিব কিসে?"

দ্রষ্টব্য, দুষ্ট খোকার কাহিনী বলতে মায়েরা হামেশাই তুষ্ট। দুষ্ট খোকা তো ঘুমালো কিন্তু মায়ের তো তবু রক্ষা নাই!

খোকা ঘুমিয়ে পড়তেই বর্গীরা হঠাৎ গাঁয়ের উপর হামলা করে বসল। সেকালে ওরা অন্ধকার রাতে ঐ কম্মই করত। অর্থাৎ বর্গীদের জুলুমের একটা হদিছ পাওয়া গেল। আবো হদিছ পাওযা গেল বকেয়া খাজনার জন্য জমিদারের জুলুমের। বুলবুলিতে ধান খাওয়ায় গিরস্ত ছেলে-মেয়ের উপবাসের জন্য চিন্তা করে না, চিন্তা করে খাজনা কি করে দিবে? সেকালে খাজনা হয় ধান দিয়ে দেওয়া হত, না হয় ধান বিক্রি করে দেওয়া হত, এ তথ্যও পাওয়া গেল।

গলায় কাঁটা বিন্ধা মরে
বিলাই মামার পায় ধরে।

বিলাই ভাবে, মনীব মাছ খেতে চায়, খাক : কিন্তু কাঁটা খাওয়া আমার হক। সে হক যে মেরে খায়, সে গলায় কাঁটা বিন্ধে মরুক।

কাজেই বিলাইর বদ-দোয়া ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তার পায় ধরতে হয়।

গরীবের হক মারাকে সেকালে লোকে মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না।

মোগল পাঠান হদ্দ হল
ফান্দে পড়ে তাঁতি

মনে হয়, সেকালে দেশের শরীফ সমাজে ফারসি ভাষার প্রচলন ছিল আর তার ইজ্জতও ছিল প্রচুর। সমাজের নিম্নস্তরে ফারসি সাহিত্যের অনুশীলন ছিল না।

ছেলেরা হাডু-ডু-ডু খেলত, ডাক গাইত, এখনো গায় :

হারে গুটী হারিয়া
বাঘ মারে তাড়িয়া
বাঘের তেলে
বার বাতি জ্বলে।...

মন্তব্য : ছড়া পড়ে মনে হয়—

(ক) সেকালে পাড়া গাঁয় বাঘ ছিল।

(খ) সে বাঘ বন্দুক দিয়ে নয়, লাঠি বল্লম দিয়ে তাড়া করে মারা হত।

(গ) বাঘ দেশে এত বেশী মারা পড়ত যে তার তেল দিয়ে চেরাগ জ্বালানোর রীতি ছিল।

দেশবিদেশের রূপকথায় অনেক সময় বিষয় ও বর্ণনার ব্যাপারে যেন খানিকটা মিল পাওয়া যায়। স্পষ্টই মনে হয়, কোন এককালে ঐ ভাষাভাষী মানুষেরা একই পাশাপাশি জায়গায় বাস করত। লক্ষ্য করুন :

শেকস্‌পীয়রের—

ফি ফো ফাম ফাই
বৃটীশারদের গন্ধ পাই

আর ঠাকুর মা'র ঝুলির—

হাঁউ মাঁউ কাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁও।

মন্তব্য : মানুষের উদ্ভব যে মূলত এক জাতি থেকে, তার নানা প্রমাণের মধ্যে এও এক বড় প্রমাণ, তাদের কাউ, আমাদের গাউ (গাই), তাদের মামমা আর আমাদের আম্মা, ইত্যাদি শব্দের মধ্যে এত মিল। উপরের উদ্ধৃতি সেই পরিচয়ই আরো জোরে সপ্রমাণ করে।

ইউরোপ আমেরিকার বিদ্বজ্জন সমাজে ফোকলোর সোসাইটী নামে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। উদ্যোক্তারা দেশ বিদেশের সংগ্রহের পর তুলনামূলক বিচার করে থাকেন। এগুলিকে তাঁরা নৃবিজ্ঞানের মূল্যবান উপকরণ বলে মনে করেন।

কোন দেশের কোন যুগের কোন কবিতার সঙ্গে আদৌ কোন তুলনা না করেও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, নিম্নে উদ্ধৃতিগুলির মত রচনা রস-সম্পদে বড়ই উপভোগ্য :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতাম তারি পায়।
[দেহ ও আত্মার সঙ্গে খাঁচা ও পাখীর উপমা]

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পাল্লাম না।
[জীবন সায়াহ্নের ক্লান্ত আবেদন]

বিশা ভূইমালী পল্লী কবি। তাঁর গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর চিত্তের গভীর বেদনা :

আমার হৃদয় কমল চলতেছে ফুটি যুগ যুগ ধরি
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি ?
ফোটে ফোটে ফোটে কমল, ফোটার না হয় শেষ
এই কমলের যে এক মধু রস যে তার বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারে না যে তাই
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই।
রে বন্ধু মুক্তি কোথাও নাই।
(তুমি), পার যদি যাওনা ছেড়ে, (তুমি) ছাড়বে কি করি ?

[সাধক জীবনের স্ফূরণের সঙ্গে পদ্মের উপমা ও আশিক মাশুকের অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা]

এই অনুধ্বনি তো রবিবাবুর নিম্মের কবিতায় ফুটে উঠে নাই ?

মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি ?
মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি বিধি সৃষ্টি বাঁধন পারে
বাঁধা সৃষ্টির কাছে।

ধর্ম সাধন করতে গিয়ে কেউ কেউ আচার অনুষ্ঠানের জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে ধর্মের আসল রূপ, খোদার আসল পরিচয় তারা ভুলে যায়। এদের কেউ সজ্ঞানে ধর্মের ব্যাপারী হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বা খালেছ নিয়তে ধর্ম করতে গিয়ে আচারের নিগড়ে আটক পড়ে যায়। পরম প্রেমাস্পদ প্রভুর সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন পথে উভযেই দুর্লংঘ বাধা। তাই গভীর বেদনার সঙ্গে বলছেন শেখ মদন :

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মছজিদে।
ও তোর ডাক শুনে যাই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশিদে।

এই বেদনার্থ অভিযোগই মূর্ত হয়ে উঠেছে আল্লামা ইকবালেব নিম্মোক্ত লাইনে :

খোদা কো বঠাকে আয়শ পর র‍্যাখ্যা হ্যায়
তু–নে আম্‌র ওয়ায়েজ

হে ধর্মের ব্যাপারীকুল, খোদাকে আরশের উপর বসিয়ে রেখে দুনিয়ায় নিজেরা তাঁর কাজ করতে চাও ?

সে কালের কবি ফয়জুল্লার নিম্মোক্ত চরণগুলি এখনো পল্লীর কৃষকদের কণ্ঠে মাঝে মাঝে শুনতে পাই :

পুকুরেতে পানি নাই, পাড় কেন ডুবে ?
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই, ছাও কেন উবে ?
নগরে মনুষ্য নাই, ঘরে ঘরে চাল।
অন্ধসে দোকান দেয় খরিদ করব কাল॥

কি এর গূঢ় মর্মার্থ সহজে বুঝে আসেনা, কিন্তু তবু কি অব্যক্ত সুন্দর এর আবেদন।

কাজী দৌলত সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগের কবি। তাঁর দুটি চরণ—

নর সে পরম দেব, নর সে ঈশ্বর
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর !

মনে করিয়ে দেয় ইকবাল :

তরাশীদন ছনম বর ছুরতে খেশ
বশেকলে খোদ খোদারা নকশ বস্তম
মারা আজ খোদ বেরুঁ রফতন মহাল আস্ত
বহর রঙ্গে কে হস্তম খোদ পরস্তম।

আমার বঁধুকে গড়িয়া হেরিনু আমারি ছুরত সবি
আঁকিয়া খোদার তছবীর হেরি তারো মাঝে মোর ছবি।
আমারে ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে না পারি যতই চাই
নানান ছন্দে আমারেই আমি বন্দনা করি তাই।

উপরে আমাদের লোক–সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওযাব চেষ্টা করা হয়েছে, বহুকাল পর্যন্ত আমাদের মহলে সে পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। অবশেষে এ সবের প্রতি সমঝদার সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। রসপিপাসুরা এগিয়ে এলেন এবং এত কালের অজ্ঞাত এ সাহিত্যের অপরূপ সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীব বাউল কবিদের রচনাব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঠাকুরমার ঝুলি শিক্ষিতজনেব সামনে খুলে ধরলেন। ঠাকুরদাদার ঝুলিতে কি আছে অতঃপর তারো সন্ধান হল। রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে পরিবেশন করলেন Folk Tales of Bengal- (বাংলার উপকথা)। অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন 'হারামণি'—কুড়িয়ে কুড়িয়ে বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ শুরু করলেন। কবি জসীমউদ্‌দীনের কল্পনাব সোনার কাঠির পরশে পল্লীর ঘুমন্ত কাব্য–সঙ্গীত চোখ মেলে চাইল। গায়ক আব্বাসউদ্দীন উদ্ধার করে চল্লেন উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান। রসজ্ঞ পাঠক সমাজ পরম আনন্দে পরম গর্বে ও পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই নব আবিষ্কৃত পল্লী–সাহিত্যের অনুপম আস্বাদ গ্রহণ করতে লাগলেন।

ইতিপূর্বেই জগতেব দিকে দিকে শান্ত সমাজ সায়রে গণ–চেতনার দুর্জয় তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। ঘোষণা করা হ'ল :

'এতকাল জনগণকে দূরে রাখার মতলবে শহুরে সাহিত্যের চাব পাশে ঐ যে দুর্বোধ্য ভাষার সুউচ্চ প্রাচীর তুলে বাখা হয়েছে, গণ–আদর্শের শাবল মেরে সে প্রাচীর ভূমিসাৎ করে দাও ; টেনে তোল অবজ্ঞার পুস্তক থেকে দেশের পল্লী–সাহিত্য ; জনগণের কল্যাণে ঐ পথে সরল সহজ ভাষায় নতুন সাহিত্য গড়ে তোল।... ...

তখন নতুন করে ফেব শুরু হল প্রাচীন পল্লী–সাহিত্যের অনুসন্ধান।

বর্তমান জগতের বহুদেশে হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি টাকা অতীতের বিলীয়মান পল্লী–সাহিত্যের সংকলন ও সংরক্ষণে ব্যয়িত হচ্ছে। জাতির মানস জীবনে রস–সঞ্চার অব্যাহত রাখার জন্য সুধীসমাজ পল্লী–সাহিত্যকে অন্যতম উৎসধারা বলে গণ্য করে নিয়েছেন।

বাংলাদেশের অতীত পল্লী–সাহিত্য মর্ম ও উপকরণ উভয় ঐশ্বর্য্যেই মহীয়ান। রায় বাহাদুর দীনেশ সেনের লেখার মাধ্যমে পরিচয় পেয়ে পাশ্চত্যের রোঁমা রোঁলার মত একাধিক মনীষী মুখর কণ্ঠে এ সাহিত্যের প্রশংসা করেছেন। 'দেওয়ানা মদীনা'র কাহিনী চরিত্র ও স্থাপন দক্ষতায় তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু পানি, মাটি, উই, আগুন, অযত্ন, এসব মিশে আমাদের অতীতের লোক-সাহিত্যকে দ্রুত ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে।

এ সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার অবিলম্বে ব্যবস্থা করা আমাদের শিক্ষিত সমাজ ও সরকারের অন্যতম অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসান

লোকঐতিহ্য ভাবনা

লোক-সংস্কৃতি অথবা লোক-বিজ্ঞান আমার ক্ষেত্র নয়। এগুলো নিয়ে আমি বিশেষ ধরনের গবেষণা কখনো করিনি। প্রাচীন বাংলা, মধ্যযুগের বাংলা এবং আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যে আমার পরিক্রমা ছিল এবং এখনো আছে। বিভিন্ন ভাষা নিয়ে আমি চর্চা করেছি এবং এখনও চর্চা করে চলেছি। সর্বোপরি কবিতা লেখার আগ্রহ বহু আগে থেকেই ছিল। সে আগ্রহ এখনও নষ্ট হয়নি। মাঝে মাঝে নিজের ঐতিহ্য বোধ থেকে ধর্মের কথাও বলি। এবং ধর্ম বিষয়ে কখনো কখনো আলাপ আলোচনাও করি। কিন্তু কখনো বিশিষ্ট এবং বিচ্ছিন্নভাবে লোকসাহিত্য সম্পর্কে আমি আলোচনা করিনি এবং চিন্তাও করিনি। আমার কোন লেখাও লোকসাহিত্য বিষয়ে নেই। তবুও এ সম্পর্কে আমার যেটুকু ধারণা আছে সেই ধারণা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। আমি বিদেশে দেখেছি, বিশেষ করে আমেরিকায় যে,—সেখানে গ্রাম বলতে কোন কিছুই নেই। আমেরিকার কথাটা আমি উচ্চারণ করলাম এই কারণে যে, আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ। সেখানে লোকসাহিত্য কি রকম সেটা আমাদের জানা দরকার। আমরা জানি আমেরিকায় যারা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলেন তাঁরা পৃথিবীব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসাহিত্য এবং লোক চিন্তা নিয়ে তাঁরা আমেবিকায় এসেছিলেন। কেউ বৃটেন থেকে এসেছিলেন, কেউ আয়ারল্যাণ্ড থেকে, কেউ ইংল্যাণ্ড থেকে, কেউ ফ্রান্স থেকে এবং কেউ জার্মানী থেকে, রাশিয়া থেকে, এবং অনেকে আফ্রিকা থেকে দাস হিসেবে। এঁরা যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতি, ভাষা, চিন্তাধারা এবং নিজস্ব শব্দের পরাক্রম নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ক্রমান্বয়ে এ সমস্ত বিচিত্র ভাব প্রকল্পগুলো স্পষ্টতঃ হারিয়ে যাচ্ছিলো। বর্তমানে গবেষক এবং পণ্ডিতগণ এগুলো অনুসন্ধান করা আরম্ভ করেছেন। যান্ত্রিক সমৃদ্ধি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে দ্রুত গমনাগমন সম্ভবপর করেছে এবং তার ফলে ভাবপ্রকল্পের সংমিশ্রণ ঘটেছে। স্বকীয়তায় সুস্পষ্ট কোনও জাতিস্বত্ত্ব আমেরিকায় এখন আর নেই। আমেরিকায় গ্রামও নেই, দেখা যায় যে আমেরিকায় নগরভিত্তিক একটা দেশ গড়ে উঠেছে। গ্রাম বলতে আমেরিকায় আছে খামার অর্থাৎ ক্ষেত-খামার। সেখানে যারা থাকে তারা খামারের রক্ষণা-বেক্ষণেব জন্যই থাকে। বর্তমানে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন এলাকার মানুষের উচ্চারণবিধি পরীক্ষা করে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর স্মৃতি উদ্ধার করে প্রাচীন লোকবিশ্বাসকে উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করছে। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়, বু. মিংটন এবং পেনস্যালভেনিযা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এসমস্ত গবেষণা এবং অনুসন্ধানে নিযুক্ত রয়েছে। লোকবিশ্বাস এবং সংস্কৃতি যন্ত্র-সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং নগর-জীবনের সমৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যায়। আমাদের দেশেও হারিয়ে যাচ্ছে। এমন একটা দিন হয়তো আসবে যখন পুরনো ঐতিহ্য, পুরনো লোক-সংস্কৃতি, এবং লোকবিশ্বাসগুলো আধুনিক জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে এবং শেষ পর্যন্ত

বিশিষ্টার্থক লোকসংস্কৃতির চিহ্ন মাত্র থাকবে না। আমরা দেখছি অতি দ্রুত গ্রামগুলো শহরে পরিণত হচ্ছে। অন্ততঃপক্ষে গ্রামে বিদ্যুৎ আসছে, গ্রামে পানির কল স্থাপিত হয়েছে, গ্রামের মানুষ আধুনিক শহবের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে এবং আগে যে কমিউনিকেশনের অসুবিধা ছিল, বর্তমানে সেসব অসুবিধা নেই।

ময়মনসিংহের হাওর অঞ্চলে বহু আগে বিশেষ স্বভাবের লোক-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। হাওর অঞ্চলে যারা বাস করতো তাদের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ ছিলোনা বললেই চলে। তাদের জীবনে একটি ইন্‌সুলারিটি নির্মিত হয়েছিলো, যাকে বাংলাতে বলা যায় একান্ততা। বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা নিজেদের জীবনে একটা বিশিষ্ট ধরনের সংস্কৃতি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমন জাপানের সঙ্গে ইউরোপের এবং এশিয়ারও কোন সম্পর্ক ছিল না। একমাত্র চীনদেশ এবং কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের কিছুটা সম্পর্ক ছিল। সুতরাং চীনদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম এসেছে জাপানে। চীনদেশ থেকে তাদের চিত্রকলা, চীনদেশের লৌকিক ভাষা সেগুলোও জাপানে এসেছে কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ছিল না। তার ফলে জাপানও তার ইনসুলারিটির কারণে একটা বিশিষ্ট ধরনের সংস্কৃতি নির্মাণ করেছিল। জাপানের নৃত্য একটা বিশিষ্ট ধরনের, জাপানেব সংগীত বিশিষ্ট ধরনের, জাপানেব যন্ত্র শিল্পও একটা বিশিষ্ট ধরনের, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে এগুলোর কোন তুলনা হয না। কিন্তু বর্তমানে জাপান পৃথিবীর মধ্যে একটি বলিষ্ঠ জাতি, অর্থনীতির দিক থেকে একটি বলিষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে এবং বলিষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিগণিত হওয়ার দরুন জাপানে এত পরিবর্তন এসেছে যে তা বিশ্বাসযোগ্য নয। আজ রুশদেশ ব্যালের জন্য বিখ্যাত, ফ্রান্স ব্যালের জন্য বিখ্যাত—সেই ইউরোপীয় ব্যালে নৃত্য জাপানে অনুপ্রবেশ করেছে এবং জাপানীবা ব্যালে নৃত্যে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ক্রমান্বযে তারা সেই ব্যালে নৃত্যে ইউরোপকেও অতিক্রম করবে আশা রাখে। এভাবে জাপান ইউরোপীয় মাপকাঠিতে আধুনিক হবার যোগ্য বলে পরিগণিত হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে জাপানের কাবুকি, জাপানের নৃত্য শিল্প হারিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন সংগীতে জাপান নতুন বিচার-বিবেচনায় ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করবার চেষ্টা করছে। এইভাবেই ক্রমান্বয়ে পুরনো জিনিযগুলো একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখনও সুযোগ আছে পুরনো সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার। এখনও আমাদের গ্রামগুলো পুরোপুরি নগর হয়নি, এখনও প্রাচীন লোক-সংস্কৃতিকে বহন করে, বহুলোক গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রে বাস করছে। সুতরাং এখনও প্রকৃত স্বকীয়তায এগুলো সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ সম্ভবপর।

আমরা জানি নেপালে বৌদ্ধ গান ও দোঁহা আবিষ্কৃত হয়েছে। বহু আগে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজী যখন বাংলাদেশ ও বিহার আক্রমণ করেন তখন বিহারের বিক্রমশীল বৌদ্ধ মন্দিরে যে সমস্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থাকতেন তাঁরা বিক্রমশীল পরিত্যাগ করে কেউ নেপালে এবং অনেকে তিব্বতে চলে যান। যে সমস্ত গ্রন্থ তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং যে সমস্ত ধর্মীয় গাথা এবং গানের সংকলন তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলো তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয় এবং সংস্কৃত ভাষায়ও অনূদিত হয়। সংস্কৃত এবং তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে এবং পুরনো পাণ্ডুলিপি যেগুলো উদ্ধার করা হয়েছে তার সাহায্যে আমরা এগুলো বর্তমানে সম্পাদনা করছি এবং নতুন আলোকে সেগুলো পরীক্ষা করবার চেষ্টা করছি। দেখা যাচ্ছে যে, এখনও সেই সব অঞ্চলে—তিব্বতে এবং নেপালে মানুযের মবিলিটি খুব কম অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের

সঙ্গে যোগসূত্র কম। তাই এখনো চর্যাপদের কিছু কিছু রাগ এবং কিছু কিছু পদ লোক মুখে গীত হয়। যেমন : ড: আরনল্ড বাকে তিব্বত থেকে চা চা সঙ্গীত সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, গ্রামের লোকেরা যন্ত্র বাজিয়ে একতারা দোতারার মত যন্ত্র বাজিয়ে, তখনো পুরনো সঙ্গীতগুলো গেয়ে থাকে। সেগুলো এখন সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা। আমাদের এখানে ময়মনসিংহে বহু কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যে মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানা মদিনা ইত্যাদি যে লোককাহিনীগুলো ময়মনসিংহে আবিষ্কৃত হয়েছে এগুলো ভারতবর্ষের একমাত্র ময়মনসিংহ অঞ্চলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে।

এ বিপুল সম্ভার কিন্তু এখন ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। উচ্চারণ ভেদে এবং বিভিন্ন প্রকৃতির সংযোজনের কারণে কথার যে পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলো নির্ণয় করা প্রয়োজন ; গানের যাথার্থ নিরূপণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুর সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। গ্রামের গায়েনরা একতারা কি দোতারা বাজিয়ে যেভাবে অবিচলিত কণ্ঠে পুরানো লোকগীতি ধারণ করে রেখেছে যান্ত্রিক উপায়ে সেগুলো উদ্ধার করে সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলা একাডেমীতে একসময় লোকগীতি এবং লোককাহিনী সংগৃহীত হত, এখনও হয় কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয়তো হয় না। শুনেছি ঢাকায় বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ বলে একটি প্রতিষ্ঠান নাকি আছে। তাঁরা কি কাজ করছেন জানিনা। পদ্ধতিগত দিক থেকে লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁদের গবেষণার কার্যক্রম কি তাও আমি জানিনা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোক-সংস্কৃতি সংরক্ষণেব প্রাথমিক পর্যায়ে ভৌগোলিক এলাকা চিহ্নিত করা হয়। একটি দেশে বিভিন্ন প্রকারের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এবং সে বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন স্বরূপ উদঘাটিত হতে পারে। এই এলাকাগুলি চিহ্নিতকরণের জন্য লোক-সংস্কৃতির মানচিত্র তৈরী করা হয়। এই মানচিত্রে মূল ভূ-খণ্ডকে বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতির এলাকায় বিভক্ত করে দেখানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গতিবিধির পথও নির্দেশ করা হয। এর ফলে এলাকাভিত্তিক স্বরূপটাও আবিষ্কার করা সম্ভব। আমেরিকায় ব্যাপকভাবে এই কাজ চলছে। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কাজ ব্যাপকভাবে চলছে। বাংলাদেশে ময়মনসিংহ অঞ্চলটি লোক-সংস্কৃতির লালনভূমি। ময়মনসিংহ বলতে আমি প্রাচীন ময়মনসিংহের কথা বলছি যখন নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, জামালপুর কিশোরগঞ্জ সবই ময়নসিংহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ময়মনসিংহ আবার সিলেটের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে যুক্ত ছিল। ভাষাগতভাবে আঞ্চলিকতার বিবিধ স্বভাব নিয়ে ময়মনসিংহের ব্যাপকতা আছে। বিভিন্ন প্রকার আঞ্চলিকতার মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি, গাথা এবং কাহিনী তৈরী হয়েছে। আজ থেকে ৬০/৭০ বৎসর আগে চন্দ্রকুমার দের সহায়তায় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কিছু লোকগাথা ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সেই গাথাগুলো স্বদেশে এবং বিদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ জীবনের লৌকিক, কর্মকাণ্ড, বিশ্বাস, আচার, ধর্মীয় চেতনা, ঈর্ষা, ভালবাসা এই সমস্ত অনুভূতির বিস্ময়কর চিত্রাঙ্কন ময়মনসিংহ গীতিকায় আমরা পাই। বাংলা একাডেমীতে আরো কিছু সংগ্রহ আছে। এই সংগ্রহগুলো পরীক্ষা করে নতুন অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে ময়মনসিংহ গীতিকার যথার্থ গবেষণামূলক সংকলন প্রকাশ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের তিনজন কৃতী সন্তান লোক–সংস্কৃতি বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। এঁরা তিনজনই ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক–সংস্কৃতি বিষয়ে পি. এইচ. ডি. করেছিলেন। এঁরা তিনজনই আমার ছাত্র। এঁদের একজন হচ্ছেন ডক্টর মযহারুল ইসলাম, একজন ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, এবং তৃতীয় জন ডক্টর জহুরুল হক। জহুরুল হককে আমি বাংলা একাডেমী থেকে পাঠিয়েছিলাম। জহুরুল হক বিদেশেই রয়ে গেল। সুতরাং দেশে লোক–সংস্কৃতির গবেষণায় তাঁকে আর পেলাম না। অন্য দুজন দেশেই রয়েছেন এঁদের কাছ থেকে আমরা লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথার্থ অনুসন্ধানের কর্মকাণ্ডের প্রস্তাবনা চাই।

বিদেশে লক্ষ্য করি যে আধুনিক কবি–সাহিত্যিকগণ প্রাচীন লোকভাণ্ডার থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে আধুনিক জীবনের মর্ম যাতনাকে বিশ্লেষণ করছেন। ফরাসী কবি সাঁ জাঁ পার্স ত্রুবাদুর যুগের রোমান্সের অন্তর্নিহিত আবেগকে অবলোকন করে আধুনিক জীবনের গতিধারাকে আবিষ্কার কবেছেন। তেমনি বিখ্যাত জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাস তাঁর কবিতার জন্য শব্দ আহরণ করেছেন প্রাচীন গাথাকাব্যের মধ্য থেকে। ইংরেজ কবি টি. এস. ইলিয়ট নাটক রচনা করেছেন গ্রীক ট্র্যাজিডির সমান্তরালতায়। আবার দেখি জাপানে আধুনিক উপন্যাস রচিত হচ্ছে প্রাচীন জীবনবেদের প্রশ্রয়ে। এভাবে পৃথিবীর সর্বত্রই লোককাহিনীর বিস্ময়কর পরিচর্যা চলছে। আমাদের দেশেও এটা হতে পারে। আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে একমাত্র কবি জসীমউদ্দীন অসাধারণ চৈতন্যে পুরাতন বিশ্বাসকে আধুনিক জীবনের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করেছিলেন। আমরা বড় বেশী নগর ভাবাপন্ন। কিন্তু এটা আমরা অনুভব করিনা যে আমাদের অধিকাংশ নগবী পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী দেশের গ্রামেরও নির্জীব সংস্কবণ। সুতরাং নাগরিক চেতনায় আকৃষ্ট হয়েও আমরা কিন্তু যথার্থ নাগরি ক মন্য নই। আমাদেব স্নায়ুতে ও শিবায় গৃহগতমনা গ্রামীণ বাঙালী সত্তা বাস করে। সেই সত্তাকে অস্বীকার করে আমরা কতোটাই বা নাগরিক হতে পারি! সুতরাং আমাদের প্রয়োজন আমাদের লোক–সংস্কৃতিকে পবিপূর্ণভাবে উদ্ধার কবা এবং আধুনিক বিজ্ঞানেব আলোকে তাকে পর্যবেক্ষণ করা এবং অবশেষে এগুলোর ওপর ভিত্তি করে আমাদের সাহিত্যকে সম্পদশালী করা।

ময়মনসিংহে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষির ঐতিহ্যগত (Traditional) উপকরণ বিষয়ে একটি জাদুঘর থাকা প্রয়োজন ছিল। কৃষিভিত্তিক লোককাহিনী বা লোকগাথা সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল কিন্তু এগুলোব কোনোটাই সেখানে গড়ে ওঠেনি। আমি বুলগেরিয়ার একটি কৃষি ইন্সটিটিউটে সে দেশের কৃষিকার্যে যুগ যুগ ধবে যে সব যন্ত্র ব্যবহার হয়ে এসেছে তার একটি বিস্ময়কর সংগ্রহশালা দেখেছি। ইতিহাস স্পর্শ করতে পারে এই রকম আদিম সময় থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত কৃষি যন্ত্রে ক্রম বিবর্তন সেখানে পাঠ কবা যায়। কিন্তু আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয শুধু কৃষিডিগ্রীধারী সরকারী চাকুরীজীবী সৃষ্টিতেই তৎপর। কৃষিভিত্তিক লোক–সংস্কৃতি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের কাজে তারা হাত দেয়নি। আমার মনে হয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যদি এখনো সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা নিয়ে কৃষিভিত্তিক লোক–সংস্কৃতি সংগ্রহের কাজে অগ্রসর হয় তাহলে তারা দেশকে যথার্থ কিছু দান করতে পারবেন। বিদেশে কৃষিভিত্তিক যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তারা যথার্থ কৃষক তৈরী করার জন্যই প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম তৈরী করেন। সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে সমস্ত ছাত্ররা বেরিয়ে আসে তারা কৃষিকার্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই চিন্তা করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকায়

পাঠিয়েছিলেন কৃষি বিষয়ক জ্ঞান লাভ করার জন্য। আমরা আমাদের দেশে চাকরী নামক আদর্শের অন্বেষণে ডিগ্রী গ্রহণ করি। এ অবস্থাটি আমাদের জন্য দুঃখজনক। এই মানসিকতা জাতির উপর একটি বিরাট চাপ সৃষ্টি করছে এবং জাতি ক্রমান্বয়ে মিথ্যাকে অবলম্বন করে নিঃস্ব হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি আমাদের আশু প্রয়োজন। আমরা চাই যে আমাদের যা কিছু পুরানো জিনিস আছে তা সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত হোক। এবং সেগুলো অবলম্বন করে আমাদের নতুন সাহিত্য গড়ে উঠুক।

মানুষের পৃথিবী একটা বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয়, তেমনি মানুষের চিন্তাধারা। লুই কায়ামিয়া ইংরেজী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে রোমন্টিসিজম ও ক্লাসিসিজম ইংরেজী সাহিত্য ধারায় পর্যায়ক্রমে আসে। ভাষার পরিবর্তন হচ্ছে ক্রমান্বয়ে কিন্তু আদর্শ একটি পর্যায় তৈরী করে নিয়েছে। আদর্শের এই পরিবর্তনটা হয়নি তার কারণ যুগ-যুগান্তর থেকে মানুষতো মানুষই, মানুষ মমতাময়, মানুষ নিষ্ঠুর, মানুষ বিদ্রূপ করে, মানুষকে হত্যা করে, মানুষ মানুষকে ভালবাসে। এই ভালবাসা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ নিয়েই যুগ যুগ ধরে মানুষের পথ-পরিক্রমা। পৃথিবীর পথ দিয়েও আমরা হেঁটে চলেছি। বিদ্বেষ নিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি, আনন্দ নিয়ে হেঁটে চলেছি এবং বিশ্বাস নিয়ে হেঁটে চলেছি। অনেক সময় পূর্ণ অবিশ্বাস নিয়ে হেঁটে চলেছি। যেমন—এক হাজার বছর আগেও ছিল তেমনি দশ হাজার বছর আগেও ছিল, সর্বসময়ে মানুষের এই একই গতিধারা, শুধু প্রকাশ ভঙ্গির পার্থক্য ছিল। আগে একভাবে আমরা আমাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করতাম বর্তমানে একটু অন্যভাবে প্রকাশ করি। একজন দরিদ্র মানুষ তার অনুভূতিকে যেভাবে প্রকাশ করবে একজন বিত্তশালী তার অনুভূতিকে সে ভাবে প্রকাশ করবে না। কিন্তু অনুভূতিটা একই, প্রকাশ ভঙ্গিটাই নানা রকম হয়ে দাড়ায়। সেই কারণেই বর্তমান সময়কে জানতে হলে, বর্তমানের সূত্রকে অনুধাবন করতে হলে, বর্তমানকে নির্মাণ করতে হলে বহু প্রাচীনকালের আমাদের লোক-জীবনের যে বিশ্বাস ছিল, যে সংস্কার ছিল, তাকে জানতে হবে এবং তার সঙ্গে একটি সমান্তরালতা (modern parallel) নির্মাণ করতে হবে। তখন দেখব বহু আগের যে আমি এবং এখনকার যে আমি সে আমির মধ্যে বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। সেই আমিই বর্তমানের আমিতেই রূপান্তরিত হয়েছি। বহু আগে গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে মানুষ কেন জন্মগ্রহণ করলো এই প্রশ্ন রেখেছিলেন এবং নিজে সে জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সে জিজ্ঞাসার সমাধান হয়নি। আজও পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সেই জিজ্ঞাসা নিয়েই চলেছি। গৌতম বুদ্ধ বহু আগে যে প্রশ্ন করেছিলেন আজও সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে কিন্তু উত্তর মানুষ কখনো খুঁজে পায়নি। তবুও মানুষের উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টার অবধি নেই। বহু আগে উত্তরের কণামাত্র আমরা হয়তো পেয়েছিলাম। আজ হয়তো বেশী পেয়েছি যেটাকে ব্রাউনিং বলেছেন—

> "In this world broken arcs.
> In this heaven a complete round".

আমরা কোনও কিছুই এ পৃথিবীতে পূর্ণভাবে পাইনা। ভগ্নাংশরূপে পাই। কিন্তু মানব জাতির সমগ্র জীবন অবলম্বন করলে বলা যায় জীবন এবং মৃত্যুকে নিয়েই সম্পূর্ণ বৃত্ত রচিত হয়। অর্ধবৃত্ত কখনো কখনো বৃত্তের ভগ্নাংশ, কখনও কখনও সব কিছু মিলে সমগ্র মানবসমাজের চিন্তার সমগ্রতা নিয়ে বৃত্তের পূর্ণতা। সেই কারণেই লোক-সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য,

লোকবিশ্বাসগুলো আবিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। যে মানুষগুলো বহু আগে অত্যন্ত সরল বিশ্বাসে প্রেম নিবেদন করতো, যে মানুষগুলো জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে রমণীকে আনন্দে গ্রহণ করতো, যে মানুষগুলো সামান্য কৃষির উপকরণ দিয়ে ক্ষেতে শস্য ফলাবার চেষ্টা করতো ; যে মানুষ ঈর্ষাকে নিয়ে অথবা আনন্দকে নিয়ে, বেদনাকে নিয়ে, তার নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করতো সেই পুরনো মানুষ আজও আমাদের বৃত্তের মধ্যে বিদ্যমান। সেই মানুষকে আমাদের বৃত্তের মধ্যে আবিষ্কার করবো। আমাদের আজকের অভিপ্রায়ের মধ্যে আবিষ্কার করতে হবে। আমাদের ঈর্ষার মধ্যে আবিষ্কার করতে হবে। আমাদের অভিপ্রায়ের মধ্যে, অহমিকার মধ্যে আবিষ্কার করতে হবে। আমাদের দুর্বলতার মধ্যে আবিষ্কার করতে হবে, আমাদের নিঃশেষিত হওয়ার অবস্থার মধ্যে আবিষ্কার করতে হবে। এই আবিষ্কারের দ্বারা সাধনায় যারা নিমগ্ন আমি তাদের সফলতা কামনা করি।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ লোক-সংস্কৃতি উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণ থেকে [ময়মনসিংহ পাবলিক হল : ১৫.৩.১৯৮৫।]

লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস

মযহারুল ইসলাম

ভারতীয় উপমহাদেশে লোককাহিনী সংগ্রহ

(ইউরোপীয় সিভিলিয়ন এবং মিশনারীদের উদ্যোগ, প্রাথমিক স্তর)

ব্রিটিশ কর্মচারী, তাঁদের, স্বজনবর্গ এবং মিশনারীগণ কর্তৃক লোককাহিনী সংগ্রহের যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তার একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা আমাদের জন্যে খুবই জরুরী। বিশেষ করে সংগ্রহসমূহের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ থেকে আমরা সংগ্রহ পদ্ধতি এবং সংগৃহীত উপাদানের মূল্যায়ন সম্পর্কে অনেক তথ্য অবহিত হতে সমর্থ হব। এই সংগ্রহ-পরিক্রমাকে চারটি প্রধান কালস্তরে বিন্যস্ত করা যায় ; বিন্যস্ত করা যায় এক এক ধরনের বিশিষ্ট সংগ্রাহকের সংগ্রহ-চরিত্রের ধারার ভিত্তিতে, সংগ্রহসমূহের বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাপকাঠিতে।

প্রথম স্তরে আসে ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অনিয়মিত ভ্রমণকারীদের প্রচেষ্টার কথা। তাঁরা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কিছু পুরাকাহিনী, কিংবদন্তী ইত্যাদি প্রকাশ কবেছিলেন। দ্বিতীয় স্তরে ব্রিটিশ শাসনেব বুনিয়াদ যতই শক্ত ও পাকা হতে থাকে ততই বেশী সংখ্যায় কিছুটা সৌখিন অথচ পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক বেশী উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, মানববিদ্যাবিদ, ফোকলোর বিশাবদ, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও জাতিতত্ত্ববিদ্, ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্মচারী ও মিশনারী এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে শুরু কবেন। সরকারের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক ও পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন উপলক্ষে এবং ধর্মীয় মিশনের কার্যনির্বাহ করতে গিয়ে তাঁরা দেশীয় লোকদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের আগ্রহ বোধ করেন এবং ফোকলোর উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এসব প্রশাসনিক কর্মচারী ও মিশনারী সাধারণত লোককাহিনী, লোকবিশ্বাস ও লোকাচার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। কারণ, তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের মনকে বুঝতে ও জানতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে তাঁদের এ প্রচেষ্টা শাসনযন্ত্রের সমর্থন পেয়েছিল। প্রশাসনিক রীতি ও নিয়মকানুনের যথোপযুক্ত রদবদলের জন্যে কিছু কিছু সরকারী কর্মচারী তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জনসাধারণের ভাষা, আচার প্রথা, অনুষ্ঠান, ধর্মীয় মনোভঙ্গি, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক অভ্যাস, জীবন ধারণ-ব্যবস্থা ও তাঁদের মধ্যে প্রচলিত পৌরাণিক ও কাহিনীর ব্যাপক অনুশীলন করেছিলেন। লোককাহিনী সংগ্রহই এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না বলে তাঁরা সাধারণত জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াসে নিতান্ত অপটুভাবে কিছু কিছু কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। পাদটীকা, টিপ্পনী, ব্যাখ্যামূলক নির্দেশিকা এবং নির্ঘণ্ট ইত্যাদি প্রায় কোন সংগ্রহেই সন্নিবেশিত হ'ত না। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে 'ফোকলোর সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা এবং 'ফোকলোর রেকর্ড' নামক পত্রিকা

প্রকাশনার সাথে সাথেই নতুন ধরনের ফোকলোর গবেষণা ও অনুশীলনের সূত্রপাত হয়। এই নতুন চিন্তাভঙ্গি ও গবেষণা পদ্ধতি ১৮৭৮ সাল থেকে ১৯২০ সালের মধ্যকার সময়ের ফোকলোর সংগ্রাহকদের মনোভঙ্গিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ফোকলোর সংগ্রহের তৃতীয় কালস্তর ছিল ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এই স্তর অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পন্ডিতদের মূল্যবান অবদানে সমৃদ্ধ। তাঁদের তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি লোক-কাহিনী সংগ্রহ ও চর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমানকাল পযন্ত প্রসারিত এর চতুর্থ স্তরটির বিশেষত্ব হচ্ছে, স্বাধীনতা লাভের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে জাতীয় ভাবধারার বিকাশ। এ চারটি কাল-স্তবের প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তৃত ও ব্যাপকতর আলোচনার অবতারণা করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। যতদূর সম্ভব প্রথম কালস্তরের লোককাহিনী সম্বলিত গ্রন্থসমূহের ও প্রবন্ধের কথা বিস্তারিত আলোচনা করা এবং গ্রন্থ নির্দেশিকাতে আলোচনার গণ্ডীভুক্ত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদির উল্লেখ করাই এখানে আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

এখানে ভারতীয় উপমহাদেশে লোক কাহিনীর তিনটি উৎসের কথা প্রথমেই উল্লেখ করে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করছি। এগুলো অবশ্য যথার্থ লোক কাহিনী সংগ্রহের পযায়ে পড়ে না। এ তিনটি উৎস হচ্ছে—আদমশুমারী রিপোর্ট, গেজেটিয়ার্স এবং ভারতীয় উপমহাদেশের পত্র-পত্রিকাসমূহ। আদমশুমারী রিপোর্টগুলোতে শুধু লোক সংখ্যারই উল্লেখ থাকতো না, তাতে সামাজিক অভ্যাস ও প্রথা, লোক-বিশ্বাস, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, দেবদেবী, লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী এবং ফোকলোরের আরও অনেক উপাদান সন্নিবেশিত থাকতো। যে-সব প্রশাসনিক কর্মচারী আদমশুমারী রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের মধ্যে হার্বার্ট এইচ, রিজলে (১৮৯১), উইলিয়াম ক্রুক (১৮৯৬), স্যার এডওয়ার্ড আলবার্ট গ্যেট (১৯০১), রবার্ট ভ্যান্স রাসেল (১৯০১), হোরেস আর্থার রোজ, (১৯০২, ১৯১১), জেমস্ টি, মার্টন (১৯১১) এবং উইলিয়াম এইচ্ সুবার্ট (১৯৩১)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রখ্যাত প্রশাসনিক কর্মচারীদেব দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত 'ইম্পিরিয়াল গ্যাজেটিয়ার' এবং ভারতেব জেলা 'গ্যাজেটিয়াব'গুলো এ ব্যাপারে সমান গুরুত্বের অধিকারী। ওয়ালটাব হ্যামিল্টন সম্পাদিত দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'দি ইষ্ট ইন্ডিয়া গ্যাজেটিয়াব' (১৯২৮) এবং উইলিয়াম উইলসন হান্টার সম্পাদিত ছাব্বিশ খণ্ডে প্রকাশিত 'দি ইম্পিরিযাল গ্যাজেটিয়ার্স' (১৮৯২, ১৯০৭-০৯)[১]-এ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত নানা লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনীসহ বিপুল পবিমাণ ফোকলোরের উপাদান সন্নিবেশিত হযেছে।

বুকানন হ্যামিলটন, পার্সি, হেমিংওয়ে, স্যার চার্লস গ্রান্ট, উইলিয়াম ফ্রান্সিস, লেঃ কর্ণেল হেন্‌রী মায়ার্স ইলিয়ট এবং রেজিনাল্ড এডওযার্ড এন্‌থোভেন প্রমুখ বিখ্যাত পন্ডিত ও বিচক্ষণ প্রশাসকগণ সম্পাদিত 'দি ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার্সগুলো ঐ ধরনের উপাদানে সমৃদ্ধ। এসব ছাড়াও 'জার্ণাল অব দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগল' (কলিকাতা ১৮৩২--

উইলিয়াম উইলসন হান্টাব কর্তৃক প্রথমে সংকলিত 'দি ইম্পিবিয়াল গ্যাজেটিয়ার্স অব ইণ্ডিযা' (২৬ খণ্ড), পরে স্যাব হাবার্ট এইচ, বিজলে, উইলিয়াম স্টিভেনসন মেয়াব, বিচার্ড বার্ণস এবং জন স্টেডম্যান কটন কর্তৃক বহুলাংশে সংশোধিত, পুনর্লিখিত এবং সম্পাদিত হযে প্রকাশিত হযেছে (১৯০০-০৯)।

৩৪), 'ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়্যারী' (বোম্বে, ১৮৭২-১৯৩৩), 'দি পাঞ্জাব নোটস্ এ্যান্ড কোয়্যারীজ' (১৮৮৩-৮৭), 'জার্ণাল অব দি এ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সোসাইটি অব বোম্বে' (কলকাতা, ১৮৮৬-১৯৩৬), 'নর্থ ইন্ডিয়ান নোটস্ এ্যান্ড কোয়্যারীজ' (১৮৯১-১৮৯৬ বেংগল), (কলিকাতা ১৯০৫ এফ এফ), 'দি জার্ণাল অব দি বিহার এ্যান্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি (সরকারী মুদ্রণ, বিহার এবং উড়িষ্যা, ১৯১৫ এফ এফ) এবং 'মেন ইন ইন্ডিয়া' (রাঁচী, ১৯৩২ এফ এফ) ইত্যাদি ভারতীয় উপমহাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ফোকলোরের উপাদানসমূহের কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের প্রচুর ফোকলোরের উপাদান অ-ভারতীয় উপমহাদেশীয় পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। ঐসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'ফোকলোর রেকর্ডস্' (১৮৭৮-১৮৮২), 'ফোকলোর জার্ণাল' (১৮৮৫-১৮৮৯), 'ফোকলোর' (১৮৯০ এফ এফ), 'জার্ণাল অব আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি' (১৮৪৩ এফ এফ), 'আমেরিকান জার্ণাল অব ফিললজী' (১৮৮০ এফ এফ), 'জার্ণাল অব আমেরিকান ফোকলোর' (১৮৮৮ এফ এফ), 'মেন' (১৯০১ এফ এফ) এবং 'প্রসিডিংস অব আমেরিকান ফিলসফিক্যাল সোসাইটি' (১৯৩৫ এফ এফ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে অ-ভারতীয় উপমহাদেশীয় সমস্ত পত্র-পত্রিকার আলোচনা সম্ভব নয়, তবে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকার কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশীয় ফোকলোরের অনুসন্ধিৎসু পাঠকেব উল্লেখিত পত্র-পত্রিকার সবগুলো সংখ্যাই পড়ে দেখা উচিত।

প্রথম কাল-স্তর : ১৮৩৮-১৮৭৮

ফোকলোর ও জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত উপাদান সংগ্রহের প্রথম পর্যায়ের সৌখিন প্রচেষ্টার প্রারম্ভিক ফল দাঁড়িয়েছিল লোকমুখ থেকে সংগৃহীত কাহিনী, লোকবিশ্বাস ও প্রথার বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু উপাদানের সংকলন। সময়েব সাথে সাথে ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদ যতই শক্ত হতে লাগল, ততই তাঁরা এদেশ ও এদেশের অধিবাসীদের মনকে জানা ও বোঝার তাগিদ তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করতে লাগলেন। বিশেষতঃ প্রশাসনিক কর্মচারীবা নিজেরা এটা ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে, ফোকলোর ও জাতিবিদ্যা সম্পর্কিত নানা তথ্য, মানববিদ্যা সম্পর্কিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি এবং ভাষাতাত্ত্বিক নানা উপাদান সংগ্রহের কাজ দেশীয় লোকদের সম্পর্কে তাঁদেব জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য কববে—একদিকে দেশীয় লোকদের ওপরে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে জোরদার করতে পারবে এবং অপর দিকে সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের পথ সুগম হবে। অবশ্য এসব বিষযের অনুশীলনের আপেক্ষিক মূল্যও সুদূরপ্রসারী সুফল পরবর্তীকালে উপলব্ধ হয়েছে। ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যখন ভারতীয় উপমহাদেশে নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রহস্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবলেন, তখন তাঁরাও বেশী করে তথ্য সংগ্রহেব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সামাজিক সংস্থা কেন্দ্রিক গবেষণায় ইউরোপীয় পন্ডিত ও লেখকগণ প্রায় সর্বদাই নানা উপজাতির প্রাচীন বিবরণ থেকে বহু পরিশ্রমে আবিষ্কৃত সামাজিক প্রথা, লোকবিশ্বাস সম্পর্কিত নানা তথ্য অথবা লোককাহিনীর উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। অথচ, একথা অস্বীকাব কবা যায় না, সেক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশে যে-কোন একটিমাত্র গ্রামেব দৈনন্দিন কর্মধারার সুসংবদ্ধ বিবরণী তার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভুল ও নিখুঁত তথ্যের যোগান দিতে পারে।

তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এ-নতুন উদ্যমের পেছনে সরকারী উদ্যোগও যথেষ্ট কাজ করেছিল। ১৮৫৮ সালে ইংল্যান্ডের রাণী কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর শাসন-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল। একমাত্র ঘনিষ্ঠতর জনসংযোগের মাধ্যমেই যে তা সম্ভব ছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। ঐ দিকে লক্ষ্য রেখেই রেভারেন্ড স্টিফেন হিসলপ, স্যার রিচার্ড টেম্পল, ক্যাপ্টেন লিউইন, লেঃ কর্ণেল উইলিয়াম বোজ কিং এবং এডওয়ার্ড টাইউট ডাল্টন প্রভৃতি কতিপয় উদ্যমশীল প্রশাসনিক কর্মচারী এবং মিশনারী বিশেষ শ্রমসহকারে লোকজীবনের নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং ঐগুলো ইংরেজীতে প্রকাশ করেছিলেন।

মিসেস মেরিয়ান পোস্টেন্‌স নাম্নী এক মহিলা এই ধরনের সংগ্রহ ও অনুশীলন কাজের অন্যতম অগ্রপথিক ছিলেন। তিনি কোন সরকারী কর্মচারী ছিলেন না, কিন্তু তিনি একজন প্রশাসকের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর রচনার কোন এক স্থানে বোম্বের ভূতপূর্ব গভর্ণর ফিট্‌জ গিবনের উল্লেখ থেকে মনে হয় তিনি গভর্ণরের বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। তাঁর 'কচ্ছ' নামীয় গ্রন্থটি (লন্ডন, ১৮৩৮) চমৎকার ফিল্ড ওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। বইএর ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

> "কচ্ছে কয়েক বছর বাসকালে ধারাবাহিকভাবে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, বর্তমান গ্রন্থ তারই পরিণত ফল ; ঐ সময়ে আমি কচ্ছের নানা বর্ণের মানুষের সামাজিক রীতিনীতি ও গার্হস্থ্য জীবন ধারার সাথে পরিচিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ উপভোগ করেছি।"[২]

মুখ্যতঃ হিন্দু অধ্যুষিত কচ্ছ হচ্ছে পশ্চিম ভারতীয় উপমহাদেশের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল। এর পশ্চিম দিক বেষ্টন করে রয়েছে সিন্ধু নদ, পূর্ব দিকে গেছে কচ্ছ উপসাগর এবং লবণাক্ত পলিমাটির এলাকা, উত্তর দিকে রয়েছে বিশাল থর মরুভূমি এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে সমুদ্র। এ অঞ্চলটি দৈর্ঘ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিমে একশত ষাট মাইল এবং প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে পঁয়ষট্টি মাইল। এ-স্থানের অধিবাসীদের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, কৃষি পদ্ধতি, নারীদের পোশাক, জলবায়ু, গার্হস্থ্য রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার প্রভৃতি অনেক কিছুর বর্ণনা ছাড়াও মিসেস পোস্টেন্‌স কিছু লৌকিক কাহিনী গল্পও লিপিবদ্ধ করেছিলেন। 'রাজপুত্র শামপুর', 'কুমারী সারদীয় এবং অজগর' (পৃ: ১০৪-১০৯) নামক কাহিনীর মাধ্যমে তিনি সর্পপূজা সম্পর্কে প্রচলিত খুব কৌতূহল-উদ্দীপক একটি লৌকিক কাহিনী আমাদের উপহার দিয়েছেন। তিনি এটি সংগ্রহ করেছিলেন "কচ্ছের অতীত ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে পরিচিত, জাতিতে স্বয়ং ব্রাহ্মণ একজন বুদ্ধিমান দেশীয় লোকের কাছ থেকে"।[৩] অন্যান্য গল্প ও লৌকিক কাহিনীর মধ্যে রয়েছে, 'পুমকে-গুড়' (পৃ: ১৫৫-১৫৭), 'লাক-কে ফুলমায়' (পৃ: ১৯৫-৯৬), 'সাত অর লাক', (পৃ: ১৯৭-১৯৯) 'সুসী এবং পুনোন', (পৃ: ১৯৯-২০২) এবং 'একটি ছোট সর্প সম্পর্কিত লৌকিক কাহিনী', (পৃ: ২৫৬, পাদটীকা)। নামধামহীন এই লৌকিক কাহিনীগুলো লোকমুখ থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। কচ্ছের লোকদের গল্প বলার অভ্যাস সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন :

২. 'কচ্ছ' ভূমিকা, পৃ ৮
৩. ঐ ঐ পৃ ১০৯

"কচ্ছের অধিবাসীরা প্রাচীন কাহিনীতে গীত এবং অভিনীত তাদেব পূর্ব-পুরুষদেব ক্রিযাকলাপেব কাহিনী শুনে খুবই উৎফুল্ল হয। প্রাচীন কালেব এই কাহিনীগুলোর একটি সংগ্রহ খুবই আকর্ষণীয় হবে মনে করি। আমার বিশ্বাস এসব কাহিনী আজও গ্রাম্য চাবণ কবিদের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব আজ ঘুমিয়ে পড়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যুদ্ধ বিগ্রহেব কাহিনী স্বপ্নের ন্যায় মিলিয়ে গিয়েছে।[৪]

পোষ্টেন্‌স তাঁর সংগ্রহে সাহিত্যিক উৎস থেকে গৃহীত কিছু কাহিনীও অন্তর্ভুক্ত করেছেন—যেমন 'দি রোমান্স অব দি ম্যারেজ অব লাভ এ্যান্ড বিউটি' (পৃ: ২০৮–২০৯), 'ট্রাষ্ট ইন গড' (পৃ: ২১১–২১২ ; ইরানী কবি সা'দীর রচনা থেকে গৃহীত) এবং পঞ্চতন্ত্রের কাসিফিকৃত ফার্সী অনুবাদ "আনওয়ার সোহ্‌লী" থেকে গৃহীত 'পথিক ও সাপের কাহিনী'। যদিও 'কচ্ছ' নামীয় এ গ্রন্থটি লোককাহিনী সংগ্রহ গ্রন্থ নয়, তবে প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

প্রথম যুগের পলিনেশিয়ান গদ্য ও কবিতা সংগ্রহ সম্পর্কে লুমেলার সুচিন্তিত মন্তব্য আলোচ্য যুগের ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব প্রশাসনিক কর্মচারী ও মিশনারী ফোকলোর সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। মাঝে মাঝে তাঁরা দুঃখের সাথেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশীয় ভাষা সম্পর্কে তাঁদেব জ্ঞানের অভাব তাঁদের ধর্মীয় ও লোকবিশ্বাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়াও যেসব দোভাষীর সাহায্য তাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরাও ইংরেজী জ্ঞানের স্বল্পতার জন্যে সব সময় যথাযথ সকল কথা তাঁদের গোচরীভূত করতে পারেননি।[৫] উনিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের সকল অনুসন্ধানীদের ন্যায় মিসেস পোষ্টেনস এই সীমাবদ্ধতার অসুবিধা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃই প্রশাসনিক কর্মচারী ও মিশনারীরা দেশীয় ভাষার সাথে গভীরতবভাবে পরিচিত হয়ে এ অসুবিধা কাটিয়ে উঠেছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত মিস মেরী ফ্রেরে সম্পাদিত "ওল্ড ডেকান ডেজ" গ্রন্থটিই লোকমুখে প্রচলিত ভাবতীয় উপমহাদেশীয় লোককাহিনীর প্রথম সংগ্রহ হিসেবে পাশ্চাত্যের সুধী সমাজের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। এর আগে মাঝে মাঝে লোককাহিনীর যেসব নমুনা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো গুণগত দিক দিয়ে যেমন দরিদ্র ছিল, পরিমাণের দিক থেকেও তেমনি ছিল সামান্য। প্রশাসনিক কর্মচারীদের রিপোর্ট এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্তসম্বলিত বইগুলোতে এতদসম্পর্কিত উপাদানের স্বল্পতা লক্ষণীয়। কয়েকটি লোকমুখে প্রচলিত ভারতীয় উপমহাদেশীয় কাহিনী ইতিপূর্বে ভ্রমণবৃত্তান্ত-সম্বলিত পুস্তক অথবা বর্ণনামূলক রচনাতে প্রকাশিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ টমাস বেকনের 'ওরিয়েন্টাল এ্যানুয়াল' (২য় খণ্ড, লন্ডন, ১৮৪২) এবং ক্যালেব বাইটের 'ইন্ডিয়া এ্যান্ড ইটস্ ইনহ্যাবিটেন্টস্' (সিনসিনাটি, ১৮৫৬) গ্রন্থ দু'টির নাম উল্লেখ করা যেতে পাবে। কোন কোন প্রশাসনিক কর্মচারী বিভিন্ন অঞ্চলে সফররত থাকাকালে অথবা বিশেষ কোন কুপ্রথা বন্ধ কবার জন্যে প্রশাসনিক কর্তব্য

৪ ঐ ঐ পৃ. ১৪১

৫ "সার্ভে অব রিসার্চ অন পলিনেশিয়ান প্রোজ এ্যান্ড পয়েট্রি" প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছে আব এম. ডবসন সম্পাদিত "ফোকলোব রিসার্চ এরাউন্ড দি ওয়ালড" (ব্লুমিংটন ১৯৬১, পৃ ১৩৮) গ্রন্থে।

সম্পাদন ব্যপদেশে লোকমুখে প্রচলিত বহু আখ্যায়িকা সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ধরনেব প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বহনকারী সকল পুস্তকের নামের দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন না করে মেজর জেনারেল স্যার উইলিয়াম শ্লীম্যানের "র‍্যাম্‌বলস্ এ্যান্ড রিকালেকশানস্ অব এ্যান ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল (লন্ডন, ১৮৪৪) গ্রন্থটি এই শ্রেণীর রচনার প্রতিনিধিত্বমূলক প্রয়াস হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। শ্লীম্যানের আত্মবিবরণীতে ভারতে একজন প্রশাসনিক কর্মচারী হিসেবে তার সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার ফসল তুলে ধরা হয়েছে। শ্লীম্যানের "র‍্যাম্‌বলস্ এ্যান্ড রিকালেকশনস্" (লন্ডন, ১৯১৫) এর সম্পাদক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট এ স্মিথ যথার্থই বলেছেন : "জাতিতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ, ভূতত্ত্ববিদ, সৈনিক এবং মিশনারী প্রত্যেকেই এই বইয়ে নিজ নিজ রুচিমাফিক কিছু না কিছু পাবেন"।[৬] কিন্তু লোককাহিনী বিশারদদের কাছে এ বইয়ের তেমন কোন তাৎপর্য নেই। শ্লীম্যান তাঁর গ্রন্থে কেবল কয়েকটি ডাইনীমন্ত্রের কাহিনী (পৃ: ৫৫-৭২) এবং ঠগী দস্যুদের কিছু কাহিনী (পৃ: ৭৭-৯১) উল্লেখ করেছেন।

লোককাহিনীর দিক থেকে বলতে গেলে টি. বেকনের 'ওরিয়েন্টাল এ্যানুয়াল' (২য় খণ্ড), ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক পুস্তক হলেও শ্লীম্যানের 'র‍্যামব্‌লস এ্যান্ড রিকালেকশনস্' বইটির চেয়ে যে অনেক উন্নতমানের বচনা তা স্বীকার করতেই হয়। কারণ "এতে এক সঙ্গে অনেক গল্প, লৌকিক কাহিনী ও ঐতিহাসিক বোমান্সধর্মী আখ্যায়িকা স্থান পেয়েছে।"[৭]

দুই খণ্ডে প্রকাশিত বেকনের 'দি ওরিয়েন্টাল এ্যানুয়াল' ঐ একই শ্রেণীর অন্য দু'টি পুস্তক 'দি র‍্যামবলস' এবং 'ইন্ডিয়া এ্যান্ড ইট্‌স্ ইনহ্যাবিটেন্টস' অপেক্ষা ভারতীয় উপমহাদেশে লোক কাহিনী ও লোক গল্পের সার্থকতার পরিচয়বাহী গ্রন্থ। যদিও বেকনেব বইটি বিশুদ্ধ ভ্রমণকাহিনীমূলক, তবে তিনি ভ্রমণ ব্যপদেশে বেশ কিছু সংখ্যক লোককাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। এ বইয়ে সন্নিবেশিত 'দি স্টোরি অব রাঙ ভাওয়াইন'[৮] একটি সুনির্দিষ্ট লোককাহিনী। এ বইয়ের অন্যত্র সন্নিবেশিত একটি অতি সুন্দর উন্নতমানের লোককাহিনীর[৯] প্রতি ফোকলোর রসিক মাত্রই আকৃষ্ট হবেন। চিবাচরিত ভারতীয় উপমহাদেশে কাহিনী বলাব পদ্ধতি সম্পর্কে বেকন লিখেছেন :

> ভাব-কল্পনাপ্রবণ এশীয়বা মুহূর্তেব মধ্যেই সুদূব অতীতকালে বিলীযমান ক্ষীণ দৃশ্যপটগুলোকে মনেব পর্দায তুলে ধরে নবমহিমায় উদ্ভাসিত কবে তুলতে পাবে এবং অনাযাসে এমন একান্ত জীবনানুগ ভঙ্গিতে বঙে-রেখায় শ্রোতাদেব কাছে উপস্থিত কবতে পারে যাতে কবে মনে হয তাবা যেন গোটা দৃশ্যটাই প্রত্যক্ষ করছে। সব সমযই গল্প বলাব অনুবোধ বক্ষা কবতে হয বলে তাব আখ্যান বর্ণনের ক্ষমতাও যথেষ্ট বাড়ে। কাবণ সকল প্রাচ্য দেশীয পবিবাবেই আখ্যাযিকাব প্রতি গভীব আসক্তি লক্ষ্য কবা যায। এমন দিন তাদেব বড় একটা যায না যে-দিন তাদেব কেউ না কেউ নিজেদেব জীবনেব পৃষ্ঠা থেকে অথবা তাদেব পূর্বপুরুষদেব জীবনঐতিহ্য সম্পর্কে কিছু না কিছু কাহিনী অংশ আবৃত্তি না

---

৬ ব্যামবলস্, পৃ. ৪।

৭ ডব্লিউ নবম্যান ব্রাউন "দি পঞ্চতন্ত্র ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান ফোকলোব" জার্ণাল অব আমেবিকান ওবিয়েন্টাল সোসাইটি (জে-এ-ও-এস), ৩৯শ সংখ্যা (১৯১৯), পৃ. ৪৪

৮ দি ওবিযেন্টাল এ্যানুযেল, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৬-[illegible]

৯ ঐ, পৃ ১০৬-১১৬

করে। সুশীল পাঠকের কথা মনে রেখেই আমি অন্তরের সাথে অকুণ্ঠভাবে কামনা করছি, এসব নিরক্ষর অথচ আশ্চর্যরূপে মুখর লোকগুলো যেরূপ নিখুঁত ও বিস্তৃতভাবে এবং আকর্ষণীয়রূপে গল্প বলে, আমি যদি তার অর্ধেক ক্ষমতাও আমার বর্ণনায় লৌকিক কাহিনী কথনে সঞ্চারিত করতে পারতাম! মূল কাহিনীর সজীবতা ও শক্তিমত্তা যতদূর সম্ভব সংরক্ষণের আশায়, ভারতে থাকাকালীন দেশী লোকদের কাছ থেকে আমি যে-সব কাহিনী, ঐতিহাসিক অথবা অন্যবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম, যতটা সাধ্য তাদেরই মুখের ভাষায় তার সবটারই বিবরণী তৈরী করার কোন সুযোগই আমি হারাই নি।

বাস্তবিক আমি নিজেই আমোদ পেতাম বলেই এসব গল্প বলিয়ে লোকদের সাথে বসে যে-সব কাহিনী উপভোগ করেছিলাম, প্রায় সময়ই তার সমস্তটাই নোট করে ফেলতাম।... যেখানেই আমার পক্ষে সম্ভব, সেখানে আমি আমার নীরস বিবৃতির পরিবর্তে পাঠককে এ সকল জীবন্ত ছবি উপভোগ করার সুযোগ দেওয়া বেশী পছন্দ করেছি। আমি জানতাম, আলোচ্য বিষয়ের বিবৃতি ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনে আমি যদি কাহিনী বর্ণনার কাজ প্রায় সবটাই আমার গল্পকথকের ওপর ছেড়ে দেই তাহলে আমাকে তার জন্য কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।"[১০]

তথ্য বা সংবাদ পরিবেশকের অথবা গল্পকথকের নিজের ভাষা ও ভঙ্গিতে কাহিনী উপস্থাপন করার এ কৌশলটাই বেকনের বিশেষত্ব। বেকন যদিও কোথাও কাহিনীর মূলপাঠটি দেন নি, তথাপি তাঁর অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুগ।

বই-এর প্রথম খণ্ডের অন্যান্য কাহিনীর মধ্যে 'দি বানিয়াজ ভাউ' (বনিকের শপথ, পৃ: ১৯৬-২১২) এবং 'দি ব্রাহ্মিণ এ্যান্ড দি গোট' (ব্রাহ্মণ এবং ছাগল, পৃ: ২১২-২২৮) খাঁটি ভারতীয় উপমহাদেশীয় লোককাহিনীর প্রাতিনিধিত্বমূলক দৃষ্টান্ত। বেকনের বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে লোককাহিনীর চেয়ে ঐতিহাসিক রোমান্সই সন্নিবেশিত হয়েছে বেশী সংখ্যায়। প্রফেসর ব্রাউনের মতে, "দ্বিতীয় খণ্ডে কয়েকটি লোককাহিনী আছে"[১১] কিন্তু ঐ কাহিনীগুলো যতটা "লোক-জীবন সম্পৃক্ত", তার চেয়ে অনেক বেশী ইতিহাস-রসাশ্রিত।

লোককাহিনীর রহস্যানুসন্ধিৎসু ছাত্রদের কাছে ক্যালেব রাইটের 'ইন্ডিয়া এ্যান্ড দি ইনহ্যাবিটেন্টস্' বইটির মূল্য অতি সামান্যই। রাইট ছিলেন একজন আমেরিকান পর্যটক। তিনি দেশীয় লোকদের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যাপকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। এসব উপাদান পরে তিনি বক্তৃতায় ব্যবহার করবেন, এমনি একটি অভিপ্রায় তাঁর ছিল।

মিস ফ্রেরে-এর আগে প্রথম উল্লেখযোগ্য লোককাহিনীর সম্ভার হচ্ছে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে স্যার রিচার্ড টেম্পল সম্পাদিত 'পেপারস্ অব রেভারেন্ড এম. হিসল্প রিলেটিং টু এ্যাবোরিজিনাল ট্রাইবস্ অব দি সেন্ট্রাল প্রভিন্সেজ'। এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই স্টিফেন হিস্লপের কথা উল্লেখ করেছি। হিস্লপ নাগপুর অঞ্চলের আদিম উপজাতিদের বিশেষত. গণ্ডদের ভাষাসমূহের অনুশীলন করেছিলেন এবং তাদের ফোকলোরের একটি সংগ্রহ গ্রন্থ তৈরী করেছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হিস্লপ বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভায়

১০ ঐ, প ১০৭-৮

১১ ব্রাউন, জে-এ- ও-এস, ৩৯শ সংখ্যা (১৯১৯), পৃ ৪৪

যে নিবন্ধটি পাঠ করেছিলেন তা' সাদর প্রশংসা অর্জন করেছিল। হিস্‌লপের সংগ্রহ–সম্পর্কিত রিচার্ড টেম্পলকৃত সংস্করণই প্রথম প্রচুর সংখ্যক লোককাহিনী লিপিবদ্ধ করা এবং তাদের সাহিত্যিক রীতিতে মূলপাঠের সাথে সন্নিবেশিত করে সাধারণ্যে উপস্থিত করার ঐকান্তিক প্রয়াস। দুঃখের বিষয় হিস্‌লপের এ আন্তরিক প্রয়াসও এক্ষেত্রে কোন কার্যকরী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়নি। কারণ সাধারণ পাঠকগণ বইটিতে প্রকটিত ভাবভঙ্গি ও ক্লান্তিকর পাণ্ডিত্যের জন্যে অনেকটাই এর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিল। এই বইয়ে লিপিবদ্ধ লৌকিক–কাহিনী এবং গল্পগুলো মধ্য–ভারতীয় গন্ড নামক উপজাতীয় লোকদের প্রিয় গানগুলো থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। টেম্পল্ এগুলোকে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করেছিলেন। একটি পৃথক পরিচ্ছেদে রোমান হরফে হিস্‌লপ যেমনভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তেমনিভাবে গন্ড ভাষায় গানগুলো ভাষ্য দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে অবশ্য তার ইংরেজী প্রতিরূপও দেওয়া হয়েছিল। গানগুলো আখ্যায়িকাধর্মী হলেও ইংরেজী গাথার দৃঢ়বদ্ধতা, নাটকীয়তা ও বাস্তবধর্মীতার স্বভাব এতে খুব বেশী প্রকট। যে কেউ "লিজেন্ডস অব দি পাঞ্জাব" (৩য় খণ্ড, বোম্বে, ১৮৮৪–১৯০০) গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত কাহিনীগুলোর সাথে এ গানগুলোর তুলনা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে গানগুলো ছন্দায়িত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর দু'বছর পরে মিস্ ফ্রেরের অসাধারণ মূল্যবান সংগ্রহ গ্রন্থ "ওল্ড ডেকান ডেজ অর হিন্দু ফেয়ারী লিজেন্ডস্ কারেন্ট ইন সাইউ ইন্ডিয়া" প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বত্র লোককাহিনী সংগ্রাহকদের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বইটি বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিশেষ আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করবার মতো বিষয় এই যে, যদিও লন্ডনে ফোকলোর সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দশ বছর আগেই মিস ফ্রেরের সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল, তবু পরবর্তীকালে সোসাইটি কর্তৃক লোককাহিনী সম্পাদনার ক্ষেত্রে যেসব মূলনীতি অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, মিস ফ্রের দশ বছর পূর্বেই ভারতীয় উপমহাদেশে বসে তার কিছু কিছু অনুসবণ করেছিলেন। এদিক থেকে তিনি ইংল্যান্ডের ফোকলোব সোসাইটি গবেষণা রীতির পথ–প্রদর্শিকা। এই মূলনীতিগুলোর একটি হোল কাহিনী-কথকের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি প্রদান। ফ্রেরে তাঁর কাহিনীদাত্রীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর সংগৃহীত কাহিনীগুলো ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ব্যাপক জনপ্রিয় কাহিনীগুলোর টাইপ ও মোটিফ এর প্রতিনিধিত্বমূলকও বটে। উইলিয়াম নর্ম্যান ব্রাউন যথার্থই বলেছেন, "লায়ন এ্যান্ড হেয়ার" (সিংহ ও খরগোস পৃ. ১৫৬) কাহিনীটি ছাড়া তাঁর সব কাহিনীই লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীর গোত্রভুক্ত।[১২] বইটিব এক পান্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন মিস্ ফ্রেরের পিতা তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর স্যার বার্টল ফ্রেরে। ১৮৬৫–৬৬ সালের শীতের দিনগুলোতে তিনি পিতাব সাথে তিন মাসব্যাপী সফর কালে এই কাহিনীগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। বিরাট দলের মধ্যে তাঁর একমাত্র মহিলা সঙ্গী ও আয়া এ্যানা ডি. সুজা এ কাহিনীগুলো তাঁর কাছে বিবৃত করেছিল।

যতই দিন যেতে লাগল সরকারী আমলা ও মিশনারীদের দৃষ্টি ক্রমশঃ সমতল থেকে পাহাড়ের দিকে, পল্লী থেকে অরণ্যের দিকে, সুসংবদ্ধ সমাজ থেকে অসংবদ্ধ উপজাতিদের দিকে নিবদ্ধ হতে লাগল। ১৮৭০ সালে দু'জন সরকারী পদস্থ কর্মচারী দুটি বিভিন্ন উপজাতি

১২. ব্রাউন, জে–এ–ও–এস, ৩৯শ সংখ্যা (১৯১৯), প্ ১৩

সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। নীলগিরি অঞ্চলের প্রশাসক লেঃ কর্ণেল উইলিয়াম রোজ কিং ১৮৭০ সালের ৩রা মে লন্ডনের 'এনথ্রোপোলোজিক্যাল সোসাইটি'র সভায় "এ্যবোরিজিনাল ট্রাইবস্ অব দি নীলগিরি হিল্‌স" শীর্ষক একটি নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন। ঐ বছরই নিবন্ধটি সোসাইটি কর্তৃক 'জার্ণাল অব এনথ্রোপোলোজি'তে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালের জাতিতত্ত্ব ও মানববিদ্যার গবেষকদের কাছে কিং-এর এ গবেষণা পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল। কিন্তু লোককাহিনী সংগ্রাহকদের কাছে এর তেমন বিশেষ আবেদন ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের এককালীন ডেপুটি কমিশনার টমাস হারবার্ট লিউইন তাঁর 'ওয়াইল্ড রেসেজ অব সাইথ-ঈষ্টার্ণ ইন্ডিয়া' (লন্ডন, ১৮৭০) নামক গ্রন্থটিতে ঐ অঞ্চলের সকল উপজাতির এক প্রামাণ্য জাতিতাত্ত্বিক জরিফের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ-সব উপজাতির বাসস্থান বর্তমান বাংলাদেশের কর্ণফুলী, সঙ্গ বা সাংগো, মাতামুহুরী এবং ফেণী প্রভৃতি নদীগুলোর চারপাশেই ছড়িয়ে রয়েছে। যেসব উপজাতির কথা লিউইন তাঁর বইতে বলেছেন, তাবা হচ্ছে খাইউন অথবা চাকমা, টিপ্‌রা, লুসাই এবং কুকী ও তাদের নানা প্রজাতি। জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মূল্যায়নে লিউইনের গ্রন্থ এর পূর্ববর্তীদের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। লিউইন এসব বিভিন্ন উপজাতির লোকদের মধ্যে প্রচলিত কিছু কিছু পৌরাণিক কাহিনী (পৃ. ১২৩-১২৬) এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত কাহিনীও (পৃ. ২৩৮-২৪০) লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্যে ১৮৭২ সালটি ভারতীয় উপমহাদেশের জাতিতাত্ত্বিক জবিপ ও সমীক্ষার ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ দু'টি ঘটনার একটি হচ্ছে 'দি ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারী' নামক জার্ণালের আত্মপ্রকাশ এবং অপবটি হচ্ছে ডালটনের 'ডেসক্রিপ্টিভ্ এথনোলোজী অব বেঙ্গল' (কোলকাতা, ১৮৭২) গ্রন্থটির প্রকাশনা। যদিও ইউরোপীয় পন্ডিতগণের দৃষ্টি 'দি ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারী' পত্রিকার দিকে বড় একটা পড়েনি, তবুও এ পত্রিকাটি প্রথম পব থেকেই একেবারে মূল উৎস থেকে সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে ফোকলোর এর উপকরণসমূহ প্রকাশ করে চলছিল। ব্রিটিশ ভারত এবং ইংল্যান্ডেব সমসাময়িক আর কোন পত্র-পত্রিকায় সম্ভবত: এত বেশী পরিমাণে ফোকলোর প্রকাশিত হয়নি। প্রথম থেকেই যাঁরা এ পত্রিকায় অবদান যুগিয়ে এসেছেন তাঁদের অন্যতন হচ্ছেন জি. এইচ. ড্যামেন্ট নামক একজন ব্রিটিশ নাগরিক। ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে মোজেমা নাগাদের অভ্যুত্থানের সময় তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি 'দি ইন্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়ারী' পত্রিকার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং নবম পর্বে[১৩] ক্রমাগত লোককাহিনী প্রকাশ কবেছেন। জার্ণালের

১৩. এ পত্রিকায ড্যামেন্টেব অবদান হচ্ছে মোট বাইশটি উপকথা এবং পরীকাহিনী। প্রথম পর্বে বযেছে থম্পসন ববার্টস টাইপ ১৬০-'গ্রেটফুল এ্যানিমাল, আনগ্রেটফুল ম্যান' পৃ ১১৮, টাইপ ৩০২-'দি অগাব্‌স হার্ট ইন দি এগ্' পৃ. ১১৫ ; টাইপ ৩০২ এ-'দি ইউথ সেন্ট টু দি ল্যান্ড অব অগাবস পৃ. ১৭০-১৭২, টাইপ ৪৬২-'দি আউটকাষ্ট কুইন্‌স্ এ্যান্ড দি অগাবস্ কুইনস'. পৃ. ১৭০-১৭২. টাইপ ৫৫১-দি সনস অনদি কোযেষ্ট ফর এ ওযান্ডাবফুল রেমেডি ফব দেয়াব ফাদাব' পৃ. ১১৫-১২০ ; টাইপ ৬৫৫-'দি ওযাইজ ব্রাদার্স, পৃ. ২৮৫ ; টাইপ ৯১৬-'দি ব্রাদার্স গার্ডি ; দি কিংস বেড চেম্বাব এ্যান্ড দি স্নেক, পৃ ২৮৫, টাইপ ৯৩৪-দি প্রিন্স এ্যান্ড দি ষ্টর্ম, পৃ. ২৮৫-২৮৬ ; এবং টাইপ ১৫২ জি-'দি থিপ এ্যাসিউম্‌স ডিস্‌গাইডেন্স, পৃ. ২৮৫-৮৬, অন্যান্য টাইপ হচ্ছে ৪৬৭ ; দি কোযেষ্ট ফর দি ওযান্ডাব ফ্লাওয়াব, ২য সংখ্যা পৃ. ৩৫৭, টাইপ ১৭৩০, দি পাবসন, দি সেক্সটন এবং দি চার্চ ওযার্ডেন ভিজিটস্ দি বিউটিফুল উইমেন, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৩৫৭-৩৬৬ ; টাইপ ৬৬এ, দি কেভ কল, ৩য সংখ্যা, পৃ. ১০ টাইপ ৪৮০ 'দি পাবস্যুট অব

প্রথম পর্বে প্রকাশিত তাঁর সন্দর্ভ "বেঙ্গলী ফোকলোর ফ্রম দিনাজপুর" (পূর্ব বাংলাদেশ ভুক্ত)–এ বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রচলিত কতকগুলো কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছিল। বেঙ্গল স্টাফ কোরের কর্ণেল এডওয়ার্ড টুইট ডালটন সি. এস. আই সাহেব যখন তাঁর বিখ্যাত জাতিতাত্ত্বিক জরিপ কাজ চালিয়েছেন, তখন তিনি ছোট–নাগপুরের কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের' কার্যনিবাহী সমিতির সুপারিশক্রমে বাঙলা সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর 'ডেসক্রিপ্টিভ এথনোলোজী অব বেঙ্গল' গ্রন্থটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাঙলাদেশের জনজীবন সম্পর্কে এই ব্যাপক বিস্তৃত গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে কয়েকটি লোকগল্প এবং লৌকিক কাহিনী স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের ২৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "দি স্টোরি অব টু ব্রাদার্স, কর্ম এ্যান্ড ধর্ম" (কর্ম ও ধর্ম দুই ভাইয়ের কাহিনী) কাহিনীটিকে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। "দি রিভার গডেস্" (পৃ ১৫৬) এবং "দি স্টোরি অব সেভেন ব্রাদার্স" (পৃ. ২৬৫) উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর উৎকৃষ্ট নমুনা। ড্যামেন্টের সংগ্রহের মধ্য দিয়েই প্রথম বাঙলা লোককাহিনীগুলো পাশ্চাত্যের সুধীমহলের নজরে আসে। ড্যামেন্ট অথবা ডালটন্ এঁরা কেউ তাদের সংগৃহীত লোককাহিনীগুলো নিয়ে তুলনামূলক কোন আলোচনা বা গবেষণা করেন নি। কিন্তু তাঁরা দুই জনেই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে অগ্রপথিক—একজন বাঙলা লোককাহিনীর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, অপরজন বাঙলা দেশের জাতিতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে।

একথা অবশ্য ঠিক, বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য উপমহাদেশীয় লোককাহিনী সংগ্রহসমূহেব একটা সম্ভাব্য জরিপ করা। তাই এখানে সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত লোককাহিনীগুলোব কোন জরিপ করা সম্ভব নয়। তথাপি ভাবতে লোককাহিনী সংগ্রহের জন্যে এবং ভারতীয় কাহিনীর অনুবাদের জন্য ইউবোপে, বিশেষত: ইংল্যান্ডে তৎকালে যে উদ্যম দেখা গিয়েছিল তাবই স্বাক্ষ্যস্বরূপ মাঝে মাঝে আমবা বেশ লাভজনকভাবেই অসম্পর্কিত নানা তথ্য নির্দেশ কবতে পারি। ১৮৭৩ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ফিলিপ হুইটিংটন জেকবের 'হিন্দ টেল্স্' গ্রন্থটি ঐ উদ্যমের একটি ফল। জেকব তাঁর গ্রন্থে সংস্কৃত 'দশকুমার চরিতম্' গ্রন্থেরই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় জেকব বলেছেন :

> "যতদূব জানি, সংস্কৃত গ্রন্থ দশকুমাবু চবিতম্' ইংবেজী তর্জমায় যাব নাম দাঁড়াতে পারে 'দি এডভেঞ্চাব অব টেন প্রিন্সেস, যদিও পঁচিশ বছরেরও আগে মুদ্রিত গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তবুও আজ পর্যন্ত কোন ইউবোপীয ভাষায এর অনুবাদ হয়নি।"[১৪]

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের গ্রন্থ প্রশাসনিক কর্মচারী এবং মিশনারীদের আরও বেশী করে ভারতীয় উপমহাদেশের ফোকলোরের সম্পদ আহরণে উৎসাহিত করেছিল।

স্লোইং কটন' ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৫৭ ; এবং টাইপ ৫৫০ 'দি বার্ড, দি হর্স, এ্যান্ড দি প্রিন্সেস্ ; কোয়েষ্ট ফব প্রিন্সেস্" চতুর্থ সংখ্যা পৃ. ৫৪–৫৯। দ্রষ্টব্য : Tales from Bangladesh, Collected by a Britisher (Dhaka, 1976 . 2002) Dr. Ashraf Siddiqui Ed.

১৪. হিন্দু টেল্স্,, মুখবন্ধ প ১

দক্ষিণ ভারতের আদিম উপজাতিদের সম্পর্কে গবেষণা ও অনুশীলনের অন্যতম প্রথম সাহসিক প্রয়াস হচ্ছে উইলিয়াম ই. মার্শালের গ্রন্থ 'দি টোডাজ' (লন্ডন, ১৮৭৩)। এতে দক্ষিণ ভারতের একটি বিশিষ্ট উপজাতি টোডাদের আচার-প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেকালের ভারত সম্রাটের বেঙ্গল ষ্টাফ কোরের লেঃ কর্ণেল মার্শাল এ ক্ষেত্রে বেসেল মিশনারী সোসাইটির পাদ্রী রেঃ ফ্রিডরিচ মেৎজ্-এর যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। মেৎজ্ নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলের আদিম উপজাতিদের মধ্যে বিশ বছরেরও বেশী কাল কাটিয়েছিলেন। কয়েকটি দ্রাবিড়ীয় উপভাষায় যথেষ্ট দখল তো তাঁর ছিলই, তাছাড়া তিনি কানাড়ী ও তামিল ভাষায় অসাধারণ রেসেজ্ অব সাউথ-ঈস্টার্ণ ইন্ডিয়া" (লন্ডন, ১৮৭০) গ্রন্থের লেখক লিউইন ব্রিটিশ-ভারতের পূর্বাঞ্চলের বর্তমান বাংলাদেশও এ অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত) উপজাতিব সংস্কৃতি অনুশীলন কবে তেমনি এক মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। লিউইনের প্রধান কীর্তি হচ্ছে ১৮৭৪ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত "প্রো'গ্রসিভ কলোকুইয়াল এক্সারসাইজেস ইন দি লুসাই ডায়লেকট্ অব দি দিজো অর কুকী ল্যাংগুয়েজ উইথ ভোকাবুলারীজ এ্যান্ড পপুলার টেল্স" গ্রন্থটি। দিজো উপজাতি বাংলাদেশেব চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পাহাড়ী এলাকার অধিবাসী। তাদেব মাথায় লম্বা চুল এবং চুলগুলো তারা গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায ঘাড়ের ওপর ঝুলিয়ে রাখে। লিউইন তাঁব পাঠকদেব লুসাই-কুকী গোত্রের উপজাতিদের ভাযাব সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার মানসে তাঁর গ্রন্থে এ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তিনটি পুরা কাহিনী এবং তাদের আচার, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতি উপদেশমূলক কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। কাহিনীগুলোর মূল-পাঠ ও বিশ্বস্ত অনুবাদ ছাড়াও, এদেব তথ্য সরববাহক সম্পর্কিত নানা বিবরণ এবং সাধারণের বোধগম্য করে তোলাব জন্যে উপযুক্ত টীকা-টিপ্পনীও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সমসাময়িক লোককাহিনী সংগ্রহে এ জাতীয় উপাদানের সমাবেশ একান্ত বিরল। লিউইন ইংরেজী লোককাহিনী থেকে সমপর্যায়ের উদাহরণ সহযোগে প্রথম গ্রন্থটির তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন (পৃ. ৭২) পরবর্তী সংগ্রাহক এবং গবেষকগণ তাঁদের নিজ নিজ রচনায় লিউইনের সংগৃহীত কাহিনীর উল্লেখ করেছেন।[১৫] উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে তাঁর সংগ্রহের 'স্টোরি অব ফ্রগ' কাহিনীটি পরবর্তীকালে সেক্সপীয়রকৃত 'দি লুসাই কুকি ক্ল্যানস' নামক পুস্তকেও উল্লিখিত হয়েছে।[১৬] লোককাহিনী সংগ্রাহকের দৃষ্টিকোণ থেকে সেপ্টিমাসস্মেট থরবার্ণের "বানু অর আওয়ার আফগান ফ্রন্টিয়ার" (লন্ডন, ১৮৭৬) গ্রন্থটি এ পর্যন্ত উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক জরিপ গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত মোর পঞ্চাশটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। সে তিনটি শ্রেণী হচ্ছে, যথাক্রমে হিউমার ও নীতি-উপদেশমূলক কাহিনী (পৃ. ১৭৫-১৯২), কৌতুক ও রসিকতামূলক কাহিনী (পৃ ১৯২-২১৭) এবং উপকথা (পৃ. ২১৭-২২৩)। থরবার্ণ ছিলেন বৃটিশ-ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক। তিনি যখন

১৫. বি হাটন, দি ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোযেবী, দ্বাদশ সংখ্যা, পৃ. ৭৮, ড জে জেকব্‌স সম্পাদিত 'ইণ্ডিযান ফেযাবী টেল্স' (লণ্ডন, ১৮৯১), পৃ ২৩২।

১৬ দি লুসাই কুকি ক্ল্যান্স (লণ্ডন, ১৯১২), পৃ ২৩২।

বর্তমান পাকিস্তানের বানু জিলার জরিপ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন, সে সময় তিনি ব্যাপকভাবে ফোকলোর-ক্ষেত্রেও জরিপ চালিয়েছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকেই জানা যায় যে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড উক্ত জিলার পস্তুভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা প্রথা ও লোকবিশ্বাস, প্রবচন এবং অলিখিত অথচ সযত্নে হৃদয়ের মণিকোঠায় সঞ্চয়িত রূপে লোকগীতিকা ও লোককাহিনী পূর্ণাঙ্গরূপে সংগ্রহের কাজেই পুরোপুরি প্রযুক্ত হয়েছে এবং তা থেকে যেসব চিন্তা ও মতবাদ এদের কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত করে, সে সম্পর্কে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যেতে পারে।[১৭]

যে বিপুল সংখ্যক কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তার মধ্য থেকে "যে কাহিনীগুলো দরিদ্রতম এবং অজ্ঞতম কৃষক জনসাধারণের সর্বাধিক প্রিয়, আকারে ছোট এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে সবচেয়ে মৌলিক সেই ধরনের পঞ্চাশটি কাহিনী সংক্ষিপ্তরূপে অনুবাদ করেছেন। সুতরাং এগুলোর যে-সব কাহিনী আকারে অপেক্ষাকৃত অনেক বড়, অনেক বেশী কল্পনা-প্রসারী এবং অনেক বেশী মার্জিত রুচির এবং যে-সব আখ্যায়িকা তাদের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতির জন্যেই মাধুর্য হারিয়ে ফেলে এবং আমাদের আগ্রহ জাগিয়ে রাখতে পারেনা, তাদের চেয়ে অনেক বেশী লোকপ্রিয় কাহিনী বলে আখ্যাত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।"[১৮]

সন্দেহ নেই যে, প্রকাশনার জন্যে কাহিনী নির্বাচনের কৈফিয়ৎ স্বরূপ প্রদত্ত এ ধরনের যুক্তি ভ্রমাত্মক। কাহিনী নির্বাচনের এ ভুল প্রণালী ছাড়াও, কাহিনীগুলোর উপযুক্ত তুলনামূলক আলোচনাও গ্রন্থটিতে অনুপস্থিত। যদিও গ্রন্থকার তাঁর কাহিনীকথকদের নামধাম উল্লেখ করেননি, তবে তিনি পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত গল্পবলার বিশেষ কলাকৌশলের বর্ণনা করেছেন। আজও পাঠানরা ভাল কাহিনী প্রচুরভাবে উপভোগ করে এবং "যে কাহিনীতে কৌতুকরসের প্রবাহ যত বিস্তৃত, সে কাহিনী শোনাতেই তাদের আনন্দ তত সুতীব্র"। থববার্ণ সাহেবের মতে—

> "একজন ভাল কাহিনী বলিয়েকে অবশ্যই সর্বদা একজন অভিনেতা হতে হবে ; যদি সে তা না হয়, তবে তার কাহিনী মাঠেই মারা যাবে, আবার যেহেতু সাধারণত: পাঠানদের প্রচুর অবকাশ থাকে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের সজীব কল্পনাশক্তি সক্রিয়, তাই প্রতি পাঠান পল্লীতেই দেখা যাবে, এমন দু'তিনজন সূক্ষ্মবুদ্ধির লোক আছে যারা কাহিনী বলার আর্টকে ভালভাবেই অনুশীলন করেছে। দেখা যায় প্রতি রাত্রিতেই চকে গুণমুগ্ধ অলস-শ্রোতাদের মাঝখানে বসে তারা কাহিনী বলছে আর লোকগুলো হা করে কাহিনী শুনছে, কাহিনী বর্ণেতার অভিপ্রেত অনুযায়ী হাসিতে ফেটে পড়তে অথবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে তারা যেন তৈরী হয়েই থাকে"।[১৯]

পূর্বে এ জেলার শ্রেষ্ঠ কাহিনী বলিয়েরা ছিল পেশাদার ; তাদের বলা হত ডুম্‌স (Dums)। তারা নিম্নবর্ণের লোক হোত। তারা রবাব অথবা সারিন্দা হাতে, হয় দেশের গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াত অথবা কোন সর্দারের অধীনে চাকরি নিত। একটি বিষয়ে তারা

১৭. বানু অব আওয়াব আফগান ফ্রন্টিযাব, ভূমিকা, পৃ. ৭
১৮. ঐ, পৃ ১৭৩
১৯ বানু অব আওয়াব আফগান ফ্রন্টিযাব, পৃ. ১৭১-১৭২

নিশ্চিত ছিল, যেখানেই যাক না কেন তারা সংবর্ধনা পাবেই, তাদের রাত্রির আহার জুটবেই ; আর কিছু পয়সাকড়ি অথবা ঘটিভর্তি ময়দা তারা পাবেই। যখন কোন সর্দারের অধীনে তারা কাজ নিত, তখন তারা হোত একাধারে রাজসভায় চারণ ভাঁড় এবং ঐতিহাসিক জীবন-চরিত ব্যাখ্যাকার। স্বভাবতঃই তারা গোষ্ঠীপ্রধানের পরিষদের মধ্যেও ধীরে ধীরে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতো।

পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চল পুরাকাহিনীসহ লোককাহিনীর সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, আমাদের উপমহাদেশটি সেগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। মৌখিক ঐতিহ্যে হাজার হাজার কাহিনী সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পর ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা এদেশ থেকে প্রচুর কাহিনী সংগ্রহ করেছে এবং সেগুলো গ্রন্থাকারে অথবা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছে। এই কাহিনী সংগ্রহের ও প্রকাশের কালস্তরকে আমি তিন ভাগে ভাগ করেছি। ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রথম কালস্তর, ১৮৭৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় কালস্তব এবং ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কালকে আমি তৃতীয় কালস্তর হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এই চিহ্নিতকরণের বেলায় কেবল সময়কেই আমি একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করিনি ; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাহক ও সংগ্রহ গ্রন্থের গুণগত দিকটিকেও সামনে নিয়ে এসেছি। বর্তমান নিবন্ধে কেবল প্রথম কালস্তর সম্পর্কেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। ভবিষ্যতে অপর দু'টো কালস্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

এই জাতীয় আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, লোককাহিনীর বিজ্ঞানসম্মত পঠন-পাঠনের বেলায় বেশ কিছু শর্তের ওপর গুরুত্ব দিতে হয়। সেই শর্তগুলো পূরণে যেসব গ্রন্থ অসম্পূর্ণ, লোককাহিনীর সংগ্রহগ্রন্থ হিসেবে সেগুলোর মূল্য খুব উচ্চমানের নয়। আমি ইউরোপীয় সংগ্রাহকদের সংগ্রহগ্রন্থের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, যা থেকে, আমি আশা করি, গবেষকগণ উপকৃত হতে পারবেন। প্রসঙ্গত, বলা প্রয়োজন যে, লোককাহিনীব পঠন-পাঠনে ভ্রাদিমির প্রপ যেখানে ক্রীয়াশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সি. লেভিষ্ট্রস যেখানে গুরুত্ব আরোপ করেছেন মটিফে-এর ওপর, সেখানে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক পরলোকগত প্রফেসর আর. এম. ডরসন গুরুত্ব আরোপ করেছেন নোট্স্ এ্যান্ড এ্যানোটেশ্স-এর ওপর। ডরসনের মতে লোককাহিনীর পঠন-পাঠনে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি বর্তমান আলোচনায় এই বহুমাত্রিক বিশ্লেষণধর্মী পঠন-পাঠনের ওপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি।

সবশেষে আসে হেতাল গাছের প্রসঙ্গ। পাম জাতীয় এই বৃক্ষটি সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত মাটিতে কেবল জন্মায়। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী সুন্দরবন, শ্রীলংকা, বার্মা, মালয় ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এর প্রাচুর্য রয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় ২৩৫ জাতের পাম গাছ পাওয়া যায় ; তাব অন্যতম হল phoenix বা খর্জুর প্রজাতি। ফনিক্স জাতীয় গাছ প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার আমলে ছিল, প্রাচীন আসিরিয় সভ্যতার ভগ্নাবশেষেও এর নির্দশন রয়েছে। বাইবেলেও খেজুরের উল্লেখ আছে। অনুমিত হয় যে, সেসব এলাকা থেকেই খেজুর গাছের বীজ বা চারা বণিকদের দ্বারা বা সমুদ্রের জল বাহিত হয়ে উল্লেখিত সমুদ্র উপকূলে বংশবৃদ্ধি করেছে। Phoenix জাতের প্রকারভেদ হল phoenix paludosa বা আমাদের

হেতাল গাছ। সাধারণত ৮ থেকে ২৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, কাণ্ডের মাপ হয় এক থেকে ১ দেড় ফুট ব্যাস। চৈত্র থেকে আষাঢ় মাসে এতে ফুল ও ফল হয়। পাকা ফলের রং হয় গাঢ় কাল বর্ণের—তবে খাওয়া যায় না। সাপ এই গাছকে ভয় পায় বলে জনশ্রুতি আছে। দুগ্ধবতী গাভীকে এই গাছে বেঁধে রাখলে সাপ গাভীর দুগ্ধ পান করতে আসেনা বলে সুন্দরবন এলাকার একজন চাষী আমাকে বলেছিলেন।

চাঁদ সদাগর এই হেন্তাল গাছের কাণ্ড থেকে তাঁর বিখ্যাত লাঠি বানিয়েছিলেন। হযরত মুসা তাঁর 'আষা' খেজুরের কাণ্ড থেকে বানিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে সেটা হওয়াই সম্ভব।

লোকসঙ্গীত

দীনেশচন্দ্র সেন

মুসলমান কবিদের শ্রেষ্ঠ অবদান পল্লী-গাথা

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানদের দান কখনই উপেক্ষণীয় নহে, তাহা সেই সাহিত্যের একটা সুবৃহৎ অংশ জুড়িয়া আছে, কিন্তু তথাপি যে-সকল কাব্যের উল্লেখ করিলাম, সেগুলি পড়িয়া একথা বলিতে ইচ্ছা হয় না যে, এই অবদান প্রথম শ্রেণীর। 'পদ্মাবৎ' কাব্য অশেষ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' অথবা ভারত চন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মত শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী করিতে পারে না, বড়জোর বংশীদাস, নারায়ণ দেব অথবা বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ'-এর মত একটা স্থান পাইলেও পাইতে পারে। সুতরাং এই কাব্যের প্রতিষ্ঠা গজ-দন্তে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মত নহে। 'লোর চন্দ্রানী', 'সতীময়না' কাব্যের যশঃ আমরা মুরব্বিয়ানা করিয়া প্রচার করিতে পারি—উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য, কিন্তু যদিও মাঝে মাঝে সেই সকল কাব্যের কবিত্ব হঠাৎ বিদ্যুৎস্ফূরণের মত চোখ ধাঁধিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তারপরই আঁধার ও বাস্তবতার নীরস ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক অলঙ্কার শাস্ত্রের অত্যুক্তি। এই লেখকদের কাহাকেও মহাকবি বলিয়া আমরা জয়ন্তী গাহিয়া অভ্যর্থনা করিতে পারি না,—কাব্যগুলিতে অনেক ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যের ইঙ্গিত আছে, যার জন্য কোন গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখিবার সময় তাহারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। তাহাদের স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্য অতি উচ্চ, ঘাড় বাঁকাইয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া সেই পাণ্ডিত্যের উচ্চ-শৃঙ্গ দেখিতে হয়, কিন্তু সে কৌতূহলই বা কতক্ষণ থাকে? সৈয়দ মর্তুজা বা আলোয়ালের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ লইয়া, সরলভাবে বড়াই করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। মুসলমান কবিরা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ লিখিয়াছেন, অপরূপ মনে করিয়া এই অদ্ভুতত্বের জন্য সেই সকল পদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যতটা আকৃষ্ট হইয়াছে—প্রকৃত কবিত্ব গুণে ততটা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে সত্য সত্যই কি কেহ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস কি গোবিন্দ দাসের সমকক্ষতা করিতে পারেন? তাঁহাদের কেহ রায়শেখর, বলরাম দাস, শশীশেখর ও যদুনন্দন দাসের সঙ্গেও এক পংক্তিতে স্থান পাইতে পারেন না।

আপনারা যদি আশা করিয়া থাকেন যে, আমি বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীন পুঁথিশালা ঘাঁটিয়া এইরূপ আর কয়েকটি মুসলমান কবির লেখা আপনাদের কাছে আনিব এবং তাহাই লইয়া আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ করিব, তবে সে ধারণা একান্ত ভুল।

বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে মুসলমানগণের ইহা অপেক্ষা শতগুণ বড় অবদান আছে, তাঁহারা ঐ বিরাট সাহিত্যের শুধু পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা এবং লেখক নহেন, তাঁহারা ইহার রক্ষক। এই মহাভাণ্ডারের সংবাদ আমি অতি আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি। 'পদ্মাবতী' কাব্যের কবিত্ব আছে, কিন্তু তাহার পাণ্ডিত্যই সমধিক, তাহা কাব্য হিসাবে মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' হইতে নীচে, কিন্তু পাণ্ডিত্য হিসাবে খুব বড়।

বঙ্গের একটা অতি বৃহৎ পল্লী-সাহিত্য বৌদ্ধাধিকার হইতে এই দেশের আম্রকুঞ্জ ঘেরা কুটীরে 'কোয়েল' ও 'বউ-কথা-কও' পাখীর গানের সঙ্গে উদ্ভূত হইয়াছিল ; সেই সাহিত্যের কতকটা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এত বিরাট এবং তৎসম্বন্ধে এখন পর্যন্ত বাঙ্গালীরা এতটা উদাসীন যে, করে ইহা শিক্ষিত ও ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাহা জানি না। এই বিরাট পল্লী-সাহিত্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সমধিক পরিমাণে আহৃত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক এবং বঙ্গপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক। এই পল্লী-কাব্য গুলির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এত বড় বড় কবি আছেন, যাঁহাদের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারেন, এরূপ কবি তথাকথিত ভদ্র সাহিত্যেও বিরল। এই কাব্যগুলির রচকদের অনেকেই নিরক্ষর, কিন্তু ইহাদের দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম যে, স্বীয় সমাজ ও দেশের যে চিত্র ইহারা দিয়াছেন, তাহা একেবারে নিখুঁত। যে-সময়ে ভারতচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজসভা ও দরবারের কুরুচির স্রোতে এদেশ ভাসিয়া যাইতেছিল, সে-সময়ে এই নিরক্ষর কবিরা নৈতিক-জীবনের যে সতর্কতা দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। প্রেম-প্রসঙ্গে ইহারা মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতম সন্ধান রাখেন এবং এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানসিক ভাবের বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ যে, অনেক স্থলেই তাঁহারা বৈষ্ণব কবিদের সমকক্ষ। ইহারা সকলেই খাঁটি বাঙ্গালী। মৌলবী বা পুরোহিতের খপ্পরে তাঁহারা পড়েন নাই, সংস্কৃত বা আরবী দ্বারা অভিভূত হন নাই, একেবারে পাণ্ডিত্য বর্জ্জিত, অথচ প্রকৃতির স্বীয় সন্তান, ভারতীর প্রিয় সেবক এই সকল কবি বঙ্গ সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এই বিরাট সাহিত্যের সূচনা আমি যে দিন পাইয়াছিলাম, সেদিন আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। আমি সেদিন দেশ-মাতৃকার মোহিনী মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আমাদের বাঙ্গলা ভাষাব শক্তি ও প্রসার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং হিন্দু ও মুসলমানের যে যুগলরূপ দেখিয়াছিলাম—তাহাতে চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছিল। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলিম প্রভৃতি প্রভেদাত্মক নাম সেদিন আমি ভুলিয়া গেলাম, এই দেশবাসীর এক অভিন্ন, অতিশয় প্রিয় নাম পাইলাম— তাহা বাঙ্গালী। তাহা যুগ-যুগান্তরের নাম ; সমস্ত বাহ্য-বৈষম্যের উপর সেই নাম সাম্যবাচক, সৌহার্দ্দ্য-জ্ঞাপক ও জ্ঞাতিত্বের পরিচায়ক।

দুঃখের বিষয়, কয়েকজন বিশিষ্ট নিরপেক্ষ সমালোচক ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের এই রত্নখনির জহুরী মিলিতেছে না। যে বিরাট প্রতিভাশালী পুরুষবরের বক্ষে সহানুভূতি ছিল সাগরোপম, যাঁহার চক্ষু ছিল ব্যোম-বিহারী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণ ও জ্যোতিষ্মান্, সেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আদর করিয়া ইহাদের মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং আমাদের শত-নিন্দিত ইংরেজ রাজ-পুরুষেরাই এই মুদ্রাঙ্কনের আংশিক ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

আজ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৪টি পল্লী-গীতিকা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রায় ৫০০ রয়েল সাইজের পাতায় এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এইভাবে চারিখণ্ডে মূল এবং আর চারিখণ্ডে সম্পাদক-কৃত ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। মোট রয়েল সাইজের ১৬৪৩ পৃষ্ঠা বাঙ্গলা এবং ১৯৭৮ পৃষ্ঠা ইংরেজী, একুনে ৩৬২১ পৃষ্ঠায় আট খণ্ডে পল্লী-গীতিকাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা মার্কুইস্ অব্ জেট্ল্যাণ্ড লিখিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু এই সংগ্রহে পল্লী-সাহিত্য শেষ হইয়া যায় নাই, যতটা দেখিতেছি এইগুলির শেষ ধারণা করিতে পারিতেছি না। এই সাহিত্য এত বিরাট যে, ইহাদের উদ্ধার করা কেবল

ব্যয়সাপেক্ষ নহে, বহু প্রকৃত দরদী লোকের সহায়তাসাপেক্ষ। আজ এই সম্বন্ধে যাহা লিখিব—তাহা শুধু প্রকাশিত ৫৪টি কাব্য লইয়া নহে, এই ক্ষেত্রে যে আরও বহু উপকরণ আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও এই সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে। এই বিপুল সাহিত্যের অধিকাংশই আমি পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কি কারণে এই সকল গাথা ঐ প্রদেশে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার একটু আলোচনা করিব। আমি যে-সময়ের কথা বলিব, তখনকার বাঙ্গালীরা পূর্ব্ববঙ্গের বর্তমান হিন্দু ও মুসলমানদের পূর্ব্বপুরুষ। এই সাহিত্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা এতৎসংশ্লিষ্ট ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

গুপ্ত সম্রাটেরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর জয় করিয়া মগধ সাম্রাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দেশের দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীরা পালরাজত্বে তাহাদের অধীনতার পাশ ছেদন করিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহারা নামেমাত্র পালরাজাদের বশ্যতা স্বীকার করা হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে পারিল না।

সেনদের সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরবাসীরা নানা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়—রাজবংশী কোচ, মেচ, চকমা প্রভৃতি শ্রেণীর নেতাগণ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের নানা দুর্গম স্থানে বাস স্থাপন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যর অধিবাসীরা বাঙ্গালাদেশে সাধারণতঃ কিরাত ও বাজবংশী নামে পরিচিত ছিল। তাহাবা আর্য-সমাজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। জঙ্গলবাড়ী, বোকাইনগর, গড়জরিপা, খালিয়াজুরী, মদনপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ভূ-স্বামীরা এতটা শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রবল হইয়াছিলেন যে, বল্লালসেন ও লক্ষণসেন বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। সেনদের লোলুপ-দৃষ্টি এই পাহাড়িয়া দেশটার উপর ছিল। বঙ্গদেশের উপান্ত-ভাগে উত্তর-পূর্ব্ব একটা ক্ষুদ্র দেশ তাঁহাদের সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হইয়া বিদ্রোহী থাকিবে এবং তাঁহাদের শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র-কেন্দ্রের সৃষ্টি করিবে, ইহা তাঁহারা ইচ্ছা করিতেন না। তাহা ছাড়া বল্লাল সেন যে সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করিযাছিলেন, তাহাতে দেশের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তাঁহার অনেক শত্রু হইয়াছিল। এই সকল শত্রুবা সেনদের অধিকৃত বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া গিয়া পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। ১১৩৯ খৃঃ অব্দে বল্লালের অত্যাচারে ভীত বিরোধী-দলের অন্যতম নেতা অনন্ত দত্ত পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত কাস্তল গ্রামে শ্রীকণ্ঠ নামক গুরুকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বাস স্থাপন করেন—

> "চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনি সংখ্যশাকে, বল্লাল ভীত খলু দত্তরাজঃ
> শ্রীকণ্ঠ নাম্না গুরুণা দ্বিজেন। শ্রীমানননন্তো বিজহী চ বঙ্গম্।"

বল্লালের পরে লক্ষ্মণসেন এই দেশটা জয় করিবার চেষ্টা করিয়া বারংবার পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। গ্রীষ্মকালে রাজবাহিনী কংশ, ফুলেশ্বরী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব-পাহাড়ে শিবির স্থাপন করিত। রাজবংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা প্রতি যুদ্ধেই পরাস্ত হইয়া নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া থাকিতেন, কিন্তু বর্ষাকালে প্রচণ্ড বন্যার মত পর্ব্বতের নানাদিক্ হইতে রাজসৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিত। সেই অনধিগম্য পাহাড়িয়া দেশে বর্ষাকালেও তাহারা বন্য-মার্জ্জারের মত অনায়াসে চলাফেরা করিত। কিন্তু আনুগঙ্গ প্রদেশের সমতলবাসী রাজকীয়-সৈন্যগণ খাদ্যাভাবে ও অপরিচিত দেশের দুর্গমতায় সম্পূর্ণ রূপ অসমর্থ হইয়া

একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। রাজবংশীয়দের অতর্কিত আক্রমণে তাহাদের ছাউনি ভাঙ্গিয়া যাইত এবং তাহাদের অধিকাংশেরই শত্রুর খড়গাঘাতে জীবন–লীলা অবসান হইত।। বারংবার অকৃতকার্য্য হইয়া লক্ষ্মণসেন এদেশ অধিকারের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সেনদের প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্য বহুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব–ময়মনসিংহে প্রবেশ করিতে পায় নাই। গুপ্ত যুগের হিন্দু ধর্ম্ম এবং পালরাজাদের বৌদ্ধ–প্রভাবের মিশ্রণে তাহাদের সমাজ গঠিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের কৌলিন্য সে–দেশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল না, এখনও সেখানে চক্রবর্তী–ব্রাহ্মণদের পদ প্রতিষ্ঠা বাড়ুয্যে, চাটুয্যে, মুখুয্যদের মতই সম্মানিত ; কায়স্থের মধ্যে দত্তরা—মিত্র, বসু, গুহ ও ঘোষদের ন্যায়ই সামাজিক সম্মানে প্রধান। বহুকাল পর্য্যন্ত সেখানে গৌরীদানাদি প্রথা ছিল না, কুমারীরা প্রাপ্ত–বয়স্কা হইয়া পরিণীতা হইত এবং অনেক সময় তাহারা স্বীয় বর নিজেরা মনোনীত করিত। বহুকাল পর্য্যন্ত সে–দেশে সমুদ্র–যাত্রা নিষিদ্ধ হয় নাই। তাহারা দেবতার প্রতি ভক্তিতে বিগলিত হইত না, কর্মবাদের উপরই তাহারা জোর দিত এবং দেবতার কৃপার উপর নিরুপায়ভাবে নির্ভর না করিয়া আপদে–বিপদে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইত। এই সেনাধিকার বহির্ভূত বাঙ্গালার পল্লী–সাহিত্য এবং ব্রাহ্মণ্য–শাসিত বাঙ্গলা সাহিত্য, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি সুস্পষ্টভাবে এই সকল গাথায় সূচিত হইতেছে। এই পল্লী–সাহিত্যের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, বিবাহের পূর্ব্বে কুমারীরা স্বেচ্ছায় বর মনোনয়ন করিত এবং অভিভাবকগণ প্রতিকূল হইলে উদ্দাম নদী–স্রোতের ন্যায় তাহারা গৃহের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া যাইত। বস্তুতঃ—শকুন্তলা, মালবিকাগ্নি মিত্র, কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্যের যে আদর্শ, এই পল্লী–সাহিত্যের আদর্শও তাহাই। এই সাহিত্যে দেখা যায়, বণিকেরাই সমাজে সম্মানিত ; তাহাদের পুত্রেরা রাজপুত্রদের সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু, ব্রাহ্মণের ও ঠাকুর দেবতার তাদৃশ প্রভাব এই সাহিত্যে লক্ষিত হয় না। এই পল্লী–সাহিত্যে দেখা যায়, বাঙ্গালী–প্রতিভা কত দুর্দ্দমনীয় ও উজ্জ্বল। শিক্ষা–বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ওটেন সাহেব ও আমেরিকান সমালোচক এলেন লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালী যদি এই প্রাচীন আদর্শের অনুসরণ করিয়া এই পল্লী–কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারে, তবেই বুঝিব পৃথিবীর অগ্রগামী জাতিদের সঙ্গে তাহারা তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে।"

এই পল্লী–সাহিত্যের সহিত মুসলমানদের কি সংশ্রব, এখন আমবা তাহা দেখাইব। গুপ্ত ও পাল রাজত্ব হইতে সেন–রাজাদের যুগ পর্যন্ত পূর্ব্ব ও উত্তর ময়মনসিংহ সেই প্রাচীন বৌদ্ধ–ভাব মিশ্রিত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিল। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে রাজবংশী বৈশ্যগাড়ো নামক রাজার সুসঙ্গ দুর্গাপুররাজ্য সোমেশ্বর সিংহ নামক এক পশ্চিমাগত ব্রাহ্মণ যোদ্ধা কাড়িয়া লইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই সমাজ পূর্ব্বতন আদর্শ রক্ষা করিয়াছিল। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে সেরপুর গড়জরিপার দিলীপ সামন্তকে নিহত করিয়া ফিরোজ শাহের সেনাপতি মজলিস হুমায়ুন উক্ত গড় অধিকার করেন। 'গড় জরিপা' শব্দ 'গড় দিলীপ' শব্দের অপভ্রংশ। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁ মসনদ–ই–আলি জঙ্গলবাড়ীর লক্ষ্মণ হাজরাকে জয় করিয়া তথায় সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অতর্কিত নৈশ আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া লক্ষ্মণ–হাজরা ও তাঁহার ভ্রাতা রাম–হাজরা নিদ্রা ভঙ্গের পরে গুপ্ত দ্বার দিয়া পলাইয়া অদৃশ্য হ'ন।

এই সকল দেশের লোক বাঙ্গালার অজেয় পল্লী–গীতিকা, রূপকথা ও গীতিকথা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বঙ্গের অপরাপর প্রদেশেও বৌদ্ধাধিকারে এই বিরাট সাহিত্যের প্রচলন ছিল, কিন্তু সমাজগুরুগণ জনসাধারণের স্বাধীন রুচি, ব্রাহ্মণ্য–বিরোধী প্রথা এবং কথিত ভাষা

অগ্রাহ্য করিয়া তৎস্থলে পৌরাণিক বিষয় ও সংস্কৃতাত্মক কথকতা ও কীৰ্ত্তন প্রচলন করেন। তজ্জন্য বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ-শাসিত অন্যান্য স্থানে তাহা একরূপ লোপ পাইয়াছে। যে-সকল স্থান নব-ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডির বাহিরে ছিল, সেই সেই দেশের লোকেরা এই প্রাচীন সম্পদ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের সেই যুগ-সাহিত্যের ধারা ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিয়াছে। পূৰ্ব্ব-মৈয়মনসিংহে পূর্ব্বোক্ত কারণে পল্লী-গীতিকা বেশী পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু বহু পূর্ব্বেই সেই দেশ হইতে এই পল্লী-সাহিত্যের ধারা একেবারে বিলুপ্ত হইত, যদি না মুসলমানগণ ইহাকে রক্ষা করিত। এক শতাব্দী পূৰ্ব্ব হইতে নব-ব্রাহ্মণ্য ধীরে ধীরে ভৈরব নদ পার হইয়া কংশ, ধনু ও ফুলেশ্বরীর তীরদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া যে সাহিত্যের রসাস্বাদ করিয়াছে, তাহা তাহাদের মনঃপুত হয় নাই। এই গাথা-সংগ্রাহকগণ আমাকে জানাইয়াছেন—"এই সকল গীতিকথা ও পালা-গান উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা অনুমোদন করেন না ; তাঁহারা তাঁহাদের বাড়ীতে এ সকল গান গাহিতে দেন না। ইহাতে প্রাপ্ত-বয়স্কা কুমারীগণের স্বেচ্ছাবর গ্রহণের কথা আছে, ব্রাহ্মণ ও ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তির কথা নাই, ইহাতে ইতর-জাতির নায়কদের প্রসঙ্গ আছে এবং জাতি-নির্বিশেষে নির্বিচার বিবাহ-প্রথার কথা আছে।"

একজন বিশিষ্ট সংগ্রাহক আমাকে জানাইয়াছেন,—"শ্রেষ্ঠ পল্লীগাথাগুলি উদ্ধার করা এখনও কত বড় শক্ত কাজ, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহ বুঝিতে পারিবে না। এই সকল গান লিখিত হইত না, গায়কদের মুখে মুখে প্রচারিত হইত। যে পর্য্যন্ত ইহাদের প্রচলন বেশী ছিল, সে পর্য্যন্ত অনেক গায়েনেরই তাহা কণ্ঠস্থ থাকিত। কিন্তু প্রচলনের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়েনদের স্মৃতি মলিন হইয়া গিয়াছে। একটি পালাগান বা পল্লীগীতিকা সংগ্রহ কবিতে হইলে দূর-দূরান্তরবাসী বহু গায়েনের শরণাপন্ন হইতে হয়। কাহারও নিকট একাংশ এবং অপরদের কাছে ভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করিয়া অবশিষ্ট অংশগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। কিছুদিন পরে আর তাহাও সম্ভবপর হইবে না।"

অধিকাংশ স্থানে হিন্দু-মুসলমান নিরক্ষর কৃষকেরাই এই সকল কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার রস-বোদ্ধা ও শ্রোতা। কিন্তু হিন্দুদের যে ব্রাহ্মণ্য-অনুশাসন তাহা মুসলমানদের নাই, সুতরাং বংশ-পরম্পরা তাহারা যে উৎসবের পরম প্রসাদ বিলাইয়া আসিয়াছে, সে-রসের অমৃত-আস্বাদ ভুলিবার নহে, তাহা তাহারা ছাড়ে নাই। শুনিয়াছি, শরিয়ৎবাদী মৌলবীরা সঙ্গীতের প্রতি কতকটা বিদ্বিষ্ট। তাহাতে মনের দৃঢ়তা কমে এবং হৃদয়ের বল ক্ষীণ করে—এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ এই গীতিকাগুলির উপর নিষেধ-বিধি জারি করিতেছেন। আনন্দই জনসাধারণের শক্তির উৎস, আনন্দই তাহাদের সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমজনিত অবসাদ ও ক্লান্তির মহৌষধ ! স্বাভাবিকভাবে বন্য-বীথির নীচে বসিয়া কৃষক নীলাকাশে যখন কোকিলের কুহুধ্বনি শুনিতে থাকে, তখন হৃদয় ছাপিয়া আনন্দোচ্ছ্বাস বহিতে থাকে। তাহারা পাণ্ডিত্যের আস্বাদ পায় নাই। কেতাবী এলেম তাহাদের নাই। তাহারা যে আনন্দ নিজেদের গৃহে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে, হয়ত বা তাড়ির দোকানে ঢুকিবে।

হিন্দুগৃহ হইতে তাড়িত হইয়াও এই পল্লী-সাহিত্য, এতকাল প্রধানতঃ মুসলমানেরা জীয়াইয়া রাখিয়াছেন ; আজ সেই পল্লী-কাহিনী সুরধুনী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। এই পল্লী-সাহিত্যের বিস্তারিত সংবাদ দিতে হইলে আমাকে ওয়েবষ্টারের অভিধানের মত সুবৃহৎ বহুখণ্ড পুস্তক লিখিতে হয়। এই সাহিত্যের নানাদিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের অতীব উপভোগ্য। শুধু তাহাই নহে, এই নিরক্ষর চাষাদের সাহিত্য এত বড় যে, তাহার চূড়া বড় বড় শিক্ষিত কবিদের মাথা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। আমি লিখিয়াছি, পশ্চিম-বঙ্গের লোকদের মধ্যে অনেকেই এই সাহিত্যের গুণে ও অপরাজেয় কাব্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য, কেহ কেহ বা পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি বিরূপতার দরুণ এই সাহিত্যকে তাদৃশ আদর করেন নাই। বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গীতি-সাহিত্যের ভাষা তাঁহাদের নিকট কতকটা দুর্ব্বোধ ও শ্রুতিকঠোর। তজ্জন্য তাঁহারা সকলে ইহার রসাস্বাদের অধিকারী হইতে পারেন নাই। কিন্তু সাহেবেরা এই গাথাগুলির ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়াছেন ; তাঁহারা এই সাহিত্যের যতটা পক্ষপাতী হইয়াছেন তাহা আমাদের অতীব গৌরবের বিষয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুসলমানদের সমধিক যত্নেই এই সাহিত্য রক্ষিত হইয়াছে। কবিগণের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক আছেন, কিন্তু গায়েন অধিকাংশই মুসলমান। কতকগুলি গীতিকার প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বোঝা যাইবে—

(১) **"মাঞ্জুর মা"** নামক উৎকৃষ্ট কাব্যখানি মুসলমানদের রচিত ; ইহা নগেন্দ্রনাথ দে এক মুসলমান গায়েনের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। (২) **"কাফন চোরা"** পালাটিও একটি অতীব কৌতূহলপ্রদ, ঐতিহাসিক রহস্যপূর্ণ, কাব্য-শ্রীমণ্ডিত গীতিকা ; ইহার রচক মুসলমান। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এই গানটি চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত হাইদগা নিবাসী সেকেন্দর গায়েন, বোয়ালখালী থানার ধেলেরা নিবাসী আলিয়র রহমান এবং কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত চরচক্তাই গ্রাম নিবাসী ওজু পাগলা এই তিনজন মুসলমান গায়েনের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। পল্লী-গীতিকার কৌস্তভ স্বরূপ (৩) **"মহুয়া"** পালাটি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে নেত্রকোণার অন্তর্গত মস্কগ্রাম নিবাসী ৮০ বৎসর বয়স্ক সেখ আসক আলি ও মন্দিকোণার নিকটবর্ত্তী ঘোরালি গ্রামবাসী নসু সেখের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (৪) **"চাঁদ বিনোদের পালা"** বা **"মলুয়া গীতিকা"** চন্দ্রকুমার অপরাপর কয়েকজন গায়কের মধ্যে ময়মনসিংহের বাজিতপুর-নিবাসী কাঁছ সেখ এবং মঙ্গল-সিদ্ধি গ্রামবাসী নিদান ফকিরের নিকট আংশিকভাবে পাইয়াছিলেন। (৫) **"দেওয়ান মদিনা"** গীতিকা জালাল গায়েনের আবৃত্তি হইতে প্রাপ্ত। (৬) **"ভারাইয়া রাজার কাহিনী"** চন্দ্রকুমার দে মূলতঃ দুইজন গায়েনের নিকট হইতে সংগ্রহ কবিয়াছিলেন—ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুক্তাগাছাবাসী নাজির ফকির এবং সেই গ্রামবাসী আর একটি ফকির,—চন্দ্রকুমার তাহার নাম লেখেন নাই। (৭) **"বীর নারায়ণ"**-এর পালাটি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দে মুক্তাগাছাবাসী সেখ পানাউল্লার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (৮) **"মহীপালের গান"**-এর একটি ক্ষুদ্র অংশ মৌলবী মনসুরউদ্দিনের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। (৯) শুজা বাদশাহের পত্নী পরীবানু

সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পালাটির নাম "**পরীবানুর হাঁহলা**", ইহা আশুতোষ চৌধুরী কর্তৃক চট্টগ্রামের ডবলমুরিং-এর অন্তর্গত আনারাবাদ নিবাসী খলিলুর রহমান ও উজানটেয়াবাসী মনসুর আলির নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। (১০) "**সোনাবিবির পালা**"টি প্রধানত শ্রীহট্টের কাটিয়ালী গ্রামবাসী রহমান সেখের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। (১১) "**মহিষাল বন্ধু**" নামক কবিত্বপূর্ণ গীতিকাটি চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক প্রধানত ভাওয়াল পরগণার উজি গ্রামবাসী মাঝিয়া সেখ এবং কাটঘরা গ্রামেব গাছুনি সেখের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। (১২) মুসলমান কবি জামায়েৎউল্লা প্রণীত অত্যুৎকৃষ্ট "**মাণিকতারা**" বা "**ডাকাতের পালা**"টি স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্তী কাহার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে তিনি আমাকে জানাইবার অবসর পান নাই। এই সংবাদটি না জানাতে বঙ্গ-সাহিত্যের একটি গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। এই কবিত্বের খনি গ্রাম্য প্রাচীন সমাজের নিখুঁত চিত্রপট, যুবকেব উদ্যম ও দুষ্কর অভিযানের জীবন্ত ছবি এবং মহীয়সী পল্লী-বালিকার বীরত্ব ও স্বামী-প্রেম-ব্যঞ্জক অত্যদ্ভূত পালাটির এক তৃতীয়াংশ মাত্র বিহারী চক্রবর্তী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বাকিটা সংগৃহীত হইতে পারে নাই। আমি বহু চেষ্টা করিয়া এই পালাটির ক্ষুদ্র আর একটু অংশ আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা এখনও ছাপা হয় নাই। (১৩) '**নিজাম ডাকাতের পালা**'টি আশুতোষ চৌধুরী চট্টগ্রামের বোয়ালখালির অন্তর্গত অল্লাগ্রাম নিবাসী সেখ সদর আলি এবং মতিয়র রহমান নামক এক বাজিকরের নিকট পাইয়াছিলেন। (১৪) "**ঈশার্খা দেওয়ানের পালা**" ও (১৫) "**দেওয়ান ফিরোজখাঁর পালা**" চন্দ্রকুমার দে বাজিতপুর নিবাসী সহর আলি গায়েন, চন্দ্রতলার সদীব গায়েন হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (১৬) "**সুরত জামাল ও আধুয়া সুন্দরী**" পালাটির লেখক অন্ধকবি ফৈজু; এই পালাটিও চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করিয়াছেন। (১৭) "**দেওয়ান ভাবনা**" চন্দ্রকুমার দে কেন্দুয়ার নিকটবর্তী মাঝিদের মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করেন। (১৮) "**নছর মালুম**" পালাটি আশুবাবু চট্টগ্রামের কাঁঠালভাঙ্গা পল্লীব নূর হোসেন গায়েন, মহিষমারা গ্রামের গুরু মিঞা ও কর্ণফুলীর মোহনার নিকটবর্তী কোন পল্লীবাসী রহমান সাম্পেনের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। (১৯) "**নূরন্নেহা কবরের কথা**"—চট্টগ্রামের পেসকারের হাট পল্লীর হয়বৎ আলি, কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত চরবকতাইবাসী হাকিম খাঁ ও বোয়ালিয়ার অন্তর্গত পূবদিয়া গ্রামবাসী গুণা মিঞার নিকট হইতে আশুবাবু এই পালাটি সংগ্রহ করেন। (২০) "**মুকুটরায়**"—এই কাব্যের লেখক মুসলমান, বিষয় হিন্দুসংক্রান্ত, কিন্তু ইহাতে ইসলামের জয় ঘোষিত হইয়াছে।

এই 'মুকুটরায়'-এর গীতিকায়—সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত দেশে তরুণ মুকুটরায়, শকুন্তলা বা মিরেণ্ডার সংস্কারবর্জ্জিতা এক বনের কন্যা দেখিলেন। প্রথম দর্শনেই কন্যা যুবরাজের রূপে মুগ্ধ হইল। কবি বলিতেছেন—

> "কাঁদিযা কাটিয়া কন্যা ফেলায় ধনুক-ছিলা।
> কেমন পীরিতির জ্বালা বুঝিল বনেলা॥"

যে কখনও তাহার পর্ণ-কুটীরের বাহিরে পা দেয় নাই, যে কোন প্রেম-কাহিনী শুনে নাই, সে হঠাৎ রাজকুমারকে দেখিবামাত্র পাগল হইল কেমন করিয়া? কবি কৃষক, কিন্তু তাঁহার

মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের চেষ্টা দার্শনিকের মত। পালাটি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই। ইহাতে ইস্‌লামের প্রতি অনুরাগে কবি ভরপুর।

(২১) "**রতন ঠাকুর**"—এই পালাটি চন্দ্রকুমার বাবু ময়মনসিংহের কাঠঘর নিবাসী গাছিম সেখের নিকট পাইয়াছিলেন। (২২) "**হাতি খেদার গান**"—মুসলমান কবি-রচিত, চন্দ্রকুমার দে-সংগৃহীত। (২৩) "**আয়না বিবি**"—মুসলমান কবি-বিরচিত, চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন।

ইহা ছাড়া আরও অনেক কাব্য আমরা আরও বহু মুসলমানের নিকট হইতে পাইয়াছি। হিন্দুদের নিকট হইতেও কতকটা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণই মূলত ইহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই এই সাহিত্যের চৌদ্দ আনি রক্ষক। অনেক গাথার নকল আমার কাছে আছে। তৎসম্বন্ধে কোনই আলোচনা হয় নাই, প্রকাশিত হওয়া ত দূরের কথা। তদ্ব্যতীত পল্লীর বাগানে যেরূপ যুঁই, কুন্দ, রজনীগন্ধা ও অপরাজিতার অন্ত নাই, পল্লীর বকুল, শিউলী, ও অতসীর দান যেরূপ অজস্র, তেমনই শত শত গীতিকা, পালাগান—ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নব-ব্রাহ্মণ্য যে সকল স্থানে সেন-রাজত্বে প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেইখানেই ইহাদের প্রাচুর্য্য, যেহেতু এই সকল পল্লী-গীতিকা সেই সকল স্থানে বহুদিন রাজত্ব করিয়াছে। এই প্রকারের গান ছাড়া রূপকথাও এই সকল পল্লী অঞ্চলে সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহার কিয়দংশ লালবিহারী দে, কতক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং কিছু আমি সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু এই রূপকথা সাহিত্য এত বিরাট যে ইহার সামান্য অংশই এ পর্যন্ত সংগৃহীত বা প্রকাশিত হইয়াছে।

রূপকথার অধিকাংশই গদ্যে, মাঝে মাঝে কয়েক পংক্তি কবিতা আছে : গল্প বলিবার সময় আলাপিনীরা তাহা গান করিত। এই রূপকথা-সমুদ্রের কয়েকটি লহরী নানা পথে য়ুরোপ প্রভৃতি সুদূর পশ্চিম ও কাম্বোডিয়া, শ্যাম, যাভা, এমন কি বালী দ্বীপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

আমাদের স্থান অল্প, সুতরাং ফকির ও বাউলদের সমৃদ্ধ গীতি-সাহিত্য, জারি ও মুর্শিদাগান প্রভৃতি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিতে পারিব না। ইহা ছাড়া, মুসলমানী মুদ্রাযন্ত্র হইতে কেচ্ছা-নামধেয় অসংখ্য দেশীয় গল্প দিনের পর দিন প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল কেচ্ছার বিষয়-বস্তু অনেক স্থানেই মুসলমানী এবং ইহাদের ভাষাও ন্যূনাধিক পরিমাণে ফারসী ও উর্দ্দু শব্দবহুল ; তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে বিদেশীয় শব্দ এত অধিক যে, বাঙ্গালী হিন্দুদের তো কথাই নাই, এদেশের মুসলমানগণেরও অনেকের নিকট সেগুলি দুর্ব্বোধ।

যে অপ্রকাশিত গীতি-কবিতা ও রূপকথার বিরাট ভাণ্ডার সম্বন্ধে আমি এতক্ষণ ধরিয়া লিখিলাম, তাহাদের ভাষা প্রাদেশিক বাঙ্গলা, তাহা পূর্ববঙ্গের খাঁটিভাষা,—তাহা হিন্দু ও মুসলমান যাঁহারাই রচনা কবিয়াছেন, তাহাতে বাড়াবাড়ি মাত্র নাই ; উহা পল্লীবাসীদের সহজ সুন্দর মনোভাব জ্ঞাপক সরলভাষা যে ভাষায় পল্লীবাসীরা কথা কহিয়া থাকে, ইহা সেই ভাষা। নিরক্ষর ও একান্তরূপে পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত জনসাধারণ তাহা কোনরূপ কাব্যালঙ্কার দিয়া সাজাইবার চেষ্টা করে নাই, তাহারা এলেমদার নহে, ফারসী বা সংস্কৃতের অলঙ্কারশাস্ত্র তাহাদের জানা নাই। তাহারা আকাশে পাখীদের সুমিষ্ট গান শুনিয়াছে, তাহারা নীল-কৃষ্ণনীরা

সরসীর বক্ষে পদ্ম ও কুমুদ ফুটিতে দেখিয়াছে, আম্রকুঞ্জ-পরিশীলন চঞ্চল বায়ু তাহাদিগকে সুরভি দান করিয়া শরীর জুড়াইয়া দিয়াছে,—এই দৃশ্যপটের পরিবেষ্টনীর মধ্যে আশে-পাশের মানুষগুলি তাহারা যেমন দেখিয়াছে, তেমনই আঁকিয়াছে। তাহার হৃদয়কুঞ্জ চির কুসুম-গন্ধী, সেই সরল পবিত্র উৎস হইতে তাহারা যে প্রেমের প্রেরণা পাইয়াছে, তাহাদের সাহিত্য সেই প্রেরণায় ভরপুর। তাহাদের আঁকা রূপসীরা কলসী-কাঁখে জল আনিতে যায়, কিন্তু নিতম্বের গুরুত্ব দেখিয়া মেদিনী মাটি হইয়া যায় না, তাহাদের নাভি-কূপে কামদেব পলাইবার পথে শম্ভু সদৃশ উন্নত স্তনদ্বয় প্রেমদেবতার কুন্তল-স্বরূপ লোমাবলী ধরিয়া টানাটানি করে না, তাহাদের গতি গজরাজের গতির ন্যায় নহে এবং তাহাদের কাদম্বিনী নিন্দিত কুন্তলের লহর ভুজঙ্গিনীসম বেণী রচনা করে না। তাহাদের শ্রুতি গৃধ্রের কর্ণের ন্যায় নহে এবং নাসা খগরাজের দর্প ভগ্ন করে না,—তাহাদের ভ্রূর ভঙ্গিমা কামানের ন্যায় বা কন্দর্পের ফুলশরের সম নহে এবং তাহাদের পদের মঞ্জীরধ্বনি শিখিবার জন্য গুঞ্জনশীল ভ্রমর পদে পদে ঘুরিয়া বেড়ায় না,—এক কথায়, পণ্ডিত কবিরা অলঙ্কার-শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে সুদীর্ঘরূপ বর্ণনা দ্বারা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত ও অর্থশূন্য গুরুশব্দ ও উপমা দ্বারা বিড়ম্বিত করিয়াছেন, এই সকল পল্লী-সাহিত্যে একেবারেই তদ্রূপ চেষ্টা বর্জ্জিত। সরল, অনাড়ম্বর, স্বভাব-শিশুর ন্যায় পল্লী-কবিরা এই পরকিয়া-ভাণ্ডার পাইবে কোথায়? তাহারা এবং যে-সকল গায়েন এই সকল পালাগান গায়, তাহারা পল্লীর আনন্দে মশ্‌গুল; তাহাদের শ্রোতারা হাসি-কান্নার রোলে পল্লীর আসরকে জমাইয়া তোলে। কিন্তু তাহারা জানে, তাহারা নিরক্ষর, যতই আনন্দ তাহারা এই সকল কাব্যে পা'ক না কেন তাহারা জানে, সেই আনন্দ তাহাদের নিজস্ব, শিক্ষিত-সমাজ সেই সকল গানের আদর করিবেন, এরূপ দুরাশা তাহারা কখনই রাখে না। মৌলবী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দূর দূর করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন, তাঁহারা যেখানে সভা করিয়া ফারসী বয়াৎ ও সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সদর্পে ঘাড় নাড়িতে থাকেন, সে-পথে হাঁটিবার স্পর্দ্ধা তাহারা রাখে না,—তাহারা জানে না, অনুভূতির গাঢ়তাই প্রকৃত কাব্যের জন্মস্থান, তাহারা জানে না যে, অলঙ্কার-শাস্ত্রের কৃত্রিম চক্ষু যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রাকৃতিক সুষমার সেরূপ পরিচয় পান না; নগ্ন, নির্ম্মল চক্ষে যাহারা প্রকৃতি দেখিয়া তাহা উপভোগ করিতে জানে, তাহারা স্বভাব সৌন্দর্যকে সেরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তাহারা জানে, তাহারা উচ্চ সমাজের অপাংক্তেয়; তাহাদের কাব্য ও গীতি তাহাদের লাঙ্গলের মতই জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য অথচ তাহা সেই লাঙ্গলের মতই ভদ্র সমাজে ত্যাজ্য। এই জন্য যখন চন্দ্রকুমার দে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সোনালি-বাঁধাই, নানা চিত্র-শোভিত, সুদৃশ্য কাগজে ছাপা একখানি বই লইয়া গায়েনদের কাছে গেলেন এবং পড়িয়া বুঝাইলেন—এই মনোহর, সমৃদ্ধ আবরণের মধ্যে তাহাদের দেওয়া গান স্থান পাইয়াছে, তখন তাহারা বিস্ময়ে বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিল। তাহাদের অক্ষর-পরিচয় নাই, সুতরাং বইখানি পড়িতে পারিল না, কিন্তু সারমেয় যেরূপ প্রবাসাগত গৃহস্বামীকে দেখিয়া তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না, মনের আনন্দ-জ্ঞাপনের ভাষা নাই, এজন্য লেজ নাড়িয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া, বারংবার তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অসহ্য হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে—ইহারাও সেইরূপ কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের আতিশয্যে পুস্তকখানি কখনও মাথায় রাখিয়া, কখনও তাহার উপর হাত বুলাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া গেল। তাহারা জানে না যে, তাহারা অতি সংক্ষেপে নর-জীবনের কতকগুলি সার কথা বলিয়াছে, যাহা দার্শনিকগণ বুঝাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম-

হইয়া যান ; তাহারা কবিত্বের এমন মর্ম্মস্পর্শী রূপ দেখাইয়াছে, যাহা পাণ্ডিত্যের ধার না ধারিলেও জগৎকে মুগ্ধ করিবার শক্তি রাখে।

আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ইহাদের ভাষা প্রাদেশিক হইলেও তাহা খাঁটি বাঙ্গলা। মুসলমানগণ এই সকল পালাগানের অনেকগুলি রচনা করিয়াছেন এবং এখন তাঁহারাই ইহাদের প্রধান গায়েন ও শ্রোতা বলিয়া এই সকল গীতিকার ভাষা মুসলমানী বাঙ্গলা নহে, অর্থাৎ মৌলবীরা বহু উর্দ্দু ও আরবীশব্দ-কণ্টকিত যে অস্বাভাবিক বাঙ্গলা অনুমোদন ও প্রবর্তন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহা সে বাঙ্গলা নহে। ইহাতে উর্দ্দু ও ফারসী শব্দ আছে, কিন্তু স্বাভাবিক ক্রমে সেই সকল ভাষার যে শব্দগুলি আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই ইহারা ব্যবহার করিয়াছে। বর্তমানকালে গোড়া হিন্দুরা দিবারাত্র যে-সকল উর্দ্দু কি ফারসী শব্দ জিহ্বাগ্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন, লেখনী-মুখে তাহা বদলাইয়া তৎস্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন, এইরূপে--'হজম' স্থলে 'পরিপাক' বা 'জীর্ণ', 'খাজনা' স্থলে 'রাজস্ব', 'ইজ্জৎ' স্থলে 'সম্মান', 'কবর' স্থলে 'সমাধি' 'কবুল' স্থলে 'স্বীকার', 'আমদানি' স্থলে 'আনযন' বা 'সংগ্রহ করিয়া আনা', 'খেসারৎ' স্থলে 'ক্ষতি পূরণ', 'জমিন' স্থলে 'ভূমি', 'খান্‌দান' স্থলে 'পদ-প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি কথার প্রয়োগ করেন। একটু কাগজ লইয়া টুকিয়া দেখিবেন, বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ বিদেশী শব্দ কত প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের ভাষার জাতি যায় নাই। পরের জিনিষ আত্মসাৎ করিবার শক্তি সতেজ জীবনের লক্ষণ। শব্দগুলি বাদ-সাদ দিয়া ভাষা শুদ্ধ করিয়া ইহাকে তুলসীতলা করিয়া রাখিলে হিন্দু-মুসলমানের উভয়ের মাতৃভাষাকে আমরা খণ্ডিত ও দুর্বল করিয়া ফেলিব। মানুষ পরদেশী ভাষা হইতে শব্দ চয়ন করে কখন? যখন স্বীয় ভাষার কথাগুলি অপেক্ষা বিদেশী ভাষার শব্দ বেশী জোরের ও ভাব-প্রকাশের বেশী উপযোগী হয় ; জনসাধারণ যখন দেখে তাহাদের ভাষায় সেইরূপ বলীয়ান্ ও ভাবজ্ঞাপক-শব্দের অভাব, তখন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ নির্বাচনী-শক্তি ও অশিক্ষিত পটুত্ব গুণে সেই সকল শব্দের আমদানী করিয়া নিজের ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। এখানে পণ্ডিতের কাঁচি চালাইবার অবকাশ নাই। এই সকল শব্দ ভাষার পুষ্টি-সহায়ক, ইহাদিগকে বাদ দিয়া গণ্ডীটা সঙ্কীর্ণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

পূর্ববঙ্গ-গীতিকার ভাষা রাঢ়-দেশীয় লোকের কানে একটু বাধিবে, তাঁহারা ইহার রসাস্বাদ ততটা করিতে পারিবেন না, যতটা আমরা পারিব। ইহা প্রাদেশিকতার জন্য। কিন্তু ইহাতে যে স্বল্প সংখ্যক বিদেশী শব্দ আছে, তাহা স্বাভাবিক ক্রমে আমাদের ভাষার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য এই গীতিকাগুলি কখনই পরিহার্য বা বিরক্তিকর হয নাই।

পল্লী-গীতিকা সংগ্রহার্থ যখন আমাকে ডিরেক্‌টার ওটেন সাহেব চারটি লোক দিতে চাহিয়াছিলেন, প্রত্যেকের বেতন ৭০ টাকা, তখন তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ৭০্ টাকা বেতনে ভাল গ্র্যাজুয়েট পাওয়া কঠিন হইবে না। আমি তদুত্তরে বলিয়াছিলাম যে—"আমি গ্র্যাজুয়েট চাই না, যাহারা চাষার কুটিরে পা দিতে সহজে স্বীকৃত হইবে না এবং তাহাদের কথিত গানগুলি শুদ্ধ না করিয়া লিখিতে পারিবে না, নিম্নশ্রেণীর কাছে আসিলে যাহাদের গা ঘিন্‌ঘিন্ করিবে, এমন লোক আমি চাহিনা ; যাহারা দরদ দিয়া তাহাদের আনন্দে যোগ দিতে পারিবে এবং তাহাদের কথিত গানের একটি মাত্র বর্ণ না বদ্‌লাইয়া ঠিক তাহারা যেভাবে বলিবে, সেইভাবে টুকিয়া লইতে পারিবে, সেইরূপ লোক আমি চাই ; গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে

এরূপ লোক সহজে মিলিবে না।" এইভাবে আমি সেই সম্মানিত শ্রেণীর লোকদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃত দরদী লোক কয়েকটি নিযুক্ত করিয়াছিলাম। আমি বহু বৎসরের চেষ্টায় যে কয়েকটি লোককে এ কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলাম, এখন তাহারা কাণ্ডারীবিহীন মাঝির ন্যায় সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে, এই সকল গুণী এখন কোনখানেই আশ্রয় পাইতেছে না।

এইভাবে পল্লী-সাহিত্যের বিরাটত্ব সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বেই লিখিয়াছি। কত শত বাউল ও ফকির যে এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। বাউল গান, মুরশিদা গান, জারি গান, পল্লী-গাথা পল্লীর ভক্ত ও প্রেমিকদের মুখ হইতে শিউলি-ফুলের ন্যায় অজস্র ফুটিতেছে ও ঝরিয়া পড়িতেছে। এই অবজ্ঞাত সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা উপেক্ষিত। আমরা জনকতক শিক্ষাভিমানী লোক ইংরেজীর শিক্ষানবিশী করিয়া গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে যে একটি অর্দ্ধ-পক্ব সাহিত্যের সৃষ্টি পূর্বক তাহারই স্পর্দ্ধায় গগন-মেদিনী কাঁপাইতেছি, তাহাতেই বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগ ও মধ্যযুগ পরিকল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি, অথচ এই সাহিত্যকে কেহ কেহ ফিরিঙ্গিয়ানা-দুষ্ট বিকৃত সাহিত্য মনে করিয়াছেন। সেই সকল উগ্র সমালোচকের কথায় সায় না দিয়াও একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, এই অভিযোগ একবারে অমূলক নহে ; কোন কোন সম্প্রদায় বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যকে আবার অতিরিক্ত মাত্রায় হিন্দু-ভাবাপন্ন বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে জেহায় ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু বর্তমানের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সাহিত্যের কল-কোলাহল হইতে দূরে আসুন—আমরা আমাদের ভাষার বিরাট রূপের সান্নিধ্যে যাইয়া দেখি—সেখানে বিশাল পল্লী-সাহিত্য-সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে—তাহা কি ভাবে, কি সংখ্যায়, কি কবিত্ব মর্যাদায়, অতি বিপুলকায়, ইহার সমস্তই বাঙ্গালী জাতির অবদান—এই রত্ন-বোঝাই জাহাজ আমরা অবহেলার অতল গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া কয়েকখানি রঙ্গীন নতুন তৈরি জেলে-ডিঙ্গী লইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছি।

মুসলমানেরা যে-সকল পুঁথি ছাপাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ও করুণ-রস আছে, আমাদের বাঙ্গলা রামায়ণ ও মহাভারত অনেকস্থলে মূল সংস্কৃতের গণ্ডী ছাপাইয়া গিয়া দেশী-উপাদানে কাব্য কথা সাজাইয়াছে—তাহাতে তাহাদের শ্রী কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। বহু মুসলমান কবি সেইরূপ হাসেন-হুসেনের কথা, সখিনার প্রেম, কারাবালার যুদ্ধ-ক্ষেত্রের কথা বিদেশের মাল-মসলা হইতে সংগ্রহ করিয়াও তাহা বাঙ্গালার নিজস্ব উপাদান দিয়া গড়িয়াছেন। যেখানে করুণ-রসের কথা সেখানে পরদেশী মূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের কবিত্বের অনুভূতি ও ভাষা।

আমরা এখানে সংক্ষেপে এই পল্লী-সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করিব এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব যে, এই বিরাট সাহিত্যে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের দান কম নহে—বরং বেশী এবং ইহাও বুঝাইব যে, এই সাহিত্য প্রধানত মুসলমানেরাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও গুণগরিষ্ঠ-শাখা বাদ দিয়া এই সাহিত্যকে দাঁড় করাইবার চেষ্টায় আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, তাহা আমার নিকট কবন্ধের মত মনে হয়।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, গোঁড়া সামাজিকগণের নিকট তাড়া খাইয়া পল্লীর হিন্দু-গায়েন-সম্প্রদায় তাহাদের মূল-কর্মক্ষেত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, উহা এখন পর্য্যন্ত মুসলমানেরাই দখল করিয়া আছে। হিন্দুরা ছাড়িয়া দিলেও পৌরাণিক ধর্ম-আদর্শের সম্পূর্ণ বাহিরে মুসলমানের

কুটীরে জননীরা এই সকল রূপকথা ছাড়েন নাই। সুতরাং সমধিক পরিমাণে আমরা তাঁহাদের নিকটই উপরোক্ত এই প্রাচীন সম্পদের সন্ধান পাইতেছি। এই বৃহৎ কথা-সাহিত্যে এখন খুঁজিবার বহু বিষয় আছে। নব-ব্রাহ্মণ্য-শাসিত রাঢ় দেশ অপেক্ষা বৌদ্ধাদর্শে গড়া পূর্ব ও উত্তর বঙ্গেই এই সকল রূপকথার সন্ধান বেশী মিলিবে। সুতরাং আপনাদিগকে আমি এই বিষয়টি অবহিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছি। এখনও মুসলমানের জননীরা স্বীয় শিশুর মুখে স্তন্য দেওয়ার সময় স্বীয় দেশের সেই সকল প্রাচীন রূপকথা বলিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করেন, মাতৃস্তন্যের ন্যায়ই তাহারা মাতৃভাষার ক্ষেত্রে পরম হিতকর খাদ্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই রূপকথা ও পল্লী-গীতিকা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু ইহারা গুণ-গরিষ্ঠ হইল কি প্রকারে? তাহা যদি না হইবে, তবে অসংখ্য কচুবনের মত, বিশাল বাঁশ-ঝাড়ের মত, বঙ্গমাতার পল্লীর প্রান্তরময় শ্যামল দুর্বা-ঘাসের মত—যদি ইহারা অন্তঃসার শূন্য হয় তবে এত সিংহনাদ করিয়া সুবৃহৎ ভস্ম-স্তূপ আবিষ্কার করিয়া কি লাভ? সুতরাং আমাদের গুণের বিচার করিতে হইবে। আমি নিজ অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করি যে, ঢাকার মসলিনের মতই এই পল্লী-সাহিত্য গুণগরিষ্ঠ এবং ইহাদের মধ্যে মুসলমান কবিদের যে অবদান তাহারও কবিত্ব-সম্পদের তুলনা নাই। তাহার বৈশিষ্ট্য ও গুণপনা অনেকস্থলে হিন্দু-কবিদের দানের মহিমা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এখানে মুসলমান দীন বেশে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষুদ্র কোণে জায়গা পাইলেই কৃতার্থ হইবেন না, এখানে তাঁহারা সিংহ-বিক্রমে সিংহাসন দখল করিয়া লইয়াছেন। যদি এই সাহিত্য কচুরী-পানার ন্যায় শুধু বাহুল্যের প্রভাবে নিজকে বড় বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিত, তবে ইহার মূল-উচ্ছেদ করিতে পরামর্শ দিতাম, কিন্তু এই দামী-সাহিত্যের আমি একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। আর বেশী বাগাড়ম্বর না করিয়া এই সাহিত্যে শুধু মুসলমানগণের অজস্র দানের মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিব। আমি রাষ্ট্রনীতির খাতিরে মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে ভিড়াইবার জন্য ফন্দী আটিতেছি না। আমি দুই সম্প্রদায়কে এক করিয়া রাজনৈতিক-মিলনের উদ্দেশ্যবাদী নহি, আমি বুঝিয়াছি—যাহাকে আপনারা দুই মনে করিয়াছেন, তাহা এক, তাহা কোনকালেই দুই ছিল না এবং সেই একের মহিমা ও বৈশিষ্ট্য এত বড় যে, তাহার গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি—এই কথাটি বুঝাইতে পারিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

চন্দ্রকুমার দে

মনসা ভাসান

(চন্দ্রাবতীর গীত অবলম্বনে রচিত)

শ্রাবণ মাস আসিলেই মনে পড়ে, সেই হতভাগিনী, সেই জন্মদুঃখিনী বেহুলার কথা। চারিদিকে জলদকুন্তলা হাস্যময়ী প্রকৃতির শ্যামচ্ছবি, উপরে জলদজাল জড়িত আকাশ, দূরে শ্যামল বনরাজি, শিরোভাগে ধূম-কিরীট শোভী গিরিশৃঙ্গের অপূর্ব শোভা, নীচে স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষেত্র সকল কলভরে অবনত। এই সময় বাঙ্গালার গৃহে গৃহে নবান্ন, দিকে দিকে আশার গান, চারিদিকে বিমলানন্দ। তারই মধ্যে কে যেন কোথা হইতে অলক্ষিতে থাকিয়া আপন করুণ বীণাটি, রহিয়া রহিয়া বাজাইয়া দিতেছে। তাহার সেই মর্মস্পর্শী প্রতি করুণ ঝঙ্কারে, মনে পড়ে সেই হতভাগিনী, সেই চিরদুঃখিনী বেহুলার কথা। যখন দিগন্তে মেঘের গুড়ু গুড়ু ধ্বনিতে শৈশবের জীর্ণ পুরাতন স্মৃতি একটি একটি করিয়া মনের ভিতর জাগাইয়া দেয়, সেই সঙ্গে মনে পড়ে দুঃখিনী বেহুলার কথা! শ্রাবণের রৌদ্র স্নাত নদীতে যখন সাঝের নৌকা সারি দিয়া বাহিয়া যায়, যখন তাহাদের সেই,

> 'কালনাগ মাঞ্জসে গেল লখাইরে দংশিয়া
> সায়রে ভাসিল বেহুলা পতি কোলে লইয়া'

প্রভৃতি অশ্রুজলে গাঁথা সবল ভাটিয়াল সঙ্গীতগুলি কানের ভিতর দিয়া মর্মস্থলে আঘাত করে, তখন মনে পড়ে হায় এই শ্রাবণ মাসেই না, এইরূপ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদীর উপর দিয়াই না, একদিন হতভাগিনী মৃত পতি বুকে করিয়া উন্মাদিনী বেশে কোথায় কোন অজানিত দেশে ছুটিয়া গিয়াছিল। সেই অনির্বচনীয় শোক গাঁথা আজও আমাদের কানে চির পুরাতন অথচ নিত্য নতুনরূপে ধ্বনিত হইতেছে। ধন্য সেই মহাকবিগণ, যাঁহারা সেই অমর সঙ্গীত গান রচনা করিয়াছিলেন। এই বিশ্বজগতের কত ঘটনা কত প্রবাহে পুরাতন হইয়া বিস্মৃতির অতল গর্ভে লয় পাইতেছে, কিন্তু বেহুলার স্মৃতি চির নতুন।

বাস্তবিক বাঙ্গালির পক্ষে, বিশেষত ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে শ্রাবণ একটি স্মরণীয় মাস। সুখে-দুঃখে গড়া এমন মাস বুঝি আর নাই। হর্ষ বিষাদের এমন উজ্জ্বল রেখাপাত আর কোন মাসের উপরই দেখা যায় না। হাসি ও অশ্রুতে গড়া শ্রাবণ মাস ময়মনসিংহবাসীর বড় আদরের ; এই সময় ময়মনসিংহের সার্বজনীন দুর্গোৎসব বা মহাশক্তির অংশ রূপিণী নাগমাতা বিষহরীর অর্চনা হইয়া থাকে। কুল ললনাগণ শ্রাবণী পঞ্চমীতে ঘট স্থাপন করিয়া, সারা মাস নিত্য সন্ধ্যাকালে মণ্ডপে ধুপধুনা জ্বালিয়া, হুলুধ্বনিতে আকাশ প্লাবিত করিয়া নিজ নিজ আবাসে নাগমাতার অধিষ্ঠান কামনা করেন। পুরুষগণ প্রত্যহ খোল করতাল সহযোগে তাহাদের সেই চির আদরের পুরাতন কাহিনী গান করিয়া দুঃখ দৈন্য অবসাদের হস্ত হইতে কিছুদিনের জন্য মুক্তি কামনা করেন। রমণীগণ তৎকালে নিশ্চেষ্ট থাকেন না। অবসরকালে

পাড়ার সমস্ত সঙ্গিনীগণ মিলিয়া বেহুলার পবিত্র স্মৃতি লইয়া তাহাদের কণ্ঠ গাঁথা এক অপূর্ব সঙ্গীত গান করিয়া থাকেন। প্রচলিত নারায়ণ দেব ও বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ হইতে এই গীত একটু স্বতন্ত্র রকমের আখ্যান বস্তু এক হইলেও ছন্দ ও সুর বিভিন্ন রূপ। এই সঙ্গীত রচয়িত্রী আমাদের প্রবন্ধান্তরে বর্ণিতা–মহিলা কবি চন্দ্রাবতী।

কবি চন্দ্রাবতীর গানে দেখা যায় জালু মালুই পদ্মা পূজার প্রথম প্রবর্তক। তবে হালুয়ারজাইরও নাম পাওয়া যায়। বন্দনা গীতির পরে কবি চন্দ্রাবতী এক স্থানে গাহিয়াছেন—

হালুর পুত্র কানাইয়া গো জাল বাহিয়া যায়,
পদ্মার আদেশে কাল দংশে তাহার পায়।
পার্বতী কানায়ার মাও এই কথা শুনি,
আউলাইয়া মাথার কেশ গো ছুটে পাগলিনী।
হেনকালে তথায় গো একটি যোগিনী
ছাই মাখা সর্ব অঙ্গে গো গলদেশে ফনী।
চূড়াকারে বান্দা কেশ গো পিঙ্গল বরণ
পার্বতী কান্দিয়া ধরে গো তাহার চরণ।
আউলা পার্বতী গো, বলিছে মোর মাও
বিনামূল্যে হব দাসী গো ছাওয়ালে জীয়াও।

পদ্মার কৃপায় কানাইর প্রাণ বাঁচিল। দেবী কৌশলে পার্বতীকে আপন পূজার উপদেশ দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তখন পার্বতী—

পঞ্চবর্ণের গুড়িতে গো অষ্টনাগ আঁকিয়া
তাহাতে স্থাপিল ঘট ভক্তি যুত হইয়া।
জয়াদি জোকার দিয়া গো পূজায় মনসা
পার্বতীর হইল পূর্ণ মনের যত আশা।

ক্রমে এই কথা দেশময় রাষ্ট্র হইল। জালু এখন লক্ষেশ্বর; সে সোনার ভৃঙ্গারে জল খায়, রূপার পালঙ্কে পার্বতীকে লইয়া নিদ্রা যায়। কানাইয়াকে আর মাছ ধরিতে হয় না। রত্নপতি নামে এক মৎস্য ব্যবসায়ী ধনবান সওদাগরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া জলটুঙ্গীর উপর বসিয়া হাওয়া খায়। এই কথা শুনিল চাঁদের স্ত্রী সনকা। সাধারণ দেবদেবীর উপর যতটা ভক্তি বিশ্বাস থাকে, সনকার তদপেক্ষা কিছু অধিক ছিল। রাজপাটেশ্বরী তৎক্ষণাৎ জালুর স্ত্রীকে আনিবার জন্য সুবর্ণ শিবিকা প্রেরণ করিলেন। এবং অচিরেই তাহার নিকট হইতে পদ্মা পূজার সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন। অচিরেই মহাপূজার ধুম পড়িয়া গেল। সোনার মন্দিরে সোনার ঘট স্থাপিত হইল। কাসর ঝাঁজরী শঙ্খ ধ্বনিতে, জয়মঙ্গল গীতে রাজবাটা চমকে মুখরিত হইয়া উঠিল। অগুরু, ধুপ, ধুনার গন্ধে আকাশ ভরিয়া গেল।

এই সংবাদ রাজ্যপতি চন্দ্রধরের কানে গেল। শৈব চূড়ামণি চন্দ্রধর, পাছে নব দেবতার পূজায় ব্যস্তসমস্তা সনকা, তাহার চির উপাস্য চন্দ্রচূড়কে অবহেলা করেন, এই ভয়ে হেমতাল নামক তাহার তীর্থ দর্শন তালের যষ্টি হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন। উপরে রত্ন বেদিকার উপর স্থাপিত সুবর্ণ ঘট, নীচে শিলাসনে ধ্যানমগ্ন সনকা। সনকা মনপ্রাণ পদ্মার চরণে উৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছেন। সহসা মন্দিরের ভিতর দ্রুম করিয়া শব্দ হইল, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া

সনকা দেখিলেন, পাষণ্ড স্বামী তাহার মহাপূজায় সর্বনাশ সাধন করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইতেছেন। ভগ্ন ঘট শতখণ্ড হইয়া রত্ন বেদির উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে। সনকা চৈতন্য হারাইলেন। কি সর্বনাশ!

দাম্ভিক রাজা তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া—
ঘোষণা করিয়া দিলা গো সপ্ত শত ঢোলে।
যে করিবে পদ্মা পূজা তারে দিবে শূলে॥

এই হইতেই বিবাদের সূত্রপাত। সেইদিন হইতে নিষ্ঠুর রাজার আজ্ঞায়, পদ্মা পূজা দেশ হইতে নির্বাসিত হইল। চন্দ্রধরের তাড়া খাইয়া—

'প্রাণ লইয়া পদ্মা দেবী উঠে দিলা দৌড়,
সীজ বৃক্ষের ডালেতে রহিলা করি ভর।

তখন পদ্মা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, ছলে বলে চন্দ্রধরকে বশীভূত করিতে না পারিলে, পূজা প্রচলনের উপায় নাই। তারপর একদিন যখন সুনির্মল প্রভাতে চন্দ্রধর চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্য যাত্রা করিলেন, তখন একদিন সময় পাইয়া বিষহরী, কালীদহ নীরে তাঁহার চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিলেন। ধনরত্নসহ চৌদ্দ ডিঙ্গা কালীদহের বিপুল আবর্তে তলাইয়া গেল। মহাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মৃতপ্রায় চন্দ্রধর তাহার এক বন্ধুর ঘাটে যাইয়া কূল পাইলেন। কিন্তু পদ্মার কপট চক্রান্তে ভুলিয়া, তাহার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুও তাঁহাকে সেই দুঃসময়ে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল।

সপ্তদিনের অনাহার, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ লইয়া চন্দ্রধর বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ এক রমণী সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল ও স্বর্ণপাত্রে সুরসাল বিবিধ সুমিষ্ট ফলমূল লইয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রধর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? রমণী বলিল, পূজার প্রসাদ। চন্দ্রধর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কার পূজার? রমণী উত্তর করিলেন, পদ্মার। মহারোষে তাড়া করিয়া, চন্দ্রধর তাহাকে মারিতে গেলেন।

'পদ্মার উচ্ছিষ্ট ফল লো তোর ঘৃণা নাই
ফল জল রাখি আগে তোর মাথা খাই।'

বলাবাহুল্য, কপট বেশধারিণী মনসা সহসা বন মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কিছুকাল পরে চন্দ্রধর, বনের মধ্যে এক পাকা কাঁঠাল দেখিতে পাইলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা কাঁঠাল নহে। পদ্মার কপটে ভীমরুলের চাক তাহার নয়নে কাঁঠাল রূপে প্রতিভাত হইতেছিল। হতভাগ্য রাজা তদ্দারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবার জন্য গাছে চড়িলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে ভীমরুল আসিয়া, তীব্র দংশনে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। গাছ হইতে পড়িয়া চন্দ্রধর লাফাইতে লাগিলেন। অন্য দিক হইতে পদ্মা শ্লেষবাক্যে চন্দ্রধরের কাটা গায়ে সূচ ফুটাইতে লাগিলেন—

'নৃত্য গীত নাহি দেখি না দেখি রাজন
কেবল বনের মধ্যে চাঁদের নাচন।'

চন্দ্রধরও প্রত্যুত্তর দিলেন—

'লঘু কানি সময় পাইয়া উপহাসে
পরে ত বুঝিব আগে যাই যদি দেশে'

বহুকষ্টে হৃতসর্বস্ব রাজা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তারপর পদ্মার অনুচর বিষধরগণ, তাহার ছয় পুত্রকে সাতবার করিয়া দংশন করিল, সাতবারই মহাজ্ঞান বলে চন্দ্রধর তাহাদের প্রাণ দান করিলেন। তখন মনসা বুঝিতে পারিলেন, মহাজ্ঞান হরণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই।

একদিন ঘোর বনে মৃগয়ার্থ প্রবেশ করিয়াই—

'সম্মুখে দেখিলা রাজা আশ্চর্য রূপসী,
আকাশ হইতে বনে খসিয়াছে শশী।
জটা জুট পিঙ্গল বর্ণ গো মাথার না কেশ
সোনার বরণ অঙ্গ গো যোগিনীর বেশ।'

যুবতী যোগিনীর সেই অপরূপ রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, নির্লজ্জ চন্দ্রধর, আপনি আপনি তাহার কাছে বিবাহ সম্বন্ধ মাগিলেন। রমণী বলিলেন--

'সঙ্কল্প আছয়ে এক গো জানাই তোমারে,
মহাজ্ঞান জানে যেই বিয়া করি তারে।
চান্দ বলে মহাজ্ঞান গো জানি ভাল আমি
আমারে করহ বিয়া গো সুন্দর রমণী।'

যোগিনী এই কথা শুনিয়া, চকিত দৃষ্টিতে নয়ন ফিরাইয়া লইল, যেন সে চন্দ্রধরের সেই কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। বনফুলের উপর দিয়া একটা ভ্রমর উড়িয়া যাইতেছিল। ক্ষিপ্র হস্তে চন্দ্রধর, তাহা ধরিয়া আনিয়া, ছিন্নশির করিয়া ভুতলে রক্ষা করিলেন। তারপর মন্ত্র প্রয়োগমাত্র ভ্রমর তৎক্ষণাৎ উড়িয়া আর একটি ফুলে যাইয়া বসিল।

যোগিনী ঈষৎ হাসিয়া আপন শ্রবণ যুগল চন্দ্রধরের মুখের কাছে ধরিল। তখন

'মহাজ্ঞান দিলা রাজা আড়াই অক্ষর
অন্তরীক্ষে উঠি পদ্মা রথে কৈলা ভর।
মূল সূত্র ছিড়ে গেল, ভাবিয়া বিষাদ
চন্দ্রাবতী কহে রাজা ঘটিল প্রমাদ।'

হায়! এমন সুজলবতী বর্ষা কাদম্বিনী যে কেবল বজ্রাগ্নি পূর্ণ হইবে, হতভাগ্য রাজা তাহা জানিতে পারে নাই। কিন্তু ভাবিয়া কি হইবে? বিষদন্তহীন অজগরের ন্যায় চন্দ্রধর সর্বস্বান্ত হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত হইলেন। চাঁদের আর এক সহায় ছিল, সে তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, ধন্বন্তরী ওঝা। পদ্মা দেখিলেন ধন্বন্তরী নিহত না হইলে, বিবাদে জয়লাভের আর কোন উপায় নাই। এখন গোপিনী বেশে বিষহরী শঙ্খপুরে যাইয়া, নানা ছল আলাপনে ওঝার স্ত্রীকে এমনি মোহিত করিলেন যে, ধন্বন্তরী পত্নী বাধ্য হইয়া তাহার সহিত সহেলা পাতিলেন। তাহার পর একদিন ধন্বন্তরীর আহার্য বস্তুতে মনসা দেবী ছল করিয়া এমন তীব্র বিষ মিশিয়া দিলেন, যে সেই মহাবিষে ওঝা আর রক্ষা পাইলেন না। হতভাগ্য চাঁদ সওদাগরের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল। বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি পার্বতীয় বর্ণলতায় চাঁদের যে যোজনব্যাপী উদ্যান সর্প ভয় হইতে এতকাল চম্পকরাজ্যকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, একদিন নাগবালাগণের নিশীথ আক্রমণে সে উদ্যানও সমূলে ধ্বংসীভূত হইল। নিবস্ত্র রথীর মত চম্পকরাজ্য, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপন মৃত্যুদিনের যেন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তারপর পদ্মার আদেশে—

'ছয় নাগে দংশিলেক ছয়টি কুমারে
কাঞ্চা রাড়ি ছয় বধূ রহিলেক ঘরে'

ক্রমে সহস্র সহস্র লোক, সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইতে লাগিল। হতভাগ্য রাজা, প্রজার আর কোন উপায় বিধান করিতে সমর্থ হইলেন না। দলে দলে প্রজাগণ, রাজ্য ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সোনার চম্পকরাজ্য, নিশির শ্মশান তুল্য নীরব, নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। শ্মশানের কোলে শাখাপত্রহীন তরুর ন্যায় চন্দ্রধর, শেষ যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। আর তো তাহার পুত্র নাই। পুত্র শোকের ভয় কি?

'নেড়া মোড়া হইয়াছি বিধাতার বরে
এইবার লঘুকানি দেখাইব তোরে।'
কিন্তু হায় কিছুদিন পরেই আবার—
'লক্ষ্মী কোজাগর দিনে জন্মিলে কোঙর
সনকা রাখিল তার নাম লক্ষ্মীন্দর।'

নবকুমারের মুখদর্শন করিয়া, আনন্দের পরিবর্তে চন্দ্রধরের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। লক্ষ্মীন্দরকে দেখিলেই চন্দ্রধরের অন্তরের ভিতর কি যেন একটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। রাজ্য গিয়াছে, পাছে ইহাকেও হারাই! শুভ দিনে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত আনিয়া রাজা নবকুমারের জন্মকোষ্ঠী তৈয়ার করাইলেন। কোষ্ঠীর ফল বড় ভাল হইল না।

'গণক লিখিল কোষ্ঠী অতি অলক্ষণে।
কালনাগে খাবে পুত্রে কাল রাত্তির দিনে।'

হতভাগ্য রাজা কোষ্ঠীর ফল আপনি শুনিলেন; সে সংবাদ সনকাকে শুনাইতে সাহস হইল না। ভাবিলেন পুত্রকে চিরকুমার রাখিব। তাহলে ত আর কালরাত্রি আসিবে না! বিশ্ব বিধাতার নির্বন্ধ খণ্ডাইতে পারে কার সাধ্য? ক্রমে লক্ষ্মীন্দরের যৌবনকাল উপস্থিত, সনকা ধরিয়া বসিলেন, পুত্র বিবাহ দিতে হইবে। চক্ষের কোণে অশ্রুটুকু সেদিন আর রাজা সনকাকে দেখাইলেন না। বুকের ভিতর রাবণের চিতা! পুত্রের বিবাহ দিবাব কি তাহার সাধ নাই? তবে—

তারপর একদিন ঢাকঢোল সানাইয়ের রবে চম্পক রাজার নগরের রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ। বিবাহ উৎসবে চন্দ্রধর ক্ষণকালের জন্যও যোগদান করিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রেব বাসর গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সপ্ততল গিরিশৃঙ্গে সেই বিশালকার লৌহ গৃহ নির্মিত হইল।

নির্দিষ্ট দিনে চন্দ্রধর সেই লৌহ গৃহের চারিদিকে, এক বিশাল ব্যূহ রচনা করিলেন; তীক্ষ্ণ ক্ষুর নকুল, সর্পভুক শিখণ্ডী, হাতী ঘোড়া লোক লস্কর লইয়া স্বয়ং চন্দ্রধব ভীমকায় হেমতাল হাতে করিয়া, বিনিদ্র নয়নে, ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তারপর যখন নব দম্পতি বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন, সহসা—

'ভাঙ্গিল মঙ্গল ঘট হয়ে শতখান
দেখিয়া সনকা মার উড়িল পরাণ
জোকার না ফুটে কণ্ঠে অশুভ জানিয়া
শকুনি গৃধিনী উড়ে মাঞ্জসে ঘেরিয়া'

এইরূপ অতি সন্তর্পণে, পুত্র ও পুত্রবধূকে মাঞ্জসে রক্ষা করিয়া, চন্দ্রধর নিশ্চিন্ত চিত্তে, মাঞ্জসের কবাট অর্গল বন্ধ করিলেন। হায় ! মূর্খ রাজা বুঝিতে পারে না, কাল অগোচর কোন পদার্থই নাই। এমন যে মাতৃগর্ভ, দূরত্বকাল কীট তাহাতেও প্রবেশ করিয়া, জীবন কোরক অকালে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। লোহার মাঞ্জস? সেত তুচ্ছ মর্ত মানবের ভ্রম প্রমাদের অধীন।

পরদিন প্রত্যুষে, মাঞ্জসের দ্বার উন্মোচিত হইল। দাম্ভিক রাজা দেখিলেন অকাল রাহুগ্রস্ত শশধবের ন্যায় তাঁহার বিগত জীবন পুত্র, পার্শ্বে হিম মলিনী লতা তাঁহার সেই হতভাগিনী পুত্রবধূ, শিশিরসিক্ত শেফালী কুসুমটির ন্যায় রাত্রে ফুটিয়া দিবসের কোলে যেন ঝরিয়া পড়িয়াছে।

'শাখে কান্দে পাখিরা পশুরা কান্দে বনে
বেহুলা হইল রাড়ি কাল রাত্রিব দিনে'

এখন সহস্র কণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। পূর্ণিমার রাকার উপর অকাল অমাবশ্যার কাল যবনিকা পড়িয়া ধীরে ধীরে সমস্ত চম্পকরাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। রাজা পাগল, রাণী পাগলিনী, রাজ্য শ্মশান, চারিদিকে হাহাকার, শোক সিন্ধুর বিপুল উচ্ছ্বাস !

তারই মধ্যে একদিন হতভাগিনী মৃত পতিকে গলায় জড়াইয়া কলার মান্দাসে ভাসিয়া স্রোতস্বতীর শৈবালের মত, উন্মাদিনী বেশে কোন্ অজানিত দেশে ছুটিয়া চলিল ! সনকা তখন ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি, উন্মাদিনী ! দেখিতে দেখিতে ছয়টি মাস কাটিয়া গেল। পিতা পুত্রের যান্মাসিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বসিয়াছেন। তিনবার অশ্রুজলে পিণ্ড কলঙ্কিত হইল। সহসা চন্দ্রধর পশ্চাতে নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন এক অপূর্ব দেবমূর্তি। দীন হীনা, মলিনবসনা এক অসহায়া রমণী তাঁহার আশ্রয়ভিক্ষা করিতেছে। দেখিয়াই চন্দ্রধরের একটা বিস্মৃত স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল। সে এক সদ্য বিধবার করুণ মুখ কান্তি। কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস মুখে ফুটিয়া বাহির হইল না। বেঁচে আছে কি সে হতভাগিনী। না না বৃথা আশা ! কোন দিন কোন প্রলয় স্রোতে কোন মহাতরঙ্গের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে। আর নাই, ইহ জীবনে আর তাহাকে—

সহসা গুঞ্জরীর নিথর জলরাশি ভেদ করিয়া দ্বিতীয় চম্পক এক তরীর বহর ভাসিয়া উঠিল। তখনই চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। ছয় ভাইর সঙ্গে আসিয়া লক্ষ্মীন্দর পিতার চরণ বন্দনা করিল। তখন ঘট্টা করিয়া পূজার আয়োজন হইল—

সেই হতে মনসার পূজা জগতে প্রচার
যে যে কামনা করে সিদ্ধি হয় তার।
অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন,
মৃত পুত্র জিয়ে আজ, পায় নয়ন।
মনসা চরণ যেই পূজে ভক্তি ভরে,
সর্প ভয় হতে মাতা রাখেন তাহারে।

পূজার উপাখ্যান শেষ হইল। এখন সেই হতভাগিনীর কথা। যে ভীষণ লোকনিন্দা, গরিয়সী জনকনন্দিনীকে পর্যন্ত লোকসমাজে কলঙ্কিতা করিয়াছিল, সেই লোকনিন্দার হস্ত হইতে পুণ্য প্রভাময়ী বেহুলার জীবন নিষ্কৃতি পাইল না। কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুণ্যবতী মহালোকে চলিয়া গেলেন। স্বর্গের সুরভী কুসুম মর্তের কণ্টক বনে স্থান পাইবে কেন?

ইহাই সহস্র বৎসরের অতীত কাহিনী, অথচ নিত্য নূতন। যুগযুগান্তরের অতীত কথা, অথচ যেন সেদিনের কোন প্রত্যক্ষ ঘটনা। বেহুলা ময়মনসিংহের বড় আদরের, বড় সোহাগের ধন। যেন কোনও সুবিশাল উপবনের একটি মাত্র আনন্দ কুসুম! যেন কোন সন্তান বৎসল রাজার দুলালী—একমাত্র দুহিতা। সীতা সাবিত্রীর অপেক্ষা বেহুলা ময়মনসিংহবাসীর অত্যধিক আদরের সামগ্রী, ঘরের মেয়ের মত সুপরিচিতা। সাবিত্রীর পিতার নাম অনেকেই না জানিতে পারে, কিন্তু চাঁদ বেনেকে না জানে, শাহ্ রাজাকে না চেনে, বেহুলাকে না বুঝে এমন লোক ময়মনসিংহে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিরল। দশ বৎসরের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও বেহুলার পূর্ণ কাহিনী অনর্গল শুনাইয়া দিবে।

কিন্তু এই অনন্ত ভালবাসার মধ্যেও বেহুলার প্রতি একটা অনাদরের ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে! সীতা সাবিত্রী নাম অনেকে রাখে, কিন্তু বেহুলার নামে নিজ দুহিতার নাম রাখিতে বড় দেখা যায় না। যদি কেহ কাহাকেও আশীর্বাদ করে, তুমি সীতা সাবিত্রীর মত হও, তবে, সে আশীর্বাদ অবনতশিরে গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি বলে বেহুলার মত হও, তা হলে সর্বনাশ! বেহুলার প্রতি এই অনাদরের কারণ বোধহয় বেহুলারই হতভাগ্য। এমন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কারও ভাগ্যে ঘটে নাই। সীতা স্বামী সঙ্গে বনবাসিনী, সে ত্যাগ স্বীকারেও সুখ আছে। বিশেষ পতিব্রতা পতি সঙ্গে যেখানেই থাকেন দুঃখ বোধ করিবেন না, ইহাই স্বাভাবিক। সীতার যা দুঃখ অশোক বনবাস কালে। পতি পরিত্যক্ত হইয়া বনবাসের কিছুদিন পরেই সীতা যমজ সন্তান কোলে লইয়া সকল দুঃখ পাশরিয়া ছিলেন। বনবাসের অতিমাত্রা দুঃখেও এইটুকু সুখ ছিল। আর সাবিত্রী—সাবিত্রীর দুঃখে বিদ্যুতের প্রখরতা আছে। কিন্তু তাহা তেমনি ক্ষণস্থায়ী। দুঃখের দাঁত হৃদয়ে বসিতে না বসিতেই আবার সুখ। সাবিত্রীর সে সুখ নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু বেহুলার দুঃখের সীমা নাই। যেন কোনও হতাভাগ্য জলমগ্ন ব্যক্তিকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া, কেবলই ডুবাইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। উদ্ধার নাই—মুক্তি নাই। বেহুলা নিরবচ্ছিন্ন হতভাগিনী। বেহুলাকে সবাই আদর করে। কিন্তু বেহুলার মত কেহই হইতে চায় না। চন্দ্রাবতী তাহার মেয়েলী সঙ্গীতের শেষভাগে লিখিয়াছেন—

'বেহুলার মত দুঃখী নাই ধরা তলে
ভাসান কাহিনী গাঁথা নয়নের জলে।'

চন্দ্রাবতী বঙ্গ নারীকে উপদেশ দিয়াছেন—

'বেহুলার মত কেউ পরিব্রতা হয়।
বিশ্বাসে জিয়াবে পতি চন্দ্রাবতী কয়॥'

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

বাউল গান

বাউল গানের নানা পদে জড়ানো যে-সব ভ্রষ্ট স্মৃতি, চিন্তার ভগ্নাংশ ও স্বপ্নের অনুরণন, সেই সবের অনুসরণে হয়তবা বাউল মতবাদের কেন্দ্র মূলে পৌছানো যেতে পারে। ঐসব স্মৃতি কিংবা চিন্তা অথবা স্বপ্ন পরস্পর প্রবিষ্ট, পরস্পরকে জড়িয়ে বিশেষ ভাবাকাশ রচনা করেছে, যেখানে দেখা মেলে কৃষিজীবী সমাজের নানা সমস্যা ও সেইসব সমস্যার সমাধান। তাই রূপকল্প দেহ-নিঃসৃত, দেহের ইন্ধনে ভাস্বর, দেহ ছাড়িয়ে কখনো যায় না। দেহাত্মবাদী অমন চেতনা কেন বারে বারে ঘুরে ঘুরে কৃষিজীবী সমাজ ছায়া ফেলেছে এবং কেনই বা প্রাক-অধ্যাত্মবাদী চেতনা বিভিন্ন ধর্ম দর্শন মতবাদ শোষণ করে বেড়ে উঠেছে? ওই দেহাত্মবাদী চেতনার মূল প্রবণতা মানবতার দিকে, তার দরুন বিভিন্ন ধর্ম দর্শন মতবাদের আনুষ্ঠানিক নয়, মানবতার দিকটি অন্তরিত করে বাউল সাধনার দার্শনিক মনোভঙ্গি উৎসারিত হয়েছে। বৌদ্ধ, হিন্দু ইসলামের প্রভাব বাউল মতবাদের উপর আছে, সেই সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক, হিন্দু ধর্মের শক্তি ও লোকজ ইসলামের লেংটা ফকিরী পরিণতির পথ ধরে বাউল মতবাদ ঐসব ধর্ম দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। তাই বাউল মতবাদে জটি[illegible]তা অন্তহীন, বৈচিত্র্যও অনিঃশেষ। কোন একটি বিশেষ স্মারক কেন্দ্র করে অবশ্য বাউল মতবাদকে বিশেষ ধর্ম কিংবা দর্শনের সঙ্গে যুক্ত কিংবা তাদের উপ[illegible]জাত বলে চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু সব প্রয়াসই বিভ্রান্ত হয়ে যায় দেহের উপর অমন জোর ও দেহ-নিঃসৃত রূপকল্পের প্রাচুর্যের দরুন। যদি ধরে নেয়া যায় যে, দেহাত্মবাদী অমন চেতনা কিংবা দেহের ইন্ধনে ভাস্বর ঐসব রূপকল্প নিছক প্রতীক মাত্র, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে, কেন রূপকল্প অমন হল, ঐ রূপকল্প বাদ দিয়ে কি অধ্যাত্মবাদী ধ্যান-ধারণা পরিস্ফুট করে তোলা সম্ভব নয়, অথবা ঐসব অধ্যাত্মবাদী ধ্যান-ধারণা প্রকাশের সাহিত্যিক কনভেনশন মাত্র? আর সাহিত্যিক কনভেনশনই যদি হয়, তাহলে কেন কৃষিজীবী সমাজের নানা সমস্যা ও সমাধানের ইঙ্গিত গানের পদে অনুরণিত?

জটিল বৈচিত্র্য বাউল মতবাদের বৈশিষ্ট্য, ধ্যান-ধারণা ও সাধন পদ্ধতিতে তারই স্মারক। এই জটিল বৈচিত্র্যের উৎস আদিম কৃষিজীবী সমাজ, দীর্ঘায়িত ধ্যান-ধারণা বাধাপ্রাপ্ত সমাজ বিকাশের জের, গুহ্য সাধনা পদ্ধতিতে জগৎ সংসারের সমস্যা সমাধানের প্রয়াস। বাউল মতবাদের সমান্তরালে পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জাতির জীবনযাত্রার তুলনা যদি করা যায়, তাহলে খুব সম্ভব পরিস্ফুট হয়ে উঠবে দেহাত্মবাদী চেতনার মূল কারণ, যৌন ও প্রজননরতিক্রিয়া নিঃসৃত রূপকল্পের পটভূমি। দেহভাণ্ডের অনুরূপে ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝার প্রয়াস থেকেই জন্ম নিয়েছে দেহাত্মবাদী চেতনা, তাই দেহ-নিঃসৃত রূপকল্প, তাই প্রজনন, যৌনকর্মের পাশাপাশি কৃষিজীবী সমাজের উদ্ভাসন।[১] আধুনিক মনের কাছে ঐসব উদ্ভাসন

১. যে সাধন-জোরে কেটে যায় কর্ম-ফাঁসী .

অশ্লীল মনে হতে পারে। কিন্তু যে সময়ে এসবের উদ্ভব, সেই সমাজের জীবনধারণ প্রয়াস পৃথিবী ও পারিপার্শ্বিক বোঝা ও আয়ত্তে আনার উদ্যোগের সংকেত ঐসব গানের পদে লুকানো। মন-উদাস করা সুর কিংবা অধ্যাত্মবাদী চেতনার কিনার-ঘেঁষা উচ্চারণ বাউল মতবাদের দীর্ঘায়িত ধ্যান-ধারণার জের, দীর্ঘায়িত ধ্যান-ধারণা সমাজের বাধাপ্রাপ্ত বিকাশের ফল। সামাজিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হলে মানসিক বিকাশে অন্তর্মুখী ফাঁপানো ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন দেখা দেয়। তার দরুন বাউল মতবাদের মূলসূত্র আদিম কৃষিজীবী সমাজ উৎসারিত, তার ধ্যান-ধারণায় উৎপাদন পদ্ধতির নিঃসঙ্গতার দরুন অন্তর্মুখী ইঙ্গিত, তার কারণ বাধাপ্রাপ্ত সমাজের মানসিক বিকাশ বিশেষ এক গণ্ডীর মধ্যে আবর্তিত। সেজন্য লালন শাহ কিংবা দুদ্দুশাহ উনিশ শতকের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মানসিক বিকাশ ঘটেছে কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অভিমুখেই। তুলনামূলকভাবে তাঁদের গান অধ্যাত্মবাদী চেতনার কিনার-ঘেঁষা। সাধন পদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণাও ফাঁপানো ফোলানো। সহজিয়া কিংবা নাথপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা যদি করা যায়, তাহলে স্পষ্ট হবে যে সহজিয়া কিংবা নাথপন্থীদের স্থূল প্রাক-অধ্যাত্মবাদী চেতনা এক্ষেত্রে মার্জিত হয়ে উঠেছে, ঐ মার্জিত ফাঁপানো-ফোলানো দিকগুলিতে লুকানো দীর্ঘদিনের বিকাশের ইঙ্গিত, উৎপাদন পদ্ধতি অপরিবর্তিত থেকেছে বলে মানসিক পরিবর্তন নির্দিষ্ট একটি ফ্রেমের মধ্যেই ঘটেছে এবং সেই ফ্রেমটি ঠিক করে দিয়েছে কৃষিজীবী সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিই।

কৃষিজীবনের সঙ্গে যৌনজীবনের যোগাযোগের পটভূমিতে বাউল মতবাদের কেন্দ্রমূলে পৌঁছানোর প্রয়াসে বাস্তব ভিত্তি আছে। উৎপাদন পদ্ধতি দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকার দরুন বাংলা সমাজের মানুষ অনুন্নত পর্যায়ের কৃষিকাজকে বেঁচে থাকবার অবলম্বন হিসাবে মেনে নিয়েছে ; তাই তাদের চেতনায় দেবী-প্রাধান্য প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে দেবী-প্রাধান্য অথবা মাতৃ-প্রধান তান্ত্রিক-প্রাধান্য কেন? বাউল মতবাদের পরিভাষায় বীজ-প্রাধান্য ও ক্ষেত্র-প্রাধান্য বলে দু'টি শব্দ আছে।[২] বীজ-প্রাধান্য পুরুষ-প্রাধান্যের অন্য নাম, ক্ষেত্র-

---

যদি জানবি সে সাধনের কথা হও গুরুর দাসী।।
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর
নপুংসককে শাসিত করো। আছে যে লিঙ্গ, ব্রহ্মাণ্ডের উপর
তারে প্রকাশি।।
মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি
রসিকের তেমনি করনিই,
ও সে আকর্ষণে আনে টানি,
ক্ষীরোদ শশী।।
কারণ-সমুদ্রের পারে গেলে পায় অধর চাঁদেরে,
অধীন লালন বলে নৈলে ঘুরে মরবি চৌরাশি।।
(উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, গান সংখ্যা : ১৫২)
মানব দেহ কৃষ্ণভূমি
যত্ন করলে রত্ন ফলে ;
তবে আমার আশা পূর্ণ হবে
শুভ যোগে চাষ করিলে।।
কর্ম-ধাতুর লাঙ্গল ধরে,

প্রাধান্য নারী-প্রাধান্যের পারিভাষিক নাম। পুরুষ-প্রধান সমাজে প্রজননের প্রধান কারণ পুরুষশুক্র, নারী-প্রধান সমাজে প্রজননের প্রধান কারণ স্ত্রী জননাঙ্গ। বাউল মতবাদের দীর্ঘায়িত ধ্যান-ধারণায় বীজ-প্রাধান্য ও ক্ষেত্র-প্রাধান্য দুই-ই কাজ করেছে। পুরুষ-প্রধান ঐতিহ্যে কিংবা মাতৃ-প্রধান ঐতিহ্যে বীজ অথবা ক্ষেত্রের উপর ঝোঁকের পটভূমি কিন্তু কৃষিজীবী সমাজ। কৃষিজীবী সমাজের বিশেষ পর্যায়ে পুরুষ-প্রধান ঐতিহ্যের স্মারক যেমন বীজ, তেমনি কৃষিজীবী সমাজের বিশেষ পর্যায়ে মাতৃ-প্রধান ঐতিহ্যের সংকেত ক্ষেত্র। প্রশ্ন শুধু এটুকু : বাংলাদেশের সমাজ অতীতে ঐ পর্যায়ের আভাস মেলে কিনা? যদি মেলে, তাহলে যৌন ও প্রজনন সংকেতাবলীর প্রতিবিম্বে উর্বরাশক্তির যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা? উর্বরা শক্তি কিংবা উৎপাদক শক্তির সঙ্গে প্রাকৃতিক উৎপাদক শক্তির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে কিনা?

সমাজ বিকাশের পিছিয়ে পড়া পর্যায়ের মানুষের ভাবনায় ঐ সব প্রশ্নের জবাব যেভাবে এসেছে, তার একটি দলিল বাউল মতবাদ। মানব সন্তান প্রজনন ও প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার কারণ অন্বেষণের পর্যায়ে দুই-ই এক হয়ে গেছে। প্রজনন সংক্রান্ত পদ্ধতি প্রকৃতিতেও কাজ করে। তাই তাদের ভাবনায় দুইয়েরই একাত্মতা, একটির সাহায্যে অন্যটি আয়ত্তে আনার প্রয়াস। অন্যপক্ষে, মানবীয় উৎপাদন শক্তিতে নারীই প্রধান। নারীর উৎপাদিকা শক্তি ও প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তির পট কৃষিকেন্দ্রিক সমাজই। তার দরুন কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে নারী-প্রাধান্য, প্রকৃতি সম্পর্কে ধ্যান-ধারণায় ও প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনবার কল্পনায় নারী-প্রাধান্যের প্রবল বিস্তৃতি ; নারী-দেহের বিশেষ সংস্থান কেন্দ্র করে ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার বিকাশ। তার মানে এ নয় কি যে কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার, তাই প্রথম পর্যায়ের কৃষিভিত্তিক সমাজ নারী-প্রধান তাই কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে নারীদেহের প্রতীকি মর্যাদা? তবে ঐ প্রশ্নের জবাব এই প্রশ্নের ভিতর লুকিয়ে আছে : বাংলাদেশের অতীতে ঐ পর্যায়ের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় কিনা?

বাউল গানের উৎপত্তি আনুমানিক ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ বলে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে-গানের উৎপত্তি, তার উৎস সুদূর বাংলাদেশের প্রাকৃত কৃষি অতীতে খোঁজা কি সঙ্গত? বাউল নামকরণ ও বাউল

ছয় বলদে নে চাষ কবে ;
সময় হলে বতন মিলে,
জো থাকিতে বীজ বুনিলে॥
এই জমি তোর চোদ্দ পোয়া,
ভগবানেব কৃপায় গেল পাওয়া,
মন্ত্র বীজে নে সৃজে
গাছ হলে বীজ জন্ম মূলে॥
কালাচাঁদ পাগল বলে,
ফুল ফুটিবে জলে,
ঐ রূপ মিলে ভজন সত্য হতে,
হৃদ কমলে প্রেম উথলে॥
(উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলাব বাউল ও বাউল গান, গান সংখ্যা : ৩৮৫)

গানের নানা পদে সে-সব ধ্যান-ধারণা ও রীতির স্মৃতি জড়ানো, দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। বাউল শব্দটির প্রথম ব্যবহার মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'। বাউল শব্দের ব্যুৎপত্তিতে দুটি ইঙ্গিত বিকীর্ণ। একটির অর্থ ভাবোন্মাদ, প্রথাগত সামাজিক রীতিনীতির বন্ধনমুক্ত অবস্থা। অন্যটির দ্যোতনা বায়ু শব্দ সংলগ্ন, যোগসাধনায় ইঙ্গিতবহ। ব্যুৎপত্তিগত এ দুটি ইঙ্গিত অত্যন্ত মূল্যবান, সমাজ ইতিহাসের পটে তার বিচার খুবই জরুরী। ঐ প্রথাগত সামাজিক রীতিনীতির বন্ধনমুক্ত অবস্থা, ঐ যোগসাধানার ইঙ্গিত, বাউল মতবাদকে ইতিহাসের দূর অতীতে টেনে নিয়ে যায়। অন্যপক্ষে বাউল মতবাদের অন্তঃসার যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদ কি ধর্ম দর্শনের মাধ্যমে উৎসারিত হওয়া সম্ভব ছিল, ততদিন বাউল নামকরণের দরকার পড়েনি। বাউল নামকরণ পরবর্তী পর্যায়ের, কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণার প্রলম্বিত প্রকাশ। বাউল মতবাদ আদিম সমাজের যথার্থ ভাবপ্রতিবিম্ব নয়, তবে পরিবর্তিত সামাজিক পটে ভাবপ্রতিবিম্বের টিকে থাকবার ফলমাত্র। পরিবর্তিত পটে আদিম অবস্থা আর নেই। তার দরুন বাউল সাধন পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়ে আদিম অবস্থার দ্যোতনা যেমন আছে, তেমনি পরিবর্তিত সামাজিক পটে প্রতিবাদী চেতনার অবলম্বনও। ঐ প্রতিবাদী চেতনা মনুষ্যত্ব নির্ভর, শ্রেণীবিরোধী, কিন্তু পরিবর্তিত সামাজিক পটের ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্রয়ের মাধ্যমে উৎসারিত, সেই উৎসারণে সাধনপদ্ধতির নানা সংকেত যোগতন্ত্র যাদুমন্ত্রের প্রভাব অব্যাহত। সেই আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রাক্-আধ্যাত্মিক চেতনার বিচ্ছুরণ বৈপরীত্যের ইঙ্গিতবহ। তবে বৈপরীত্য কেন? বৈপরীত্যের কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজের ভাবাকাশের ফ্রেম তৈরি হয়েছে ধর্মবোধ থেকে। সে কারণে ঐ সময়ের যে কোন দর্শন কি মতবাদ বলীয়ান ধর্ম কি দর্শনের প্রতিবাদে অথবা সমান্তরালে উৎসারিত হলে সে উচ্চারণের ফ্রেমে নির্ভর করেছে ধর্মবোধের উপর। প্রত্যয়ের মাধ্যমে জগৎসংসার বোঝা ও ব্যাখ্যা মানুষ ক'রে থাকে। এ যুগের প্রত্যয় দিয়ে অন্য যুগের পারম্পর্য ও সূত্র ধরা যায় না তার কারণ সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন। এক সমাজ কাঠামো যে প্রত্যয় তৈরি করে, সে প্রত্যয় সেই কাঠামোতে প্রাণ, গতি ও দার্শনিক অর্থ প্রতিক্ষিত করে। মধ্যযুগের জগৎসংসার বোঝা ও ব্যাখ্যা করার মাধ্যম ছিল ধর্ম, ধর্ম মধ্যযুগের প্রত্যয়; তার দরুন বিজ্ঞানকে ধর্মমনস্ক হতে হয়েছে, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাও ধর্মের কিনার ঘেঁষে চলেছে। অন্যপক্ষে বর্তমান যুগের প্রত্যয় বিজ্ঞান, তার দরুন ধর্মকেও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রচনায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। প্রত্যয়ের ইতিহাস তাই সমাজ কাঠামোর অভিজ্ঞতার ইতিহাস। বলীয়ান প্রত্যয়ের উপযোগী অন্য সব ধর্ম দর্শন মতবাদকে হতে হয় অন্য সব ধর্ম দর্শন মতবাদের বলীয়ান প্রত্যয়ের মাপে পোশাক তৈরি করা। বলীয়ান প্রত্যয়ের যুক্তি ধার করে স্বপ্ন দেখা জ্ঞানের ইতিহাস প্রক্রিয়ার কাজ করে। বাউল মতবাদের আধ্যাত্মিক চরিত্র লক্ষণের এই খুব সম্ভব কারণ। ঐ আধ্যাত্মিকতা স্তরে স্তরে বাউল মতবাদে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু ঐ আধ্যাত্মিকতা থেকে বিদ্যুতের মতো তীব্র উজ্জ্বল ও পৌনঃপুনিকভাবে বিচ্ছুরিত এমন সব ইঙ্গিত, মনস্তত্ত্বের এমন সব আভাস পাওয়া যায় যার উৎস আধ্যাত্মিকতার স্বর্গে নয়, কৃষিজীবী মানুষের ইতিহাসে। বাউল গান যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা আদিম কৃষিজীবী সমাজের বংশধর, বাধাপ্রাপ্ত সমাজবিকাশের দরুন ঐ পর্যায়ের ধ্যান-ধারণা অলক্ষ্যে স্তরে স্তরে সমস্ত সমাজে ব্যাপ্ত। বাউলদের মনস্তত্ত্ব ধ্বনিত ঐ ধ্যান-ধারণায়। সামাজিক কারণে তাঁরা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষ বলে পূর্ব যুগের ধ্যান-ধারণা তাঁদের মানসিক চেতনার অভ্যাসে এসে গেছে। অন্যপক্ষে উন্নততর

কৃষিজীবী সমাজের নিম্নস্তরের বাসিন্দা বলে তাঁদের চেতনায় ধর্মবোধের কারুকাজ এসেছে লোকজ সংস্কৃতির পথ ধরে। তাই বাউল গানের আকাশ-বাতাস শুদ্ধ ধর্মের আকাশে নয়। ধর্মবোধ যুগের প্রত্যয়, সেই প্রত্যয়ের ব্যবহার বাউল গানে। বলীয়ান সমাজ ও সংস্কৃতি উদ্ভূত এই ধর্মবোধের ব্যবহার বাউল গানে বৈপরীত্যের জন্ম দিয়েছে মাত্র। বাউলদের সপ্রেম শোণিতগন্ধী দেহ-পরিক্রমা ধর্মবোধকে বারবার খণ্ডিত করেছে, কামস্রাবী আকাঙ্ক্ষার মূল ধর্মের স্বর্গে নয়, আদিম কৃষিকর্মের ইতিহাস ও ভূগোলে। ধর্মবোধ জগৎসংসার বোঝা ও ব্যাখ্যা করার সপ্তদশ শতাব্দীর প্রবল মাধ্যম। এখানেই লুকিয়ে আছে বাউল মতবাদের আধ্যাত্মিক চেতনার কিনার-ঘেঁষা উচ্চারণের কারণ। অন্যপক্ষে ঐ চেতনা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক হতে পারেনি, তার কারণ বাউল মতবাদ ও সাধন পদ্ধতির ঐতিহাসিক উৎসের দরুন এবং সে উৎস আদিম কৃষিজীবী সমাজে যেখানে কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার, সে সমাজ যাদুমন্ত্রের প্রবল প্রভাব এবং যে সমাজের চেতনার ফ্রেমে উৎপাদক শক্তি নিয়ন্ত্রিত, সেই উৎপাদিকা শক্তি সমাজের নারী গোষ্ঠী। তার দরুন চেতনায় নারী প্রাধান্য প্রতীকে নারীর শারীরী বিচ্ছুরণ, প্রজনন ও যৌনকর্মের রূপকল্পের বিস্তৃতি। যে চেতনা মূলতঃ দেহনির্ভর সে চেতনায় মানবিক বোধ ধরা দেয়। তাই দেহনির্ভর বাউল চেতনার প্রাক-আধ্যাত্মিক বাউল ধ্যান-ধারণাগুলির উৎস কৃষিকেন্দ্রিক যাদুবিশ্বাস তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে এবং উৎপাদন পদ্ধতির বাধাপ্রাপ্ত বিকাশের দরুন কৃষিকাজকেন্দ্রিক ও কৃষিকর্ম-উৎসারিত ধ্যান-ধারণা দেশের সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন টিকে থেকেছে। কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির অমন দীর্ঘ বিস্তৃতির কারণ এ নয় কি যে, বাউল মতবাদ কৃষিকাজ আবিষ্কার থেকে কৃষিকর্মের উন্নত পর্যায়ের ইতিহাসে বিধৃত। তাই বাউল মতবাদের একপক্ষে মাতৃ-প্রাধান্যমূলক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পুরুষ প্রাধান্যমূলক ধ্যান-ধারণা সংলগ্ন, অন্যপক্ষে শ্রেণীসমাজের কৃষিভিত্তিক পটে টিকে থাকবার দরুন অধ্যাত্মবাদী চেতনার কিনার-ঘেঁষা। সেজন্য বাউল-মতবাদ থেকে থেকে বেজে উঠে মাতৃ-প্রাধান্যমূলক কিংবা পুরুষ-প্রাধান্যমূলক সমাজের স্মৃতি, সেই সঙ্গে বেজে উঠে পরিবর্তিত সমাজের পটে সেই স্মৃতির অধ্যাত্মবাদী চেতনাকে আলিঙ্গনের গান। এই আলিঙ্গনের চেতনা একান্তই দেহনির্ভর বলে কেবল চেতনা বা জ্ঞান বাউল মতবাদে পরম সত্য হয়ে ওঠেনি, অন্যপক্ষে অধ্যাত্মবাদী দর্শনে চেতনা কিংবা জ্ঞানই সত্য। বাউল মতবাদে চেতনা নয়, দেহই সর্বশক্তিমান। অন্যদিকে দেহের জাত কিংবা ধর্ম নেই, সেজন্য দেহাত্মবাদী চেতনা মানবিক বোধের প্রকাশ মাত্র। ঐ দেহাত্মবাদী মানবিকবোধ অন্য ধর্ম দর্শনের মানবিকতাবাদী দিকটির সঙ্গে একাত্মতাবোধ করেছে কিন্তু ঐ একাত্মতাবোধ বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য কিংবা ইসলামের সম্পূর্ণ দর্শনের সঙ্গে নয়। পালপর্বে বৌদ্ধধর্ম, সেনপর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও মুসলিম পর্বে ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ছিল। রাষ্ট্রধর্মের পাশাপাশি লোকজ মতবাদ কিংবা বাউল ধ্যান-ধারণা স্বতন্ত্র দর্শনের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তার কারণ বাউল মতবাদের উৎস কৃষি অতীতে অন্যপক্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্র ধর্মগুলোর বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ের শ্রেণীবিভক্ত কৃষিসমাজে। সাক্ষাৎভাবে বাউল মতবাদের যারা অনুসারী তাদের পাল কিংবা সেন অথবা মুসলিমপর্বের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে সমাজবন্ধনহীন জীবনযাপন মেনে নিতে হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন মণ্ডলীতে তারা রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে হয়ে পড়েছে নিষ্ক্রিয় ; অন্যপক্ষে বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শক্তি ও ইসলামের ফকিরী পরিণতিতে, লোকজ ভাবধাবার কাছে বিকৃতির পথ ধরে

আত্মসমর্পণের ইতিহাসে যেমন পরিস্ফুট কৃষিকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি তেমনি লোকজ ভাবধারার মাধ্যম বাউল মতবাদের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় ধর্মগুলোর মানবতা-বিরোধী বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক দিক, সেই সঙ্গে শ্রেণী সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সে প্রতিবাদ কখনো উৎসারিত হয়েছে প্রবল, মানবিক স্তরে কখনো বা তীব্র তিক্ত ব্যঙ্গের ঝোঁকে।[৩]

বাউল মতবাদে কৃষি সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সেই কৃষি সংস্কৃতির বাংলাদেশে সামাজিক পট কেমন ছিল? বাউল মতবাদে নারীপ্রাধান্য, তার জন্য বাউল মতবাদকে বামাচার বলা যেতে পারে। নারী প্রাধান্যমূলক ধ্যান-ধারণা কিংবা বামাচার বাংলাদেশের নানান ব্রত কথায় দেবীমাহাত্ম্যে টিকে আছে। ঐ ব্রতকথা, ঐ দেবীমাহাত্ম্যের মানে কি? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতকথার স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন : 'ব্রত হলো মনস্কামনার স্বরূপটি। আল্‌পনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে-নৃত্যে ; এক কথায় ব্রত বলে মানুষের গীতকামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত্‌ কামনা।' (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার ব্রত, পৃ. ৫৮) এই কামনার অন্তঃসার বিশ্বাসের পরীক্ষা, প্রকৃতিকে প্রভাবিত করার কৌশল। উৎপাদন পদ্ধতির যে পর্যায়ে ব্রতের জন্ম সেখানে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও আয়ত্তে আনার উপকরণ ছিল না। তার দরুন কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে প্রকৃতির ফলপ্রসূতা সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ করবার তাগিদ থেকে ঐ বামাচার, ঐ ব্রতকথা, ঐ দেবীমাহাত্ম্যের জন্ম হয়েছে। প্রকৃতির ধরন-ধারণ অজানা, তাই মনের বিশ্বাস জাগিয়ে রাখার জন্য দরকার ব্রতের নৃত্যের, নাট্যের ও চিত্রের। ঐ সবের মাধ্যমে হয়ত প্রকৃতিকে প্রভাবিত করা সম্ভব। ব্রতে তাই যাদু বিশ্বাসের অমন তীব্রতা। কৃষিভিত্তিক সমাজের আদিম পর্যায়ে প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের অস্বচ্ছতার দরুন যাদুবিশ্বাস জরুরী হয়ে উঠেছে। ঐ যাদুবিশ্বাসের সঙ্গে মেয়েলী আচারের সম্পর্ক কি?

---

৩ সব লোক কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কিরূপ, দেখলাম না এ নজরে।।
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীলোকের কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ,
বামনী চিনি কি করে।।
কেউ মালা, কেউ তসবী গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।।
গর্তে গেলে কূপ জল কয়,
গলায় গেলে গলাজল হয়,
মূলে একজন, সে যে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে।।
জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথাতথা,
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাত বাজারে।।
(উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, গান সংখ্যা : ১৩০)

দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলছেন : "কৃষিবিদ্যা মেয়েদের আবিষ্কার। কৃষি উপলক্ষে যাদুবিশ্বাসও স্বভাবতঃই নারীকেন্দ্রিক। তার মানে শুধু এ নয় যে, ঐ যাদুবিশ্বাসমূলক আচার-অনুষ্ঠানগুলো প্রধানতঃই মেয়েলি ব্যাপার ; তাছাড়াও মেয়েদের জীবনের মূল লক্ষণের উপর এই যাদুবিশ্বাস নির্ভরশীল। তাই এ পর্যায়ের চিন্তা চেতনায় শুধুই যে নারীপ্রাধান্য, শক্তিপ্রাধান্য বা প্রকৃতিপ্রাধান্য—তাই নয়, সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারে নারীর ভূমিকা এবং ফসল ফলার ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকা—এ দু'এর মধ্যে একটা গভীর যোগাযোগ হওয়াই স্বাভাবিক। (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন : পৃ. ৩৪৭) নারীর সন্তান উৎপাদন ও প্রকৃতির ফলপ্রসূতা, দুই-ই উর্বরা শক্তির সংকেত। উর্বরাশক্তির আভ্যন্তরীণ অর্থ বোঝা ও আয়ত্তে আনার প্রয়াস থেকেই নারীর সন্তান উৎপাদন ও প্রকৃতির ফলপ্রসূতার মধ্যে যোগাযোগের কল্পনা দেখা দিয়েছে। রবার্ট ব্রিফল্ট বলছেন :

> 'The magical or religious rites intended to secure the fertility of the fields, were naturally within the special competence of the women who cultivated them, and whose fertility was linked to the earth's. Many of the women's religious associations were doubtless concerned originally with discharging that important function'. (Robert Briffault : The Mothers, p. 3:3)

প্রকৃতির উর্বরাশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে মেয়েদের যোগাযোগ অস্বাভাবিক নয়। মেয়েরা কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছে তাই কৃষিকর্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুরুষ থেকে ভিন্ন। তাছাড়া মেয়েদের ঋতুমতী হওয়া ও সন্তান প্রজননের সঙ্গে প্রকৃতির ফলপ্রসূতার মিল আছে। তাই মেয়েদের পক্ষে যেমন প্রকৃতিকে প্রভাবিত করা সম্ভব, তেমনি প্রকৃতির পক্ষে মেয়েদের প্রভাবিত করাও সম্ভব। অমন বিশ্বাসের নানা নজিব পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া মানুষের ভেতর আজও দেখা যায়। জুলুদের মধ্যে প্রচলিত আছে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েরা যদি ক্ষেতে শস্য ছড়িয়ে দেয় তাহলে ফসল বেশি হবে। নিকোবর দ্বীপবাসীদের ধারণা গর্ভবতী মেয়ে যদি গাছ রোপণ করে তাহলে বাগানে প্রচুর ফল হবে।[৪] অন্যপক্ষে শুধুমাত্র মেয়েদের কামনা থেকে শস্যবৃদ্ধি ব্রত অনুষ্ঠানের নমুনা বাংলাদেশেও মেলে। তোষলা ব্রত তার নমুনা। পৌষ মাসের সকালে মেয়েরা এ ব্রত উদযাপন করে। 'অঘ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সকালে স্নান করে গোবরের ছ-কুড়ি ছ-গণ্ডা বা ১৪৪টি গুলি পাকিয়ে কালো দাগশূন্য নূতন সরাতে বেগুনপাতা বিছিয়ে তার উপরে গুলি ক'টি রাখতে হয়। প্রত্যেক গুলিতে একটি করে সিঁদুরের ফোঁটা এবং পাঁচগাছি করে দুর্বাঘাস গুঁজে দিতে হয়। তার উপর নতুন আলোচালের তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সর্ষে, সিম, মূলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয় ; ব্রতের নাম এবং উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটি সরিমাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বর করে তোলার ব্রত।' (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রতঃ পৃ. ২৭) ব্রত উদ্‌যাপনের ব্যাখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সরিমাটি ছিটোবার পিছনে যাদুবিশ্বাস সক্রিয়, শস্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রবল। ব্রতটি কৃষিকেন্দ্রিক এবং ষোল আনাই মেয়েলি-পুরুষের ভূমিকাহীন এ তথ্যটি স্মরণযোগ্য।

৪. Encyclopaedia of Religion and Ethics.

তোষলা-ব্রত ষোলআনা মেয়েলি এবং ব্রত উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি। মেয়েরা উর্বরতার প্রতীক, তার দরুন তাদের পক্ষেই মাটিতে উর্বরতা সঞ্জীবিত করে দেওয়া সম্ভব, ব্রত হচ্ছে তার মাধ্যম এবং মাধ্যমের ছড়া, গীত, রীতিকরণে যাদুবিশ্বাসের বলীয়ান প্রভাব। উর্বরতা শক্তির সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্কের আসল তাৎপর্য কি? বাউল মতবাদে রেতঃ রজের থেকে সমাচার পাওয়া যায়। ঐ রেতঃ ঐ রজঃ যৌনজীবনের সঙ্গে যুক্ত। রেতঃ পুরুষের ও রজঃ নারীর উর্ববতা-শক্তির মূলে। ঐ সব উর্বরতার প্রতীক। কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার, নারীজীবনের গোপন সব রহস্য ঐ কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান ঘিরে। প্রজনন রহস্য আদিম মানুষের চেতনায় যেভাবে ধরা পড়েছে তার একটি নজির নারীর উর্বরতা শক্তির সঙ্গে প্রকৃতির উর্বরাশক্তির নিবিড় ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করা। সন্তান উৎপাদন ও ফসল উৎপাদন একই ক্রিয়ার ভিন্ন পর্যায়মাত্র। উৎপাদন পদ্ধতি আদিম বলে খাদ্য উৎপাদনের জন্য যাদুবিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন। ঐ যাদুবিশ্বাসের কেন্দ্রে আছে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি এবং উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় যৌনকর্ম।

> "The belief that the sexual act assists the promotion of an abundant harvest of the earth's fruits, and is indeed indispensable to secure it, is univerasl in the lower phases of culture.' (Robert Briffault : The Mothers, p. 3 : 196)

মানব সমাজের বিশেষ পর্যায়ে যৌন অনুষ্ঠান সেজন্য কেবল কামবাসনার পরিতৃপ্তিই নয়, এ হচ্ছে অনুষ্ঠান বিশেষ এবং এ অনুষ্ঠানের সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের সম্পর্ক নিবিড়। ফসলবৃদ্ধির সঙ্গে মৈথুনের এ সম্পর্কে উদ্ভাসিত আদিম কৃষিজীবী সমাজের অর্থনৈতিক চরিত্র। বাউল মতবাদে লতাসাধনা, যন্ত্রসাধনা, ত্রয়ী নাড়ী-সাধনা (বৌদ্ধ মতে ললনা, রসনা, অবধূতী : ব্রাহ্মণ্য মতে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না) ষটচক্র কিংবা ছয় লতিফার উল্লেখ আছে।[৫] লতা সাধনার অর্থ নারী জননাংগের সাধনা, অন্যপক্ষে নারী জননাংগের লতা নামকরণে ফসলের ইঙ্গিত লুকানো।[৬] যন্ত্র অথবা লতাসাধনা যাদুবিশ্বাসের অঙ্গ। নারী জননাংগ

৫ ও চিন আপনার আপন—চিনে যে-জন,
ও সে দেখতে পাবে রূপের কি কিরণ।
আপন আপন রূপ সেই বা কোন্ স্বরূপ,
তবে স্বরূপের যে রূপ জানি এ কারণ।।
সেই ঘরের অন্বেষণে ডাকে যে বা জন
ঘরের মধ্যে আছে লতিফা ছয় জন।
আছে ঘরে পাক পাঞ্জাতন আত্মপঞ্চজন
সেই আত্মাই দিয়া করে আত্মার ভজন।।
সেই রসিকেরই মন রসেতে মগন,
ও রূপ রসেতে যে-জন দিয়াছে নয়ন।
ও ফকির লালন বলে, হার হলেম আমি,
ও আমি বিনে আমার সকল অকারণ।।
(মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত হারামণি, ৫ম খণ্ড, গান সংখ্যা : ১২৩)

৬. কবি কেমনে সহজ প্রেম-সাধন

প্রজননের মূল কারণ, তার দরুন তারই মাধ্যমে প্রকৃতির উর্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা, পৃথিবীর নানা জায়গায় প্রাপ্ত বিভিন্ন মাতৃকামূর্তি তারই প্রমাণ। নারী জননাংগ কেবল সন্তানের উৎস নয়— শস্যেরও। নারী জননাংগের লতা নামকরণে তারই ইঙ্গিত। ত্রয়ী নাড়ী গংগা, যমুনা ও সরস্বতী নদী। এ তিন নদীর অথবা শুক্রবাহী তিন নাড়ীর মিলনও বাউল পরিভাষায় ত্রিবেণী সঙ্গম।[৭] প্রকৃতির রজঃস্রাব বাউলদের কল্পনার ত্রিবেণীর ধারার মত। এ ধরার নাম জোয়ার কিংবা বন্যা। এ জোয়ার ধারায় মীন দেখা দেয়।[৮] সে মীন অধর মানুষ। এ মীন অথবা মৎস্যের

কাম-নদীতে কেঁপে ওঠে প্রেম-নদীর তুফান।
প্রেম-বত্ন ধন পাবাব আগে
ত্রিপিনিব ঘাট বাঁধলাম ক'ষে।
কাম নদীর এক ধাক্কা এসে
ছিঁড়ে দেয় বাঁটন ছাঁদন।
কি বলবো প্রেমেবই কথা
প্রেম হল কামেবই লতা
কাম ছাডা প্রেম যথাতথা
এটা আগমন।
পবমপতি যার পিরীতি
কাম তরু হয তাব নিজপতি।
কাম ছাড়া প্রেমের গতি—
কয় ফকিব লালন।
(মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুব উদ্দীন সম্পাদিত হাবামণি, ৫ম খণ্ড, গান সংখ্যা : ১০৭)

৭. সোনাব মানুষ ভাসছে বসে
যে দেখেছে বস পাণ্ডি—
ও তাব সেই সে দেখা পায অনাযাসে॥
তিন শ' ষাট রসেব নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
ও তাব মাঝে রূপ নিরবধি
সে রূপ কলঙ্ক দিছে এই মানুষে॥
মাতাপিতাব নাই ঠিকানা
অচিন দেশে বসতখানা,
আজগবী তাব আওনা-যাওনা,
ও মানুষ বলে এই কাবণ
বাবিব যোগবিশ্বাসে।
অমাবস্যা চান্দেব উদয়—
দেখতে যাব বাসনা হৃদয,
লালন বলে, নেই তো সদয়,
নেই কো ত্রিবেণীব কিনাবায় বসে।
(মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুব উদ্দীন সম্পাদিত হারামণি, ৫ম খণ্ড, গান সংখ্যা : ১১২)

৮. প্রেম-ডুবারু বিনে কে জানে।
ও সে জানে প্রেমেব গতি
কূটিল অতি
ডোবে গহইনে॥

তাৎপর্য কি? মাতৃপ্রধান ধর্মবিশ্বাস থেকেই মৎস্য প্রতীকের উদ্ভব এবং মৎস্য–উর্বরতা বৃদ্ধির প্রতীক। এস, কে, দীক্ষিত বলছেন :

'In India, too, fish is looked upon with reverence.....all varieties are emblems of fertility, and therefore, used in marriage rites. The significance of fish in the religious rites pertaining to marriages of the Aos, the Chorigis, the Lohars of the U.P as well as of the Bengalis may, therefore, be now apparent...that is why fish is taboo to a Bengali widow, and is to be held in her hand by a Bengali bride in performing marriage rites...Mina (fish) forms one of the panchamakars (five m-s) of the Vama-Margin Saktas, a section of the Indian devotees of the Mother-Goddess, who have kept up faithfully most of the barbaric traditions connected with her worship in all their pristine purity. (S.K. Dikshit : The Mother Goddess, p. 30 : 6)

মীন উর্বরতার প্রতীক, রজঃস্রাবের ধারায় অধর মানুষ জন্মায়, অধর মানুষ এভাবেই রজঃস্রাব থেকে উৎসারিত হয়ে মীনের উর্বরতার প্রতীকে বিস্তৃত হয়ে গেল। রজঃস্রাব যদি নদীর ধারা হিসাবে কল্পনায় ধরা দেয়, তাহলে, যে মানুষ এখনো জন্মেনি তাকে ত মীনের প্রতীকে ভাসতেই হবে ঐ ধারায়। তাছাড়া ষটচক্র অথবা ছয় লতিফার কয়েকটি দলযুক্ত পদ্ম আছে বলে বাউল মতবাদে উল্লিখিত।[৯] ঐ পদ্মের অর্থ কি? পদ্ম প্রতীক, নারী জননাংগের প্রতীক।

সামান্যে কি চিনে সেই নদী,
সেথা বিনে হাওযাব ঢেউ ওঠে নিববধি,
শুভযোগে জোযাব আসে যদি
ত্রিবেণী ভেসে যায় সমানে॥
মৃত্তিকাহীন নদী পবে
মীন এক আসা–যাওয়া করে
অন্যে চিনতে পাববে কেনে।
পূর্ণিমার যোগে সে মীন ভাসে,
কারুণ্য তারুণ্য এসে লাবণ্যে যখন মিশে।
সাধকে মীন ধবতে পাবে সেই দিনে
সেই নদীতে চান কবিলে শুভযোগে
ওবে ভবভয় তোব দূরে যাবে।
লালন কয় এড়াবি শমনে॥
(উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, গান সংখ্যা : ১১৯)

৯. এই সোনার মানুষ বাতাসেব আগে চলে
খুঁজলে তাবে নাগাল পাবে কে?
সে মানুষে হিসাব ধরেছে সাধু
ও তার সন্ধান আছে যার কাছে॥
লাহুত, নাসুত, মালাকুত জবরুত,
চাব মোকামে মানুষ বয়েছে হুজুব

'In Egypt and amongst the Saivites in India, the lotus is symbol of the reproductive act (Creuzer, Symbolik and Mythologic, Liepzig, 1936-43, I,i, 412) The Buddhists of north countries still repeat, without suspecting the origin of the phrase, 'Om,' the Jewel in the lotus. Amen' (Brinton, the Religious Sentiment, 214). In the west, too, these symbols persist, even when, as also among the Buddhists, they contradict the central doctrine of the religion in which they appear', (Encyclopaedia of Religion and Ethics)

এভাবে দুই পর্যায়ের উর্বরতার প্রতীকের সংযোগ হয়েছে বাউল মতবাদে, প্রাকৃতিক উর্বরতার সঙ্গে নারীর উর্বরতা মিলেমিশে গেছে। বাউল পরিভাষায় মানবীয় ফলপ্রসূতার সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা একাত্ম হয়ে গেছে। তাই নারী জননাংগের নাম লতা, ত্রয়ী নাড়ী রজঃস্রাবের নামান্তর, সেই রজঃস্রাবের ধারায় মীনের আবির্ভাব, যে-মীন উর্বরতার প্রতীক, এবং ঐ মীন থেকে ঐ উর্বরতার প্রতীক থেকেই অধর মানুষের জন্ম। এভাবেই সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ পর্যায়ে মানুষের চেতনায় নারীর প্রজনন শক্তি ও প্রকৃতির উৎপাদন শক্তির মিলন ঘটেছে, সেই শক্তির রহস্যের মূল তারা চিহ্নিত করেছে মৈথুন কর্মে। ঐ মৈথুন কর্মের মধ্যে দিয়ে উর্বরতার আবির্ভাব হয়। পৃথিবীকে বুঝবার চেষ্টা এভাবেই দেহের মাধ্যমে বেঁচে থাকবার তাগিদেই দেখা দিয়েছে। তাই দেহভাণ্ডের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের ধ্যান-ধারণা উন্মোচিত হয়েছে। ঐ উন্মোচনের পটভূমি কিন্তু অনুন্নত পর্যায়ের কৃষিজীবী সমাজ।

বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতা থেকেই বাউল রীতিকরণ পদ্ধতির জন্ম হয়েছে। রীতিকরণ পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির একাত্মতা কৃষিজীবী সমাজের অর্থনৈতিক চরিত্রের ইঙ্গিতবহ। সে ইঙ্গিত বাউল মতবাদেও টিকে আছে। বাউল দেহতত্ত্বে শক্তি কিংবা প্রকৃতি প্রবল ও বলীয়ান। শক্তি কিংবা প্রকৃতি নারীপ্রাধান্য থেকে উৎসারিত, তার দরুন বিশ্ব-পৃথিবীর মূলধারা নারীর প্রতিবিম্বে ধরা দিয়েছে। ঐ শক্তি কিংবা প্রকৃতির তাৎপর্য কি? কেনই বা দেহতত্ত্বে পুরুষ অপেক্ষাকৃত নির্লিপ্ত, উদাসীন? তার কারণ খুব সম্ভব মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণা বাউল মতবাদে নানা পরিবর্তনের ভিতরেও সংলগ্ন হয়ে আছে। আদিম কৃষিজীবী সমাজে কৃষিকর্মের আবিষ্কারক মেয়েরা, তাদের কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্ব-পৃথিবীর রহস্য উন্মোচনের তাগিদে নারী ও পৃথিবীর একাত্মতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অমন একাত্মতার সামাজিক পর্ব মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, যে-সমাজে মেয়েরা প্রধান, বলীয়ান ও প্রবল। রবার্ট ব্রিফল্ট বলছেন :

আরও চার মোকামে চারজন নূরী
ও তারা নিশাদলের ঘরেতে।
আরও সহস্রদল আছে সেইখানে
আছে সুলতান মোকাম আছে তাহাও নীচে
অধীনে সিরাজ কয় শোনরে লালন,
তুই পইড়াছ সেই ঘোর পাকে॥

(মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত হারামণি, ৫ম খণ্ড, গান সংখ্যা : ৪০)

'The matriarchal constitution of the primitive group resolves itself, nevertheless, like all functional adjustments, into economic relations : functional sexual differences leading to social differences must necessarily translates themselves into economic relations. Robert Briffault–The Mothers, p. 1 : 435)

বাউল মতবাদ তাই বিশেষ সমাজের ভাবাকাশ রচনা করেছে মাত্র। কিন্তু যে বিশেষ সমাজে বাউল মতবাদের জন্ম, সে-সমাজের বদল হয়েছে, কিন্তু সে বদল কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি ঘিরেই। তার দরুন আদিম কৃষিজীবী সমাজের ধ্যান-ধারণাগুলো বাউল মতবাদে ঐ ভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশ অসম্পূর্ণ বলে প্রাচীন পর্যায়ের ঐ সব ধ্যান-ধারণার বিলোপও অসম্পূর্ণ। ফলে যে-সামাজিক অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বাউল অনুষ্ঠানাবলীর জন্ম, পরিবর্তিত সমাজে ঐ অনুষ্ঠানাবলী উৎপাদন পদ্ধতির অঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে নানা ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও, বাউল মতবাদের মৌলিক ঝোঁকটি অপরিবর্তিত থেকেছে। ঐ মৌলিক ঝোঁকটি দেহকেন্দ্রিক ; নানা ধর্মের সঙ্গে আপোষ ও নানা ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও ঐ ঝোঁকের শোধন সম্ভব হয়নি। বাউল মতবাদের প্রাক-আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলামের আধ্যাত্মিক চেতনার আপোষ ও সংমিশ্রণ ঘটেছে উন্নত পর্যায়ের বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক সমাজে। তারই ফলে বাউল মতবাদের মৌলিক ঝোঁক দীর্ঘায়িত ধ্যান-ধারণায় ফোলানো-ফাঁপানো হয়ে উঠেছে। সে দীর্ঘায়িত ধ্যান-ধারণায় কখনো দেখা মেলে বৌদ্ধ, হিন্দুও ইসলামের প্রভাব, কখনো বা ঐসব ধর্মদর্শনের লোকও পরিণতিতে আদিম কৃষিজীবী সমাজের প্রভাব। উভয়তঃ এই প্রভাব বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাসে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম পর্যায়ে কি ভাবাকাশ তৈরি করেছে? আদিম কৃষিজীবী সমাজের ধ্যান-ধারণা পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাস অনুষ্ঠানের মধ্যে টিকে থাকে, সেই সঙ্গে উন্নত পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষিজীবী সমাজের ধ্যান-ধারণা অন্তরিত করে লোকজ ব্যাপ্তি পেয়ে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে বাউল মতবাদ কেন্দ্র করে তা-ই ঘটেছে। বাউল মতবাদের আদিম রূপের সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্র, হিন্দুতন্ত্র ও ইসলামের সুফীতত্ত্বের সম্পর্কের বিশ্লেষণই বাউল ধ্যান-ধারণার ইতিহাস।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম তন্ত্রের দিক থেকে বাউল মতবাদের নিকটতম প্রতিবেশী। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চেয়ে তন্ত্র প্রাচীন এবং তন্ত্রের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আদিম কৃষিজীবী সমাজে মিল ও ঘনিষ্ঠতা গভীর ও ব্যাপক। খুব সম্ভব তন্ত্র আদিম কৃষিজীবী সমাজের ধ্যান-ধারণা আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে। বৌদ্ধতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে ঐ ধ্যান-ধারণায় প্রলেপ পড়েছে। শশীভূষণ দাশ গুপ্ত বলছেন :

'Tantrism is neither Buddhist nor Hindu in origin, it seems to be a religious undercurrent, originally independent of any abstruse metaphysical speculation, flowing on from an obscure point of time in religious history of India. With these practices and yogic processes, which characterise Tantrism as a whole, different philosophical, or rather theological systems got closely associated in different times. তিনি আরও বলেছেন : 'Side by side with the commonly known theological

speculations and religious practices, there has been flowing in India an important religious undercurrent of esoteric yogic practices from a pretty old time ; these esoteric practices, when associated with the theological speculations of the Saivas and the Saktas have given rise to Saiva and Sakta Tantrism ; and again, when associated with the speculations of Bengal Vaisnavism, the same esoteric practices have been responsible for the growth of the esoteric Vaisnavite cult, known as the Vaisnava Sahajia movement.

অতএব,

'The real origin of the cult lies more outside Buddhism than inside it.

(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন : পৃ. ৪৫৫-৫৬)

তন্ত্রের উৎস যদি বৌদ্ধধর্মের বাইরে খুঁজতে হয় সে-ক্ষেত্রে ইতিহাসের সমর্থন মেলে। অষ্টম নবম শতকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা গুহ্য সাধনতত্ত্ব, রীতিকরণ ও পূজাচার প্রবল হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সমাজজীবনে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার পদ্ধতিতে তারই নজির। বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা লাভ করা সত্বেও শাসক শ্রেণীর বাইরে পর্বত কান্তারবাসী বিশাল বৌদ্ধ সমাজ ছিল।[১০] সে-সমাজে প্রচলিত ছিল মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবীর অর্চনা। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ঐ কৌম সমাজকে অন্তরিত করার উদ্দেশ্যে ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, যোগিনী, ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবী প্রভৃতিকে মহাযান দেবালয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল। ঐ সবের অর্চনার রীতিকরণ ছিল গুহ্য, রহস্যময়, মন্ত্র, যন্ত্র, ধরণী, বীজ, মণ্ডল কেন্দ্র করে। ঐ সব কিছুই যাদুশক্তিতে বিশ্বাস থেকে উৎসারিত, সবকিছুই আদিম কৃষিজীবী সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আদিম কৃষিজীবী সমাজের মাতৃতান্ত্রিক পর্যায়ের সন্তান উৎপাদন খাদ্য উৎপাদনের রকমফের ছিল। একটির উপর কর্তৃত্ব অন্যটির উপর কর্তৃত্বের নামান্তর। ঐ বীজ, মণ্ডল, ধরণী, মন্ত্র, যন্ত্র, সবই মেয়েলি অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। সমাজবিকাশের বিশেষ পর্যায়ে যে-সব অনুষ্ঠান অর্থনৈতিক চরিত্রের ইঙ্গিতবহ, পরিবর্তিত পর্যায়ে ঐসব অনুষ্ঠান অর্থনৈতিক চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে যে আকার লাভ ও ভূমিকা গ্রহণ করে তারই নজির বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের নানারূপ। বৌদ্ধধর্মের সহজযানে যে সবের একটি ইঙ্গিত বিকীর্ণ। সহজযানীদের মতে বুদ্ধত্ব লাভ সবার আয়ত্তে। ঐ বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহে। কায়াসাধনের পথে তা অর্জন করা সম্ভব। সহজিয়াদের শূন্যতা ও করুণা প্রকৃতি ও পুরুষ কিংবা নারী ও নরের নামান্তর। শূন্যতা ও করুণা মৈথুনযোগে কিংবা নারী ও নরের মৈথুনযোগে মহাসুখের সঞ্চার হয়। ঐ মহাসুখই বোধিচিত্তের পরমানন্দময় অবস্থা। আদিম কৃষিজীবী সমাজে মৈথুন ছিল সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ইঙ্গিতবহ। এ পর্যায়ের ধ্যান-ধারণা বৌদ্ধযুগে উৎপাদন পদ্ধতির বাধাপ্রাপ্ত বিকাশের দরুন যে-ভাবে টিকে গেছে, সহজযানীদের দর্শনের পরিভাষা তারই নজির। নারী ও নর শূন্যতা ও করুণায় রূপান্তরিত। কিন্তু যোগাযোগের মাধ্যম মৈথুনই। বৌদ্ধ চিন্তাধারার উপর এভাবেই আদিম যাদুশক্তি কেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা প্রভাব বিস্তার করেছে। ঐ প্রভাব বৌদ্ধধর্মের অন্য একটি সম্প্রদায় মন্ত্রযানেও বিকীর্ণ। মন্ত্র ও মণ্ডল, ধরণী

১০. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস

ও বীজ যাদুশক্তি কেন্দ্রিক বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। মন্ত্রযানীদের কাছে মন্ত্র মূল প্রেরণা ধরণী ও বীজ সে মন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। এভাবেই বৌদ্ধধর্মে কায়াসাধন ও দেহাশ্রয়ী হঠযোগ প্রবল ও বলীয়ান হয়ে উঠল। বৌদ্ধধর্মের সমান্তরালে বাংলার ব্রাহ্মণ্য শক্তিধর্মে ও অনুরূপ বিবর্তন দেখা দিয়েছিল। ঐ ধর্মে ও মৈথুনযোগের গুহ্য সাধনরীতিই প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠল। ফলে, বৌদ্ধতান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক পন্থার মধ্যে পার্থক্য প্রায় ঘুচে গেল, এবং দুই পন্থার মিলন পালপর্বের শেষ দিকে শুরু হয়ে চতুর্দশ শতকে পরিণতি লাভ করল।

অন্যদিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের মিলনে শক্তি ধর্মের নতুন যে সব রূপান্তর হল কৌলধর্ম তার একটি। কুল বৌদ্ধ গুহ্য সাধন রীতির অঙ্গ। পঞ্চকুল প্রজ্ঞা ও শক্তির পাঁচ রূপ। তাদের নিয়ামক পঞ্চ তথাগত। কুলতত্ত্ব যাঁরা মানেন তাঁরাই কৌলমার্গী। কুল শক্তি, কুলের বিপরীত অকুল। অকুলের অন্য নাম শিব। দেহের মধ্যে যে-শক্তি কুণ্ডলাকারে সুপ্ত, সে-ই কুল-কুণ্ডলিনী। এই কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে শিবের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই কুলপন্থা। বজ্রযানী, সহজযানী, মন্ত্রযানী কিংবা কৌলমার্গীদের নাড়ী, শক্তি, বীজ, ধরণী প্রভৃতি বাউল মতবাদে অপরিহার্য। অন্যপক্ষে মন্ত্রযানী, বজ্রযানী, সহজযানী কিংবা কৌলমার্গীদের ঐসব রীতিকরণ বলীয়ান ধমের পবিধির বাইরের জনপদ গোষ্ঠীর বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত হয়েছে। কায়াসাধন, মন্ত্র, মণ্ডল, ধবণী, বীজ শক্তি এসব তান্ত্রিক প্রথা এবং এসব প্রথায় কৃষি-সমাজের উর্বরতাশক্তি, মাতৃতান্ত্রিক কাঠামো, জগৎসংসার বিচার ও বোঝার ধ্যান-ধারণার প্রভাব পড়েছে। ঐ প্রভাব এসেছে বলীয়ান ধর্মের পরিধির বাইরের জনপদগোষ্ঠীর বিশ্বাস থেকে কিংবা বলীয়ান ধর্মে অন্তরিত জনপদগোষ্ঠীর বিশ্বাসের নানা প্রতীকের সঙ্গে আপোষ অথবা মেনে নেওয়ার পথ ধরে।

কৌলমার্গীরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম আশ্রয়ী ছিলেন। কিন্তু একই গুহ্য সাধনরীতি উদ্ভূত নাথধর্ম বর্ণাশ্রম বিরোধী। নাথপন্থীদের মতে দেহযোগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যোগ। মানুষের দুঃখ-শোকের উৎস অপক্ক দেহ। দেহযোগ হচ্ছে অগ্নি, সে অগ্নিতে দেহ পক্ক করে নিলে সিদ্ধদেহ অথবা দিব্যদেহের অধিকারী হয়ে অমরত্ব লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক শক্তি ধর্মের প্রবল পীড়ন ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে নাথধর্ম ও সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরাজিত নাথ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের নীচের পংক্তিতে স্থান পেল। নাথযোগীদের জাত হল 'যুগী', বৃত্তি নির্ধারিত হল তাঁত বোনা। নামের পদবীতে নাথ শব্দ টিকে থাকল শুধু। মুসলমান যারা হল তাদের সামাজিক মর্যাদা কিংবা পেশারও কোন পরিবর্তন হল না। পূর্ব বাংলার যে-সব অঞ্চলে-বাউল মতবাদ বিস্তৃত, তাদের মধ্যে যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, নরসিংদী উল্লেখযোগ্য। এ সব এলাকার অধিকাংশ মানুষের পেশা তাঁত বোনা। বাউল মতবাদের সঙ্গে তাঁত বোনাব সম্পর্কের ভিতর তাই ইতিহাসের লুপ্ত এক অধ্যায়ের ইতিহাস লুকানো। বাউল মতবাদে ধর্মের বাহ্য আচারানুষ্ঠানের প্রতি যে বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা পবিলক্ষিত হয়, সে মানবতাবাদী ধারাটি এসেছে সমাজযানী, অবধূতী, নাথপন্থী ও সুফীতত্ত্বের পথ ধরে। অন্যপক্ষে বাউল মতবাদের শ্রেণী বিরোধী প্রতিবাদের ধারাটি এসেছে নাথপন্থীবিস্মৃত উত্তরপুরুষদের সামাজিক পদ ও পেশার নির্ধারণ থেকে। তাছাড়া বাউল মতবাদের রীতিকরণ পদ্ধতির উৎসে আছে সহজযান, মন্ত্রযান, কৌলমার্গ ও সুফীতত্ত্বের প্রভাব। অবশ্য এ প্রত্যক্ষ প্রভাবের দূর উৎস ঐ আদিম কৃষিজীবী সমাজই।

যে বাউল মতবাদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন ইঙ্গিতাবলী প্রোথিত, তার উপর ইসলামের প্রভাব এলো সুফীতত্ত্বের পথ বেয়ে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতীক আশ্রয়ী বলে লোকজ সংস্কৃতির নানা রীতিকরণ তাদের মধ্যে অন্তরিত হয়ে গেছে, লোকজ সংস্কৃতির বৈচিত্র্য তাদের আধ্যাত্মিক ভূগোলের পরিধি দিয়েছে বাড়িয়ে। কিন্তু ইসলাম সুস্পষ্টভাবে প্রতীক বিরোধী, তার দরুন ইসলামের লোকজ সংস্কৃতির উপর প্রভাব কিংবা লোকজ সংস্কৃতির প্রভাব ইসলামের ওপর অন্য এক বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। ঐ বৈপরীত্য জীনযাপনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয়। তাই অলব্ধের জন্য দুঃসহ দুঃখ, আল্লাহর সঙ্গে মিলনের উদ্দীপনা পবিত্র দীর্ঘশ্বাসের মতো বাউল গান থেকে ধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু ঐ দুঃখ, ঐ উন্মাদনা দেহ মন্থনজাত, সেজন্য আরো মানবিক, কৃষি মনস্তত্ত্বের নতুন রূপান্তর মাত্র। দেহকে শোধন করার এ লক্ষণে আছে অজানা ও অসীম, অপ্রাপনীয় ও অলব্ধের ইঙ্গিত, সে সঙ্গে আছে কৃষি মনস্তত্ত্বের নতুন রূপান্তরে দেহের স্মৃতিতে পরিবর্তন, যৌন মিলনে আত্ম-নির্যাতনের সংকেত, মৈথুন মদির ও মারাত্মক, দেহ থেকে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ।[১১] সুফীতত্ত্বের অমন প্রভাব বাউল গানে দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে, যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য, যে-দ্বন্দ্বের একপক্ষে আছে দেহের গন্তব্য, প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলন, অন্যপক্ষে কৃষিজীবী সমাজে দেহজ অনুষ্ঠানের তীব্র, প্রখর স্মৃতি কিন্তু সুফীতত্ত্ব কি? সুফীতত্ত্বের কোন্ কোন্ প্রভাব বাংলাদেশে পড়েছে? অধ্যাপক লেভী বলছেন :

> 'In tretaing Suifsm the authoritative manuals generally contain some discussion concerning the elements of the good life as conceived by various schools, but the fact that the basic principle of the system is the reality of God alone led, adopts to frame their own corollaries...since morality in large measure, though not entirely concerns man as a social being, some of the more enligntened of the Sufis insisted that the true saint lives among his fellow-men mades with them, marriee and takes part in social activities without ever

১১. ফকিরি কববি ক্ষ্যাপা কোন বাগে,
আছে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাগে।।
থাকে ভেস্তেব আশায় মমিনগণ
হিন্দুবা দেয় স্বর্গেতে মন
ভেস্ত স্বর্গ ফাটক সমান
কাব বা তা ভালো লাগে।।
অটলপ্রাপ্তি কিসেতে হয
গুরুর কাছে জানগে রে তাই,
টল কি অটল রতি সেই
নেহার করে জান আগে।।
ভাবে ফকিবি সাধন কবে
খোলসা বও হুজুবে,
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভেডে
আত্মতত্ত্ব জান বে আগে।।
(উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, গান সংখ্যা : ৯৫)

forgetting God for a moment. There were those, however, who regarded ascetic seclusion as the means of achieving goodness. Furthermore, in an early stage of the history of Sufism, Koranic teaching concerning predestination developed logically into towakkul 'absolute reliance' upon God, and, therefore, into quietism. (Reuben Levy–The Social Structure of Islam–p–211 : 212)

মতবাদগত দিক থেকে সুফী প্রভাব বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের মতই একল্‌চরেশন হয়েছে। বাউল গানে তার দরুন আল্লা-রসুলের সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের নাম উচ্চারিত, বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রথার সঙ্গে যৌন ও প্রজনন প্রতীকের উল্লেখ। সুফী প্রভাব বাউল মতবাদের চেয়ে বাউলদের জীবনযাপনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সুফীতত্ত্বের ঐ ঝোঁক নীতিবোধ অনেকাংশেই ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল কিংবা এই ঝোঁক সাধুতা অর্জনের প্রকৃষ্ট পথ সংসারের বাইরে অনাসক্ত জীবনযাপন, অথবা ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পণ এবং সে বোধ উৎসারিত ঔদাস্য, এ সবকিছুই বাউলদের জীবনে দুর্নিবার প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের জীবনকে অতীন্দ্রিয় প্রতিশ্রুতিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। বাউল মতবাদের চেয়ে বাউলদের জীবনে সুফীতত্ত্বের অমন প্রচণ্ড অভিঘাত সামাজিক, রাজনৈতিক কারণেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বাউল মতবাদের প্রভাব সমাজের যে অংশে পরিব্যাপ্ত, সেই কৃষিজীবী জনসাধারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে মর্মাহত বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছে বৌদ্ধ কিংবা ব্রাহ্মণ্য যুগে তাদের সামাজিক স্থান যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে। লোকজ-সংস্কৃতি তাদের যে-জীবন বেদ দিয়েছে সেখানে কৃষিজীবী ধ্যান-ধারণাই বিস্তীর্ণ, দেহ যেখানে একই সঙ্গে অস্ত্র ও অনুষ্ঠান সন্তান ও ধন উৎপাদনের, কিন্তু এখন সে ধ্যান-ধারণার সামাজিক পটের দৃশ্যান্তর ঘটেছে, থেকে গেছে দেহের সুপক্ক স্মৃতি, সেই স্মৃতি তাদের জীবন-বেদ, তার উপর প্রভাব পড়েছে বলীয়ান ধর্ম ও সংস্কৃতির, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ তাই তাদের সান্ত্বনা ও ক্ষতিপূরণ। উনিশ শতকের লালন শাহ্ কিংবা দুদ্দু শাহের সে একই উপলব্ধি। মানবিকতাবাদ ধর্ম প্রত্যয়ের মাধ্যমে তাঁদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে, ঐ ধর্ম প্রত্যয়ই সমাজজীবনে বঞ্চনার জন্য সান্ত্বনা যুগিয়েছে, ঐ ধর্মপ্রত্যয়ই ক্ষতিপূরণের শান্তি এনেছে মানবিকতার পথে। বাউল গান তাই কৃষিজীবনের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার গান, অভিজ্ঞ হতে হতে বাউলদের অকস্মাৎ মর্মাহত উপলব্ধি : পরাণ আমার স্রোতের দীয়া। যে-কৃষি অতীতে তাদের উৎস সেখানে তাদের অবস্থান নয়, আর যেখানে তাদের অবস্থান সেখানে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব নেই, লোকজ ধ্যান-ধারণায় তাদের জীবন জড়ানো অথচ ঐ ধ্যান-ধারণা জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারে না, তাই ঐ ধ্যান-ধারণার সঙ্গে অতিন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধ সাধনের মধ্যে দেহতরণী হাল ধবে সংসারে জীবনযাপনের তাদের মুমূর্ষু চেষ্টা।

যতীন সরকার
বাংলাদেশের কবিয়াল

'কবিগান' নামক শিল্প প্রকরণটি পশ্চিমবঙ্গেরই নিজস্ব সম্পদ—এমন ধারণা আজকাল আস্তে আস্তে অপনোদিত হচ্ছে। শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র পালের 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' (১৯৫৮ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত) বইটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের কবি গানের সংকলন হলেও, এতে বাংলাদেশের কিছু কবিয়ালের গানও সংগৃহীত এবং ভূমিকায় এদেশীয় কবিগানের কলাবিধির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচিত। যদিও পাল মহাশয়ের মতেও পশ্চিমবঙ্গই কবিগানের উৎপত্তিস্থল এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবেই বাংলাদেশে কবিগানের বিস্তার বলে তাঁর ধারণা, তবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণামূলক সংকলনগ্রন্থে বাংলাদেশের কবিগানের উল্লেখ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্বের ধারক। এর আগে বাংলাদেশের কবিগানের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়নি। প্রফুল্লচন্দ্র পালের বই প্রকাশের সম-সময়ে প্রকাশিত শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তীর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য' (শকাব্দ ১৮৮০) নামক গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের কবিগান সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত অনুপস্থিত। শ্রী চক্রবর্তী বোধ হয় তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসরণে এ কথা ধরেই নিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে কবিগানের প্রচলনই ছিল না ; থাকলেও তা নিম্নমানের, সাহিত্যের ইতিহাসে নিতান্ত গুরুত্বহীন।

অথচ, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত ও কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে, বিজয় নারায়ণ আচার্য, মনোরঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ গবেষক উপযুক্ত তথ্য সহযোগে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত কবিগানের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেছেন। "ময়মনসিংহের বোরগ্রাম নিবাসী বিখ্যাত কবি নারায়ণ দেবের 'পদ্মপুরাণ' বা 'মনসার ভাসান', রচনার কিছুকাল পূর্ব হইতেই এ-স্থানে কবিগানের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে"—এমন অনুমানের সপক্ষেও অনেক যুক্তি বিজয় নারায়ণ আচার্যের আলোচনায় উত্থাপিত। সে-সব যুক্তি অনুসরণ করলে স্বীকার্য হয়ে পড়ে যে : ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ময়মনসিংহ অঞ্চলে কবিগানের সূচনা। ভাওয়াল-জয়দেবপুর অঞ্চলের কবিগানের ঐতিহ্যও যথেষ্ট প্রাচীন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বান্ধব' পত্রিকায় এক সময়ে এ অঞ্চলের কবিগান সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়।

বরিশাল জেলার, বিশেষ করে ঝালকাঠি মহকুমার কবিগানের ঐতিহ্য খুবই সমৃদ্ধ। কিন্তু সে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সন্ধানেও উপযুক্ত সময়ে কেউই মনোযোগী হননি। তাই শুধু বরিশালের নয়, সমগ্র বাংলাদেশের কবিগানেরই ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অতি সম্প্রতি (১৯৭৭) কলকাতা থেকে শ্রী দীনেশ চন্দ্র সিংহ 'কবিয়াল-কবিগান' নাম দিয়ে ৫১৪ পৃষ্ঠার একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থটিতে আসলে বরিশালের নকুলেশ্বর দত্ত

নামক একজন কবিয়ালের জীবন ও কবিকৃতি মাত্র বর্ণিত। নকুলেশ্বর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন কবিয়ালের সঙ্গে যে-সব 'কবির লড়াই' করেছেন, সে-গুলোর বিস্তৃত বর্ণনা থাকায় এ বইটিতে বিশ শতকের বাংলাদেশের কবিগানের কিছু কিছু তথ্য ধরা পড়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার বাংলাদেশের কবিগানের ইতিহাস অন্বেষার প্রয়াস করেন নি, কিংবা নকুলেশ্বর ছাড়া অন্য কোনো কবিয়ালের প্রতিও মনোযোগ দেননি। তাই এ গ্রন্থটি থেকেও ঊনবিংশ শতাব্দী বা তার আগেকার এ দেশীয় কবিয়ালের কোন পরিচয় সংগ্রহ করা যাবে না। বিংশ শতাব্দীর কবিগান বা কবিয়ালদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও এ গ্রন্থটিতে অনুপস্থিত। নকুলেশ্বর যাঁদের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হননি এমন কবিয়ালদের প্রসঙ্গ এ বইয়ের আলোচনা বহির্ভূত, তাই একালের যুগস্রষ্টা কবিয়াল রমেশ শীল বা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যবাও এখানে অনালোচিত থেকেছেন। তবু শ্রী দীনেশচন্দ্র সিংহ অবশ্যই সমগ্র বাঙলাভাষীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন, কারণ একজন মাত্র কবিয়ালের প্রসঙ্গ সূত্রে হলেও বাংলাদেশের কবিগানে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি এ কালের সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেবেছেন।

বাংলাদেশের কবিগানের পূর্ণাঙ্গ ও ঐতিহাসিক পরিচয়-জ্ঞাপক কোনো গ্রন্থ তো নেই-ই এমনকি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনাতেও এ পর্যন্ত কেউ ব্রতী হননি। তবু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ময়মনসিংহের 'সৌরভ' পত্রিকার লেখকবৃন্দ এবং হরিচরণ আচার্য, বীরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সিরাজউদ্দিন কাশিমপুরী, রাখাল চন্দ্র আচার্য, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন প্রমুখ কবিয়াল, গবেষক বা লোকসাহিত্য রসিকবৃন্দ এ-দেশের কবিগান ও কবিয়ালদের সম্পর্কে যে-সব টুকরো টুকরো আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন, সে-সবের সূত্র ধরে অনুসন্ধান করলে বাংলাদেশের কবিগানের একটা মোটামুটি পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব হতে পারে। সে-উদ্দেশ্যেই বক্ষ্যমান নিবন্ধের অবতারণা।

তবে বাংলাদেশের কবিগানের প্রাচীনত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ উপস্থিত করা আজকের দিনে খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেই ঈশ্বরগুপ্তের মতো একজন কবিগান দরদী কবি, অনুসন্ধানকারী ও সংবাদপত্রসেবীর আবির্ভাবের ফলে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের ইতিহাস যেভাবে সংগৃহীত, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। অথচ পরবর্তী কালের আলোচনায় এদেশের কবিগানের যে-বিশিষ্ট কলারীতির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত, এবং সে-রীতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত কবিগানের যে বিপুল পার্থক্য সুচিহ্নিত, তাতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এদেশের বিভিন্ন জেলায় বহুদিন ধরে স্বাধীনভাবে কবিগানের কলারূপটি বিকশিত হয়ে উঠছিল ; পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালদেরই বাংলাদেশের কবির সরকারদের উত্তমর্ণ মনে করার পিছনে কোনো যুক্তি বা তথ্যের জোর নেই। (বাংলাদেশের 'কবিয়াল' বা 'কবিওয়ালা' শব্দটি পর্যন্ত প্রচলিত ছিল না, কবিয়ালরা এখানে 'সরকার' নামে পরিচিত)।

ঈশ্বরগুপ্ত ও তাঁব উত্তরসূরি গবেষকদের অনুসন্ধানের ফলে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোঁজলা গুই, বংশীবদন সরকার, রঘুনাথ দাস, লালু নন্দলাল, রামজী দাস, রাসু নৃসিংহ প্রমুখ পশ্চিমবঙ্গীয় কবিয়ালের পরিচয় পাই। উপযুক্ত সময়ে গবেষণার অভাবে এঁদের সমসাময়িক বাংলাদেশী কবিদের নাম ধাম পরিচয় সব কিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত এ কথা ঠিক ; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্ত এদেশীয় বৈশিষ্ট্য-

সমন্বিত বিপুল সংখ্যক কবির 'সরকারে'র পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি, তাতে এ অঞ্চলের কবিগানকে কিছুতেই প্রাচীন ঐতিহ্য বঞ্চিত কিংবা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধার করা ঐতিহ্যের ধারক বলে মেনে নেয়া যায় না।

ডক্টর সুশীল কুমার দে ১৭৬০ খ্রীঃ থেকে ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত এক শতাব্দীকালকে কবিগানের সমৃদ্ধির যুগ বলে নির্দেশ করেছেন। অবশ্য তিনি এ কথাও বলেন যে, ১৮৩০ সনের পর থেকেই সব বড়ো বড়ো কবিওয়ালা একের পর এক লোকান্তরিত হতে থাকেন এবং তাঁদের স্বল্পশক্তিমান শিষ্যদের হাতে কবিগান ক্রমে বিলুপ্তির পর্যায়ে চলে যায়। ডক্টর দে'র এ বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্যই সত্য। কিন্তু কবিগানের ক্ষয়ের যুগ বলে তিনি নির্দেশ করেছেন যে-সময়কে, সে সময় (অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যভাগ) থেকেই বাংলাদেশের কবিগানের দেহে যৌবনের জোয়ার বইতে থাকে। ঢাকা, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় এ-সময়ই অনেক বড়ো বড়ো কবিয়ালের অভ্যুদয় ঘটে।

বাংলাদেশে কবিগান যে নতুন জীবন লাভ করে, তাতে ঢাকা জেলার নরসিংদীর হরিচরণ আচার্য ও চট্টগ্রাম জেলার গোমদণ্ডীর রমেশ শীলের অবদান সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশের এই দুই লোককবি ও তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যদের হাতেই কবিগান একটি মুক্ত ধারার প্রবাহ খুঁজে পায়। স্বতন্ত্রভাবে এই দুই মহা প্রতিভার অবদান সম্পর্কে আলোচনার আগে এদেশের বিভিন্ন জেলায় এঁদের পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি কবিয়ালদের সম্পর্কে একটা জরিপ কার্য চালানো আবশ্যক। তাহলেই বাংলাদেশের কবিগানের ইতিহাসের একটা খসড়া রচনা সম্ভব হতে পারে।

দুই

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'কবিগান' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, "বহুদিন ধরিয়া বাংলাদেশে এক রকম গানের সূত্রপাত হয়—তার নাম 'কবিগান' বা 'কবি'। এই গানে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য কোন জাতির মধ্যে এরূপ গান দেখা যায় না।" বিদ্যাভূষণ মহাশয়েব প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রচুর তথ্যবহ। কিন্তু এতেও পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালদের প্রসঙ্গই আলোচিত। কেবল প্রবন্ধটির সমাপ্তি বাক্যটি এ রকম : "ঢাকা জেলায় পাগলা গ্রামে নিমচাঁদ ঠাকুর ছিলেন বিখ্যাত কবিওয়ালা।" ঢাকা বা তৎকালীন পূর্ববাংলার অন্য কোনো কবিয়ালের নামও প্রবন্ধটিতে উল্লেখিত হয়নি, কিম্বা কবিওয়ালা নিমচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কেও এই একটি বাক্যের অধিক কিছু লেখা হয়নি। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিয়ালদের আলোচনা প্রসঙ্গে নামটির উল্লেখ দেখে মনে হয়, তিনিও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেরই কবিয়াল। তাহলে ঢাকা জেলার এ যাবৎ জ্ঞাত কবিয়ালদের মধ্যে নিমচাঁদ ঠাকুরকেই প্রাচীনতম বলে গ্রহণ করতে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কয়েকজন এদেশীয় কবিয়ালের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে হরিচরণ আচার্যের কবিগান সংকলন 'কবির ঝঙ্কার' দ্বিতীয় খণ্ডে বীরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকায়।

ঢাকা জেলার ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় কবিগানের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর একটি কবিগানের দলও ছিল। তাঁর দলে গান রচনা করতেন জয়দেবপুরের

কবিয়াল রামকুমার সরকার। রামকুমার খুব ভালো গাইতে পারতেন না, কিন্তু গান রচনা আর ছড়া কাটায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বহু নামজাদা কবিয়ালকে তিনি কবির লড়াইয়ে পর্যুদস্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কবিয়াল সীতানাথ মুখোপাধ্যায়কে তিনি নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। রামকুমার সরকার রচিত কবিগানের একটি সংকলন ভাওয়াল রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা গেছে, এটিই বাংলাদেশের কবিয়ালের, কবিগানের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। যাত্রার পালায় ব্যবহৃত অনেক গানও রামকুমার রচনা করেছেন এবং সে-সব গানে নিজের নামের পরিবর্তে রাজা কালীনারায়ণের ভণিতা ব্যবহার করেছেন। প্রভু তুষ্টির জন্যে এমনটি এর আগে অনেক বিখ্যাত কবিকেও করতে হয়েছে।

রামকুমারের মতই প্রতিভাবান আরেক কবিয়াল ছিলেন ঢাকার মহেশ্বরদী পরগণার ডৌকাদী গ্রাম নিবাসী হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী বা হরিশ্চন্দ্র মাস্টার। তিনিও খুব ভাল গাইতে পারতেন না বটে কিন্তু সঙ্গীত রচনায় ছিলেন যথেষ্ট কুশলী, সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ছিল ব্যাপক। ঢাকা জেলাতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর এই কবিয়ালের সমসাময়িক আরও অনেক কবিয়াল ছিলেন। যেমন—মহেশ্বরদী পরগণার আল্‌গী গ্রামে ছিলেন পঞ্চানন আচার্য ও কানাই আচার্য, রাজাদীতে ছিলেন গঙ্গাচরণ আচার্য, ভুলতায় ছিলেন নীলমণি চক্রবর্তী। ছড়া কাটায় এঁদের সকলেরই দক্ষতা ছিল। ঢাকা জেলার এঁদেরই কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের কবিয়াল—মহিমচন্দ্র নন্দী দয়াগঞ্জের মনোরঞ্জন ঠাকুর, পারুলীয়ার বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী। মহিমচন্দ্র নন্দী একজন পারদর্শী কবিগান রচয়িতাই ছিলেন না, লোকসাহিত্য সংগ্রহেও তার অনুরাগ ছিল যথেষ্ট, অনেক ভাটিয়ালী গান ও প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ করে তিনি প্রকাশ করেছেন। 'মহেশ্বরদী ঐতিহাসিক প্রবন্ধ'-এ তিনি একজন দবদী ও সূক্ষ্মদর্শী আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধানকারী রূপে তাঁর পরিচয়কে চিহ্নিত করেছেন। বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী আসরে উঠে কখনো কবিগান করেন না। কিন্তু তার রচিত কবিগানগুলো বিভিন্ন কবিগানের দলে আগ্রহের সঙ্গে গাওয়া হতো, নেপথ্যে থেকে তিনি অনেক কবিয়ালের গানের উত্তর প্রত্যুত্তর ও ছড়া রচনা করে দিয়েছেন। 'দ্বিজদাস' ছদ্মনামে তিনি যে-সব তত্ত্ব সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, সেগুলো ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার পল্লীগায়কদের এখনও—বিশ শতকের শেষ পর্যায়েও—অত্যন্ত প্রিয়। 'দ্বিজদাসে'র ভণিতায় রচিত গানগুলোতে একটা সহজ বিদ্রোহ ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার সুর ধ্বনিত। সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁর অধিকার ছিল গভীর ও বিস্তৃত। বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকা জেলার কবিগানের ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন দেবেন্দ্র দাস, মদন শীল, অম্বিকা পাটুনী, জ্ঞানেদ্র পাটুনী, পূর্ণ সরকার, রেবতী ঠাকুর, তারিণী সরকার, প্রমুখ কবিয়াল।

নোয়াখালি জেলার কবিয়াল কালীকুমার মাস্টার ছিলেন একই সঙ্গে উত্তম গায়ক ও সঙ্গীত-রচয়িতা। অনেক কবিগানের দলেই এক সময় তাঁর গান গাওয়া হতো। বিশ শতকের গোড়ার দিকে নোয়াখালিতে পণ্ডিত অক্ষয় আচার্য, রমেশ আচার্য, কাশীনাথ নট্ট প্রমুখ কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে।

উনিশ শতকের কুমিল্লায় (তৎকালীন ত্রিপুরা জেলায়) জয়চন্দ্র মজুমদার, গৌর সরকার, কানাই নাথ, কৃষ্ণধন সরকার, ভগবান সেন, রামচন্দ্র মাস্টার, জগবন্ধু দত্ত প্রমুখ কবিয়ালদের খ্যাতি ছিল। জয়চন্দ্র মজুমদার আর গৌব সরকার কুমিল্লার কবিয়ালদের মধ্যে পথিকৃতের মর্যাদা সম্পন্ন। হরিচরণ আচার্য এঁদের সম্পর্কে একটি ছড়া কেটে বলেছিলেন—

মেঘনার পূর্বপারে
জয়চন্দ্র আর গৌর সরকারে
সরকার হয় আদি।
তারা পেল কবির গবর্ণরী।
এখন দেখি দশে বিশে
সরকার হৈল ঘোড়ায় মৈষে
কোলা বেঙে বলে হেসে লঙ্ঘিবে নদী।

কুমিল্লা জেলায় এঁদের পরবর্তী কবিয়ালদের মধ্যে শচীন্দ্র শীলের নাম উল্লেখ্য।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার তাঁর 'কবিয়াল রমেশ শীল' বইয়ে উনিশ শতকের শেষ দিককার চট্টগ্রামের দু'জন কবিয়ালের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁরা হলেন—চিন্তাহরণ ও মোহন বাঁশী। আঠারশ' সাতানব্বই সনের দিকে কবিয়াল চিন্তাহরণ ছিলেন অতিবৃদ্ধ, আর মোহন বাঁশী তরুণ। চট্টগ্রামে এঁদের পূর্বসূরি কারা ছিলেন তা জানা যায়নি। তবে বোঝা যায়, এ জেলায় কবিগানের একটা স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ছিল। রমেশ শীল যখন প্রথম যৌবনে কবিগানের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন মাত্র, সে-সময়কার আরও যে-তিনজন কবিয়ালের নাম পূর্ণেন্দু দস্তিদার উল্লেখ করেছেন তারা হলেন—দুর্গাচরণ জলদাস, প্রাণকৃষ্ণ জলদাস ও অর্পণা চরণ জলদাস।

খুলনা জেলার রাজেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবিয়াল। তিনি যেমন ছিলেন সুদক্ষ গায়ক, বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর ছিল তেমনই অধিকার। সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রচুর, ছড়া কাটাতেও ছিলেন কুশলী। তিনি খুলনা ছাড়াও যশোর ও ফরিদপুর জেলাব বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান গাইতেন। তাঁর সম-সময়েই খুলনা জেলায় বিধু সরকার, মধু সরকার প্রমুখ কবিয়ালও যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন। এঁদের কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে এ-জেলায় কবিগানের আসরে নামেন চালনার প্রিয়নাথ সরকার, বুড়িগঙ্গার ছোট হরিহর, তেঁতুলবুনিয়ার রসিক সরকার প্রমুখ কবিয়াল। খুলনা জেলার দুর্গাপুর গ্রামের দুই সহোদর হরিহর সরকার ও মনোহর সরকারও ছিলেন প্রখ্যাত কবিয়াল। হরিহর সরকার কোনো কবিগান রচনা করেন নি, তাৎক্ষণিক কবির লড়াইয়ে তিনি ছিলেন বিশেষ কৃতী পুরুষ। টপ্পা ও পাঁচালীতে ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার। ভক্তিরস ও করুণরস সৃষ্টি করে শ্রোতাদের অশ্রুসজল করে তুলতেন তিনি। তাঁরই ভাই মনোহর সরকার ছিলেন হাস্যরস সৃষ্টিতে কুশলী কবিয়াল। তাঁর সঙ্গে বহুবার পাল্লা করেছেন এমন এক কবিয়াল—রাখাল চন্দ্র আচার্য—অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মনোহরের 'শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ ভাল ছিল না।' তবে তিনিও স্বীকার করেছেন যে, মনোহর 'ছড়া কাটায় ভালই ছিলেন' এবং 'আসরে উপস্থিত টপ্পা পাঁচালী বলিতেন।' রাজেন্দ্র সরকাব ছিলেন এঁদেরই ভাগিনেয়। রাখাল চন্দ্র আচার্যের মতে—"এক সময়ে খুলনা, ফরিদপুর জিলায় এত বড় সরকার আর ছিল না। নানারূপ রাগ-রাগিণীতে জ্ঞান, যন্ত্রে অধিকার এবং এত বড় শাস্ত্রজ্ঞানী সরকার বাংলাদেশে খুব কমই ছিল। তিনি স্বরচিত নানারূপ স্থায়ী গানে ও উপস্থিত পাঁচালীতে অদ্বিতীয় এবং পুরাণ, কোরআন, বাইবেল, বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী, ধর্ম-নির্বিশেষে তাঁহার কোন হিংসা ছিল না।" ১৯৫৬ সনের ১৪ই জুন তারিখে লিখিত পত্রে ('হারামণি' সপ্তম খণ্ডের ভূমিকায় মুদ্রিত) শেখ মুহম্মদ ইমানউদ্দীন সাহেবকে আচার্য মহাশয় আরও জানিয়েছেন যে, "বহুবার আমার সঙ্গে

তাঁহার (রাজেন্দ্র সরকারের) পাল্লা হইয়াছে, গত এক বৎসর হয় আমার সঙ্গে দেখা নাই। এই দেশে গান বন্ধ হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগর গ্রামে তিনি এখন বসবাস করেন। তাঁহার রচিত বহু গান আপনাকে দিতে পারিব।"

বরিশাল জেলার ঝালকাঠি ছিল বাংলাদেশের কবিগানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল। কবিয়াল রাখাল চন্দ্র আচার্য বাংলা ১৩৩০ সনে যখন প্রথম কবিগানের জগতে প্রবেশ করেন, তখন ঝালকাঠিতে আটটি কবিগানের দল ছিল। ঝালকাঠিতে কবিগানের অন্যতম দলপতি ছিলেন যামিনী কান্ত নট্ট। কবিগানের দলপতিরা ছিলেন মূলত সংগঠক, তাঁরা দলে বেতনভোগী কবিয়াল ও অন্যান্য গায়ক-গায়িকাদের নিযুক্ত করতেন। বরিশালের কবিগানের দলের গায়িকাদের বলা হতো 'কবিওয়ালী বৈষ্ণবী।' "ইহারা পতিতা অপেক্ষা অনেক সম্মানিতা ছিলেন। কারণ, গান বাজনাই ইহাদের ব্যবসায় ছিল। ইহারা একজনের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী ভাবে কাল যাপন করিতেন।" রাখাল চন্দ্র আচার্য তাঁর সময়কার এ-রকম বহু 'কবিওয়ালী বৈষ্ণবী'র পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—অধরমণি বৈষ্ণবী, ধলা যামিনী, যামিনীর বোন কামিনী, কামিনীর মেয়ে বোঁচা বা সুরধনী, লক্ষ্মী বৈষ্ণবী, কালো যামিনী, ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালী, সরলা, সাহেবগঞ্জের ক্ষীরোদা, মনোমোহিনী বৈষ্ণবী, রাধালক্ষ্মী দেবী, মনোমোহিনীর কন্যা হরিদাসী বৈষ্ণবী, দক্ষবালা, মনোহরা বৈষ্ণবী, শরৎবালা বা শরতী, প্রিয়বালা বা ঢেড়া বোঁচা, হিরণবালা প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকে বেতন-ভোগী সরকার বা কবিয়াল নিযুক্ত করে নিজেই কবিগানের দলনেত্রী হতেন। ঝালকাটির খ্যাতনাম্নী গায়িকা কবিওয়ালী মনোমোহিনী বৈষ্ণবী এমনই একজন কবি দলনেত্রী। মনোমোহিনী একবার 'লেড়ী যাত্রা'র দল সংগঠন করতে গিয়ে বহু টাকা লোকসান দেন, এর পরও মৃত্যুর সময় তিনি প্রায় বিশ হাজার টাকার সম্পত্তি রেখে যান। সে-সম্পত্তির অধিকারিণী হন তাঁরই কন্যা সুকণ্ঠী গায়িকা ও নৃত্যপটীয়সী হরিদাসী। মনোমোহিনীর শিষ্যা রাধালক্ষ্মী বৈষ্ণবী এক সময় মনোমোহিনীর দলে মাসিক একশত টাকা বেতনে গায়িকার চাকুরী করতেন। মৃত্যুকালে তাঁরও সম্পত্তি ছিল প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে এদেশে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দেখা দেয়, কবিগানের দলগুলি তারই শিকারে পরিণত হয় এবং কবিয়াল ও কবিওয়ালী বৈষ্ণবীদের জীবন হয়ে পড়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ বা এর আগেকার বরিশালবাসী কোনো কবিয়ালের খবর জানা যায় না। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে বরিশাল জেলার কবিয়ালদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন কুঞ্জদত্ত, ষষ্ঠী করাতী, শরৎ বৈরাগী উমেশ শীল, হরিনাথ সরকার প্রমুখ।

কুঞ্জলাল দত্তের বাড়ি ছিল বরিশালের নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর গ্রামে। তাঁর ভাই কেশবলাল দত্তও কবিয়াল ছিলেন। কুঞ্জদত্ত অধরমণি বৈষ্ণবীকে নিয়ে কবির দল গড়েছিলেন। কবিয়াল বা সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে খুব বড়ো না হলেও কুঞ্জদত্ত আসরে উঠে বক্তব্য বিষয়কে খুব প্রাঞ্জল রূপে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। ষষ্ঠীচরণ করাতী ছিলেন বানারী পাড়ার নিকটবর্তী আলতা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁরই শিষ্য রাখাল আচার্যের মতে—"তিনি খুব চরিত্রবান ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন স্বভাব কবি ছিলেন। উপস্থিত অনুপ্রাসে ঢাকা জিলার কবিয়াল সম্রাট হরিচরণ আচার্য পর্যন্ত ষষ্ঠী সরকারের প্রশংসা করিতেন।... তিনি ঝালকাঠির কবিগানের দলপতি যামিনীকান্ত নট্ট মহাশয়ের দলে বেতনভোগী হইয়া সরকারী করিতেন।"

ঝালকাঠির শরৎ বৈরাগী পতিত কুলে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু প্রতিভাশালী কবিয়াল রূপে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী এই কবিয়ালের নিজের রচিত কোনো গান নেই, কিন্তু তাৎক্ষণিক কবির লড়াইয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। তিনি যামিনী বৈষ্ণবী ওরফে ধলা যামিনীকে নিয়ে কবির দল গঠন করেন। কবিগান করে শরৎ বৈরাগী প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন। ঝালকাঠি শহরে তিনি তিন চারটি বাড়ি করেছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি নগদ পাঁচ ছয় হাজার টাকা ও দুইশ' ভরি সোনার গহনা রেখে যান।

শরৎ সরকারের শিষ্য চন্দ্রকান্ত দাস বা দিগ্বিজয়ী চন্দ্র সরকারের বাড়ি ছিল বরিশালের উত্তর সাহাবাজপুরে। তাঁকে একজন 'দুর্জয়ী কবির দলের সরকার' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। তিনি কবির দল করতেন লক্ষ্মী বৈষ্ণবীকে নিয়ে। অতি অল্পবয়সে বাংলা ১৩৩৫ সনে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী জীবনকালের মধ্যেই কবিয়াল হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বিখ্যাত করিয়ালরাও তাঁর সঙ্গে কবির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে ভয় পেতেন ; এমন কি হরিচরণ আচার্যের মতো যুগস্রষ্টা কবিয়ালও চন্দ্রকান্ত দাসের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে একবার রীতিমতো ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন। গান রচনাতেও চন্দ্রকান্তের চমৎকার হাত ছিল। ডাক, মালসী, সখী সংবাদ, ভোর গোষ্ঠ প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচুর কবিগান তিনি রচনা করেছিলেন।

উমেশ চন্দ্র শীল নামক বরিশালের আরেক কবিয়াল লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, স্বভাবকবিত্বই ছিল তাঁর সম্বল। তিনি কোকিল কণ্ঠী গায়িকা কালো যামিনীকে নিয়ে দল বেঁধেছিলেন। তাঁর দলের অন্যান্য গায়ক-গায়িকারাও ছিল বিশেষ কুশলী। নৃত্যগীত পটিয়সী ক্ষীরোদা খেমটাওয়ালী, সরলা এবং সাহেবগঞ্জের ক্ষীরোদা নামের আরেক জন গায়িকাও উমেশ শীলের দলে ছিল। উমেশ শীল ও কালো যামিনী কবিগান গেয়ে বহু টাকা রোজগার করেছিলেন। তাঁরা ঝালকাঠিতে দু'তিন খানা বাড়ি, দু'শ ভরি সোনার অলংকার ও চার পাঁচ হাজার টাকা আয়ের তালুকদারী ক্রয় করেছিলেন।

বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকের দিকে কবিয়াল রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন হরিচরণ দাস। তাঁর সমসাময়িক কবিয়াল রাখাল আচার্য লিখেছেন, "হরিচরণ সরকার বেতনভোগী হইয়া বিভিন্ন দলে সরকারী করিতেন। হরিচরণ সরকার ছড়া কাটায় খুব ওস্তাদ ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁহার বহুবার পাল্লা হইয়াছে। আমি, নকুল সরকার ও চন্দ্র সরকার—সকলেই রঙ্গ পাঁচালীতে হরিচরণকে ভয় করিতাম। রুক্ষ্মভাষী হরিচরণ অশ্লীলতায় অদ্বিতীয় ছিলেন।" এ-সময়কারই বরিশালের আরেকজন কবিয়াল বৈষ্ণব সরকার।

নকুলেশ্বর দত্ত নিঃসন্দেহে এ-সময়কাব বরিশাল ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিয়াল। বরিশাল সদর থানার চণ্ডীপুর গ্রামে বাংলা ১৩০১ সনে নকুলেশ্বর দত্তের জন্ম। নকুলেশ্বর তাঁর কবিয়াল জীবন শুরু করেন কুঞ্জদত্তের ছাত্র রূপে। এরপর বাংলা ১৩২১ সনে হরিচরণ আচার্যের দলে যোগ দেন। হরিচরণের সান্নিধ্যে নকুলেশ্বরের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অবারিত হয়ে পড়ে। কবিত্বশক্তির সঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞানের সমন্বয়ে তিনি একজন বিশিষ্ট কবিয়াল। তাল মান রাগিণীতে তাঁর যেমন অধিকার, তেমনই সমান অধিকার তাৎক্ষণিক কবিতা রচনায় ও সুনিপুণ বিতর্কে। তাঁর স্বরচিত গানের সংখ্যাও অনেক। তাঁর টপ্পা ও

পাঁচালী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। তাঁর কবি-প্রতিভাকে তিনি স্বদেশ প্রেমের বাহন রূপে গ্রহণ করেছিলেন বলেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবিগানে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর কবিগানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয় এবং সে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ১৩৩৫ সাল পর্যন্ত। এই পাঁচ বছর তিনি কবিগান ছেড়ে যাত্রার দলে যোগ দেন। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে তিনি আবার কবিগানের জগতে ফিরে আসেন। তিনি ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, বরিশাল, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর ও খুলনা জেলায় বহু আসরে বাংলাদেশের বহু কবিয়ালের সঙ্গে কবিগান করেছেন। ভারতবিভাগের পর ১৯৫০ সনে তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যান। ১৯৭৭ সনে প্রকাশিত 'কবিয়াল কবিগান' পুস্তকে শ্রীদীনেশ চন্দ্র সিংহ জানিয়েছেন যে,—নকুলেশ্বর এখনও পশ্চিমবাংলায় কবিগান করছেন ; বাংলাদেশ ত্যাগী যে-সাতজন কবিয়াল বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় বাংলাদেশী পদ্ধতিতে সদলে গান গাইছেন, তাঁরা হলেন—নিশি, বিজয়, মনোরঞ্জন, অমূল্য, রসিক, সুরেন সরকার এবং নকুলেশ্বর স্বয়ং।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যশোর জেলার বিশিষ্ট কবিয়াল ছিলেন জয়পুরের তারকচন্দ্র সরকার। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এ-জেলার ডুমদী নিবাসী বিজয়কৃষ্ণ অধিকারীও কবিগানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাবাহী ময়মনসিংহ জেলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিয়াল হিসেবে সক্রিয় ছিলেন আমতলার লোচন কর্মকার, চাইর গাতিয়ার হারাইল বিশ্বাস, তারাচাপুরের চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, ও দগদগার কানাইনাথ ও বলাইনাথ, ঘাটাইলের হরেকৃষ্ণ নাথ, সত্রশিরের ছাড়ুনাথ, কাশীপুরের লোকনাথ চক্রবর্তী ও শক্তিরাম কপালি। এঁদেরই অব্যবহিত পরবর্তী তিন বিখ্যাত কবিয়াল—রামু মালী, রামগতি শীল ও রামকানাই নাথ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ময়মনসিংহের কবিগানের আসরে অবতীর্ণ হন শম্ভু জেলে, কালীচরণ দে, পরাণ কর্মকার, রামদয়াল নাথ, হরচন্দ্র আচার্য, গোবিন্দ আচার্য, কৃষ্ণ মোহন মালী , কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ কবিয়াল। বিশ শতকের প্রথম দু'তিন দশকে সমগ্র ময়মনসিংহ জেলাকে মাতিয়ে রাখেন যে সব কবিয়াল, তাঁরা হলেন—বেতাটি গ্রামে কালীকুমার ধর, হাপানিয়ার সাধু শেখ, গোবিন্দপুরের ঈশান দত্ত, সিংহের বাংলা গ্রামের বিজয় নারায়ণ আচার্য, বিরুনিয়ার হরিহরআচার্য, ভাট গাঁয়ের ঈশান নাথ ও বাওউডহবের লাল মামুদ। এঁদের পরবর্তী কালের কবিয়াল ঝাওলা গ্রামের মধুশেখ, সিংহের বাংলার মদন আচার্য (কবিয়াল বিজয়নারায়ণ আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র) ত্রিমোহিনীর ক্ষেত্রমোহন শীল, ইছাপুর বোয়ালির কালীকুমার দাস, সাকুয়াইর উপেন্দ্র সরকার, হালুয়াঘাট থানার পলাশকান্দার ইন্দ্রমোহন সরকার, সূর্যমোহন সরকার, কোতুয়ালী থানার উমেদ আলী, নারায়ণ পট্টির চান কিশোর সূত্রধর প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কবিয়াল মধুশেখ ও মদন আচার্য এখনও (১৯৭৮) জীবিত। কিন্তু মধু এখন অতিবৃদ্ধ, পীড়িত ও চলৎশক্তিরহিত। ময়মনসিংহে এখনও কবিগানের শিখাটিকে জ্বালিয়ে রেখেছেন মদন আচার্য, আবুল, আলী হোসেন ও ব্রজেন্দ্র সরকার—এই কয়েকজন কবিয়াল।

ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রামু মালীর জন্ম কিশোরগঞ্জ মহকুমার আউটপাড়া গ্রামে. বাংলা ১২৪৭ সালে, আর মৃত্যু ১৩২০ সালের ৩০শে ফাল্গুন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। তাঁর

গ্রামে একজন পণ্ডিত ছিলেন, নাম—অমর ভট্টাচার্য। তিনি শুধু শাস্ত্রজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন সঙ্গীত রসিকও। তাঁর স্নেহদৃষ্টি লাভ করে রামু মালী অক্ষরজ্ঞানশূন্য হয়েও শাস্ত্রজ্ঞানে পরিমার্জিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরই বয়োকনিষ্ঠ কবিয়াল বিজয় নারায়ণ আচার্য লিখেছেন—'রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রামু কেবল গুরুমুখে শুনিয়া শুনিয়া তাহা শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। তিনি একবার যাহা শুনিতেন, আর ভুলিতেন না। রামুর স্মরণশক্তি সংসার ছাড়া ছিল। গ্রন্থাদি বুঝিবার শক্তিও তাঁহার অত্যন্ত অধিক ছিল। কেহ কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে, রামু শ্রবণ মাত্রই তাহা গ্রহণে সমর্থ হইতেন। এমন কি সহজ সহজ সংস্কৃত শ্লোকাদির তাৎপর্যার্থ নিজে নিজেই বুঝিতে পারিতেন।"

রামগতি শীল ছিলেন রামুরই সমবয়সী। রামু–রামগতির কবির লড়াই হতো খুবই উপভোগ্য। রামগতি শীলকে চন্দ্রকুমার দে 'ময়মনসিংহের দাশুরায়' আখ্যা দিয়েছিলেন ছড়া–পাঁচালীতে রামুর কুশলতা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু টপ্পাতে রামগতি ছিলেন অদ্বিতীয়।

রামু–রামগতিব সঙ্গে বহুবার পাল্লা দিয়েছেন কবিয়াল বিজয় নারায়ণ আচার্য। তাঁর জন্ম বাংলা ১২৭৫ সালের ২৭শে মাঘ (ইং ১৮৬৮ ফেব্রুয়ারি) নেত্রকোনা মহকুমার সহিলপুর গ্রামে। তিনি ছাত্রবৃদ্ধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মোক্তারী পাস করেন। মোক্তার হিসেবে নয়, একজন শিক্ষিত কবিয়াল হিসেবেই তাঁর পরিচিতি ছিল সর্বাধিক। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন কুশলী সঙ্গীত রচয়িতা ও তাৎক্ষণিক লড়াইয়ে দক্ষ কবিয়াল। গদ্য লেখক রূপেও তাঁর কুশলতা ছিল চমকপ্রদ। একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাধু গদ্যরীতি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। সেই চমৎকাব গদ্যে লিখিত তাঁর বহু প্রবন্ধ ময়মনসিংহের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিজয় নারায়ণ আচার্য–লিখিত প্রবন্ধাবলীই ময়মনসিংহের কবিগান সম্পর্কিত তথ্যাবলীর সর্বপ্রধান উৎস। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার কবিয়ালদের সম্পর্কে এমন বিস্তৃত আলোচনা কেউ করেননি। বিজয় নারায়ণের জীবনাবসান ঘটে বাংলা ১৩৩৪ সালের ১৫ আশ্বিন (ইং ১৯২৭)।

বরিশাল জেলার মতো ময়মনসিংহে কবিয়ালী বৈষ্ণবী ছিল না, কিংবা কবিগানের দলে কোনো গায়িকা গান গাইতেন বলেও শোনা যায় না। তবে ময়মনসিংহে কবিগানের পৃষ্ঠপোষক অনেক ভূস্বামী ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নেত্রকোনা মহকুমার চন্দনকান্দী গ্রামের তালুকদার সূর্যকান্ত চৌধুরী। সূর্যকান্ত নিজেও বহু কবিগান রচনা করেছেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় রামু, রামগতি এবং অন্ধ কবিয়াল তারাচাঁদ তাঁদের প্রতিভা বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ পান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে যে পরিবর্তিত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের উদ্ভব ঘটে, তাতে কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো গোষ্ঠীগুলোর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ময়মনসিংহের কবিগানের ধারাও ক্ষীণস্রোতা হয়ে পড়ে।

সিলেট জেলায় মূলত ময়মনসিংহের কবিয়ালরাই কবির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো। বিজয় নারায়ণ আচার্যের দু'জন শিষ্য—হরিশ্চন্দ্র মাঝি ও অধর আচার্য—বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশকে সিলেটের খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। এ সময়েই জেলার সুবল ভট্ট নামক এক কবিয়ালের সঙ্গে নকুলেশ্বর গান করেছিলেন।

আজকের টাঙ্গাইল জেলা এক সময় ময়মনসিংহেরই একটা মহকুমা ছিল। ময়মনসিংহের কবিয়ালদের সম্পর্কে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে 'সৌরভ'-এর পাতায় যে-আলোচনা প্রকাশিত হয়, তাতে টাঙ্গাইলের কোনো কবিয়ালদের আলোচনা হয়নি। বরং বিজয় নারায়ণ আচার্য জানিয়েছেন যে : ময়মনসিংহ জেলার কবিয়ালদের প্রায় সবাই পূর্ব ময়মনসিংহের বাসিন্দা, কেবল বিরুনিয়ার হরিহর আচার্য ছাড়া পশ্চিম ময়মনসিংহে সে-সময়ে আর কোনো কবিয়াল ছিলেন না। তবে বিজয় নারায়ণ প্রমুখ বিশিষ্ট কবিয়ালদের মৃত্যুর পর পূর্ব ময়মনসিংহে যখন ভাটার যুগ এসে যায়, তখন কিন্তু টাঙ্গাইলে কবিগানের ক্ষেত্রে বেশ সমৃদ্ধির সূচনা হয়। টাঙ্গাইলের প্রবীণ কবিয়াল শের আলী এখনও (১৯৭৮) জীবিত। তাঁর বাড়ি মীর্জাপুরের নিকটবর্তী দেওহাটা গ্রামে। তিনি বর্তমান শতকের তৃতীয় কি চতুর্থ দশকে কবিগানের আসরে অবতীর্ণ হন। তাঁর অনেক শিষ্য। তাঁর একজন প্রতিভাবান শিষ্য শান্তিরঞ্জন সেন (নাগরপুর থানার পানান গ্রামের বাসিন্দা) মাত্র ৩২ বছর বয়সে ১৩৭৩ সনের দিকে মারা যান। শান্তিরঞ্জনের শিষ্য ননীগোপাল দে (টাঙ্গাইল শহরের নিকটবর্তী দাইন্যা গ্রামের অধিবাসী) বর্তমানে টাঙ্গাইলের একজন বিশিষ্ট কবিয়াল। টাঙ্গাইলের পাশেই ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমা। মানিকগঞ্জের কবিয়ালদের মধ্যে অমূল্যশীল ও অভয়শীলের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা টাঙ্গাইলের কবিয়ালদের সঙ্গে মিলে মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও জামালপুরের কিছু এলাকায় কবিগান করে থাকেন। ননীগোপাল দে, সুবল চন্দ্র সরকার (বিন্নাফৈর গ্রামের), আবদুল শাহ্ ফকির (বাঘুটিয়া গ্রামের), বঙ্কুবিহারী বসাক (ঘারিন্দা গ্রামের), রওশন আলী (ঘুনিশালঙ্কা গ্রামের), হজরত আলী (বাঘুটিয়া গ্রামের) প্রমুখ কবিয়াল টাঙ্গাইল জেলার কবিগানের ক্ষেত্রে বর্তমানে সক্রিয়। বেথুর গ্রামের সুধন্য সরকার কয়েক বছর আগে মারা যান। টাঙ্গাইলে এখন অত্যন্ত জমজমাট তিনটি কবির দল আছে, এগুলো হলো—সুবলের দল, রওশন আলীর দল ও আবদুল শাহ্ ফকিরের দল। কবিগানের ক্ষেত্রে যদিও কোনো নতুন মাত্রা এঁরা সংযোজন করতে পারেন নি, এবং খুবই সংকীর্ণ পরিসরে এদের বিচরণ সীমিত, তবু টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জের কবিয়ালরা তাঁদের এলাকার যে প্রাচীন কবিগানের বিলীয়মান শিখাটিকে আজও জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছেন,—এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

উনিশ শতকের ফরিদপুর জেলার কবিয়ালদের বিবরণ কেউ সংগ্রহ করেছিলেন কিনা জানা যায় নি। কিন্তু নানা সূত্রে এ জেলায় বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকের দিকে কবিগানের আসরে বিচরণশীল অনেক কবিয়ালের নাম পাওয়া যায়। এ থেকে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে, এর অনেক আগে থেকেই ফরিদপুর জেলায় কবিগানের চর্চা হয়ে আসছিল। কবি জসীমউদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর ছেলেবেলায় তিনি ফরিদপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে অনেক কবিগান শুনেছেন। কিন্তু 'পল্লীকবি' নামে পরিচিত ও লোকজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এই কবিও তাঁর জেলার কবিগান ও কবিয়ালদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কোনো তাগিদ অনুভব করেন নি। দীনেশ চন্দ্র সিংহের পুস্তক থেকে জানা যায় যে, বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশকে কবিয়াল নকুলেশ্বর ফরিদপুরের অনেক কবিয়ালের সঙ্গে কাব্যদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ওলাপুরের হরিহর সরকার ও মনোহর সরকার। এ-ছাড়া নকুলেশ্বর ফরিদপুর জেলার আরও কবিয়ালের সঙ্গে গান করেন, তাঁরা হলেন—নিজড়ার ছোট রজনী, বড় রজনী, মহিম বিশ্বাস, ঘাগড়ের শশী সরকার, গোহালার শ্রীনারায়ণ বালা (সরকার), ভৈরবনগরের নিশিকান্ত

সরকার এবং বাট্‌কামারীর অম্বিকা সরকার। সম্প্রতি (জুলাই, ১৯৭৮) ফরিদপুর জেলা বোর্ডের মাসিকপত্র 'গণমন'-এ খলিলুল্লাহ্ দিল-দারাজ মেঘু বয়াতী নামক একজন জারীগানের বয়াতীর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মেঘু বয়াতীর জন্ম বাংলা ১৩০৭ সনে ফরিদপুর শহর থেকে পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্বে মোমিন খাঁর হাটের নিকটবর্তী গোয়ালার টিলা নামক গ্রামে। ইংরেজী ১৯৭৮ সনের ২৮শে জানুয়ারী শনিবার মেঘু বয়াতীর মৃত্যু হয়। খলিলুল্লাহ দিল-দারাজ জানিয়েছেন যে, মেঘু বয়াতী মূলত জারী গায়ক হলেও 'কবিয়াল' হিসেবেও তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তিনি কবিগান শুরু করেন বাংলা ১৩৩০ সালের দিকে। মঞ্চে প্রথম পাল্লা দিয়ে কবিগান শুরু করেছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল যাদব গুহের সঙ্গে। যদিও মেঘু বয়াতী বয়সে তরুণ ও কবিয়াল হিসেবে নতুন ছিলেন, তবুও যাদব গুহের সাথে ঠাঁই রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

পাবনা জেলার কবিগান প্রসঙ্গে ১৯৬৩ সনে 'হারামণি' ৭ম খণ্ডের ভূমিকার অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন লিখেন,—'প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমরা পাবনা জেলার গোবিন্দপুর এবং মোল্লাকান্দী (থানা সুজানগর) নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র ভাদুড়ী, মধুমোল্লা প্রমুখ কবিয়ালকে দেখিয়াছি।' এই কবিয়ালদের, কিংবা পাবনা জেলায় এঁদের পূর্ববর্তী কবিয়ালদের, সম্পর্কে অন্যকোনো তথ্য মনসুরউদ্দীন সাহেবও উদ্ধার করতে পারেন নি। তবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের দিকে যেখানে কবিয়ালদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেখানে যে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কবিগানের প্রচলন ছিল,—এ রকম অনুমান অবশ্যই অসঙ্গত নয়।

হরিচরণ আচার্যের কবিগান সংকলন 'কবির ঝংকার' ২য় খণ্ডের ভূমিকায় বীরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় নাটোরের কয়েকজন কবিয়ালের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁরা হলেন—যুগল, চণ্ডী, গোপাল, মিঞাজান, কাঞ্চন ও কমল। এক মিঞাজান ছাড়া নাম দেখে আর সবাইকে হিন্দু বলেই মনে হয়। কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় জানিয়েছেন, এঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান। এঁরা ঊনিশ শতকের শেষ ও ত্রিশ শতকের প্রথম দিকের কবিয়াল। এ-সময়কার আবেকজন বিখ্যাত মুসলমান কবিয়াল গোয়ালন্দের ইসমাইল। এই কবিয়ালদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে গিয়ে বীরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "সমাজের সংকীর্ণতা তাঁহাদের প্রাণে স্থান পায় নাই, সত্যের পুণ্যালোকে তাঁহাদের প্রাণ উদ্ভাসিত ছিল।"

আসলে লোকসংস্কৃতির কোনো শাখাতেই সাম্প্রদায়িক ধর্মের অনুদারতার কোনো স্থান নেই। লোক সমাজের মুখপাত্রগণ বরং সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার প্রতিবাদী রূপে দাঁড়িয়ে কায়েমী স্বার্থকে প্রতিরোধ করতেই প্রয়াসী হন। বাউলগানে এই প্রতিবাদী চেতনা ও প্রতিরোধ প্রয়াস সবচেয়ে তীব্র, এরপরই কবিগানের স্থান। বৈষ্ণব পদাবলী যেমন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিদের অবদানে সমৃদ্ধ, কবিগানও তেমনই। শুধু নাটোর আর গোয়ালন্দেই নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও বহু নামজাদা মুসলিম কবিয়ালের সন্ধান পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের লাল মামুদ, সাধু শেখ, মধু শেখ, আবুল ও আলী হোসেন, টাঙ্গাইলের শের আলী, রওশন আলী ও আবদুল শাহ্ ফকির, ফরিদপুরের মেঘু বয়াতী, পাবনার মধুমোল্লা এবং চট্টগ্রামের রমেশ শীলের অনেক মুসলমান শিষ্য-প্রশিষ্য বাংলাদেশের কবিগানের দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন।

তিন

বাংলা ১৩৩৬ সালে বীরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ রূপে বলিতে পারি যে পূর্ব কবিকণ্ঠহারের মধ্যে যেমন রাম বসুই ছিলেন মধ্যমণি সেইরূপ বর্তমান যুগের কবিয়ালদের মধ্যে আমরা শ্রীহরিচরণ আচার্যকেই নির্দেশ করিতে পারি।"

রামবসু ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কবিয়াল। কলকাতা মহানগরীতে তাঁর অভ্যুদয় হওয়ায় সারা বাংলাতেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু রাজধানী থেকে অনেক দূরে যাঁদের বিচরণক্ষেত্র, যতো প্রচণ্ড প্রতিভারই অধিকারী তাঁরা হোন না কেন, নগরবাসী সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণে তাঁরা খুব কমই সমর্থ হন, ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ হয় না, কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের বেলাতেও প্রায় অনুরূপ ব্যাপারই সংঘটিত। ১২৬১ সনের ১লা আশ্বিন 'প্রভাকর' পত্রিকায় রাম বসু সম্পর্কে লেখা হয়—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রামবসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্ম মধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রকের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রামবসুর গীত।" অষ্টাদশ শতাব্দীর এই নাগরিক কবিয়ালের উত্তরাধিকার বহন করেছেন যাঁরা, এমন অনেক পশ্চিমবঙ্গীয় কবিয়ালের নামই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু রামবসুর পর যিনি কবিগানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন, সেই হরিচরণ আচার্য সম্পর্কে ইতিহাসকাররা নীরব। একেবারে সাম্প্রতিক কালে অবশ্যি তাঁর সম্পর্কে কিছুটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা অভিজাত সাহিত্য ও ভাবধারার পাশাপাশি যে লৌকিক সাহিত্য ও ভাবধারাও বিকশিত ও বিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল এবং লৌকিক সমাজেও যে প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের ফলে সামাজিক ভাব-পরিমণ্ডলে অলক্ষ্যে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাচ্ছিল, অর্থাৎ লৌকিক চিন্তাজগৎ ও তার প্রকাশশৈলীও যে অনড় অচল হয়ে থাকেনি,—এ-সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা খুবই কম। তা না হলে আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করতাম : যে ১৮৬১ সনটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষ, সে-সনটিই বাংলার গ্রামীণ সাহিত্য জগতে 'কবিগুণাকর' নামে পরিচিত হরিচরণ আচার্যেরও জন্মবর্ষ। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ উৎকর্ষ-মণ্ডিল সাহিত্যধারায় স্নাত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি বাংলার নিরক্ষর জনসাধারণ কিন্তু তাদের স্বাভাবিক কাব্য-পিপাসা সহজ চরিতার্থতার পথ খুঁজে পেয়েছে হরিচরণ আচার্যের কবি-সঙ্গীতে।

হরিচরণ আচার্যের জন্ম ঢাকা জেলার নরসিংদিতে। ঢাকার ভাওয়াল জয়দেবপুরের কবিগানের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে তিনি অনেক দূর অগ্রসর করে দেন এবং কবিগানকে প্রকরণে ও বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধতর করে তোলেন। বাংলা ১৩৩৭ সনে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, "হরিচরণ আচার্য কবিগানের বর্তমান রূপ দান করিয়াছেন। পূর্ববর্তী কবিওয়ালাগণের রচনায় বিবিধ রসের সমাবেশ দেখা যায়। কবিত্ব মাধুর্যে তাঁহাদের রচনা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কিন্তু হরিচরণ বিবিধ স্তরের সমাবেশ এবং নিজের দলের সুগায়ক

গায়িকাগণের দ্বারা দেশময় এক আনন্দ-প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত নবপ্রথায় কবিগান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।”

হরিচরণের আগে বাংলাদেশের কবিগান ছিল নিতান্ত স্থানীয় চরিত্রের বিশেষ বিশেষ এলাকাকে কেন্দ্র করে শিষ্য-প্রশিষ্য নিয়ে কয়েকজন কবিয়াল আসর জাঁকিয়ে বসতেন, নিজেদের এলাকার বাইরের কোনো কবিয়ালের তেমন কোনো খোঁজ তাঁরা রাখতেন না, অন্য এলাকার কবিয়ালদের নিকটও তাঁদের কোনো খবর সাধারণত পৌঁছিত না। হরিচরণ আচার্য এ-অবস্থার অবসান ঘটালেন। সারা বাংলাদেশে তিনি নিজেকে পরিচিত করে তুললেন, বাংলাদেশের সকল এলাকার কবিয়ালদের সঙ্গে তিনি শুধু যোগাযোগ করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁদের কৃতিকে গ্রন্থবন্ধ করতে যত্নবান হলেন। ১৩৩৭ সনে প্রকাশিত তাঁর ‘বঙ্গের কবির লড়াই’ বইটি তৎকালীন পূর্ববাংলার বিভিন্ন আসরের কবির লড়াইয়ের তথ্যপূর্ণ বিবরণ সমৃদ্ধ। যদিও বইটি খুব সুলিখিত নয়, বিভিন্ন স্থানের কবিগানের লড়াইয়ের সন তারিখও এতে সন্নিবেশিত হয়নি কিংবা কবিয়ালদের সুস্পষ্ট পরিচিতিও উদ্‌ঘাটিত হয়নি, তবু বাংলাদেশের কবিগান ও কবিয়ালদের সম্পর্কে যে-সমস্ত তথ্য এ-বইটিতে পাওয়া যায়, তার গুরুত্ব মোটেই কম নয়।

সারা বাংলাদেশে হরিচরণেব পরিচিতি বিস্তৃত হয় তাঁর স্বরচিত কবিগানের সংকলন ‘কবির ঝংকার’ দুই খণ্ডের মাধ্যমে। হরিচরণের নিজগ্রাম নরসিংদীর নিকটবর্তী ব্রাহ্মণদী গ্রামের সম্ভ্রান্ত ‘মৌলিক’ পরিবারটি ছিল তাঁর বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক। এই পরিবারের আনন্দ কিশোর মৌলিক মহাশয়ের স্নেহধন্য ছিলেন কবিয়াল হরিচরণ আচার্য। আনন্দ কিশোরের পুত্র কামিনী কিশোরও তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। কামিনী কিশোরের পুত্র ডাক্তার জিতেন্দ্র কিশোর মৌলিক হরিচরণের ‘কবির ঝংকার’ প্রকাশ করেন বাংলা ১৩৩৬ সনে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় বীরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাদেশের অনেক কবিয়ালের প্রসঙ্গ উত্থাপনের পর লিখেছেন,—

“হরিচরণ আচার্যের গানে বঙ্গদেশ মুগ্ধ, ছড়ার বাক্‌চাতুর্যে ও গানের উত্তর-প্রত্যুত্তরের কৌশলে লোক চমৎকৃত ; তাঁহার ভগবৎ প্রেমে লোক শ্রদ্ধান্বিত এবং প্রাণের উদারতায় সকলে আকৃষ্ট। তিনি কবিগানকে নবরূপ দান করিয়াছেন। সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া তিনি গানের পশরা লইয়া বঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দ যোগাইয়াছেন। তাঁহার রসের পশরা হইতেও কৌতুক যৌতুক দেশবাসী পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাইয়াছে ; সামাজিক ও দেশাত্মবোধক গান তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গদেশ কম পায় নাই। হাসির ও ব্যঙ্গ কবিতাও তাঁহার যথেষ্ট আছে। এই উন্নতির যুগেও বঙ্গ-সাহিত্য এ-বিষয়ে অতি দরিদ্র। বাঙালী হাসিবে কি ! সহস্র বৎসরের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালীর প্রাণের হাসির উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া যাহারা অন্যের পাদুকা মাথায় বহিতেছে তাহারা হাসিবে কোথা হইতে? কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য তাঁহার বহুবিধ ব্যঙ্গ ও হাসির গানে এই অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া দেশবাসীকে কত হাসাইয়াছেন, ছড়া কাটিয়া মাল ফুকার করিয়া মুগ্ধ ও পুলকিত করিয়াছেন।”

শুধু হাস্য ও ব্যঙ্গ রসের গানই নয়, লোকসমাজের মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই লোককবি সকল রসের সঙ্গীতই রচনা করেছেন। তাঁর বিবিধ বিষয়ক গানগুলো 'অমিয়া লহরী' নামে সংকলিত হয়েছিল। যদিও তিনি সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন করতেন ও আধ্যাত্মিক পথের অনুসারী ছিলেন, তবু অন্য সব লৌকিক কবিদের মতোই তিনিও লোক জীবনের প্রাত্যহিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখদৈন্যের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন নি। তাঁর বহু গানে সামাজিক অসঙ্গতির সুনিপুণ প্রকাশ ঘটেছে। কবিগানে পরাধীনতার বিরুদ্ধে যে-চেতনার সঞ্চার তিনি করেন, সে-চেতনাকে সম্প্রসারিত করার দরুনই তাঁর শিষ্য নকুলেশ্বর দত্ত শাসকশক্তির হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।

চার

হরিচরণ আচার্য বাংলাদেশের কবিগানকে স্থূলতা ও কূপমণ্ডুকতা মুক্ত করে তাতে সূক্ষ্মতা ও উদারতার সঞ্চার ঘটান। আর কবিগানকে যথার্থ আধুনিকতায় মণ্ডিত করে তাতে আন্তর্জাতিক চেতনার হাওয়া বইয়ে দেন কবিয়াল রমেশ শীল। রমেশ শীলের জন্ম বাংলা ১২৮৪ সালের ২৬শে বৈশাখ (১৮৭৭ খ্রীঃ) চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালি থানার গোমদণ্ডী গ্রামে। স্বভাব কবির প্রতিভা নিয়ে তাঁর জন্ম, অনুশীলনের ফলে সে স্বভাবকবিত্ব স্পর্শ করে সমুন্নতিকে। লোকসমাজের স্বাভাবিক আবহের মধ্যে তাঁর কবি মানস গঠিত। বাংলার অন্য সব লোককবির মতো তিনিও অসাম্প্রদায়িক লোকায়ত ধর্মে ও প্রবাহে আজন্ম স্নাত। হিন্দু পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ পুরাণের অনুসঙ্গও রমেশ-মানসকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। যৌবনে মাইজ ভাণ্ডারের অভিনব সাধন ধারার সংস্পর্শে এসে ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি যেমন পরিচিত হন, তেমনি অন্তরে সংশ্লিষ্ট করে নেন হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার লৌকিক ধারাকে। কিন্তু শুধু এটুকুর মধ্যেই রমেশ শীলের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত নয়। লৌকিক ঐতিহ্যের সদর্থক উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি যখন যুগ চেতনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেন ও কবিগানের ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিকে গণচৈতন্যের এক নতুন মাত্রা যোগ করে দেন, তখনই বাংলা কবিগানের প্রসঙ্গ ও প্রকরণে ঘটে যায় এক বিপ্লব, রমেশ শীল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এক যুগস্রষ্টা কবিয়াল রূপে। এতোদিন পর্যন্ত কবিগানের মুখ্য উপজীব্য ছিল পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্র ; রমেশ শীল সে কবিগানে নিয়ে আসেন সমকালীন জীবন, সমাজ ও রাজনীতি। রাম-রাবণ, রাধা-কৃষ্ণ, ছন্দক—বুদ্ধদেব, এজিদ—হোসেন কিংবা নারী—পুরুষ, সত্য—মিথ্যার পৌরাণিক আবহ মণ্ডিত কবি-বিতর্ক ছাড়িয়ে রমেশ শীল প্রবর্তন করেন জার্মান—ইংরেজ, জোতদার—কৃষক, মহাজন—খাতক কিংবা ধনতন্ত্র—সমাজতন্ত্রের মতো জীবন্ত বিষয় নিয়ে কবির লড়াই।

একুশ বছর বয়সে নিতান্ত আকস্মিক ভাবে কবির লড়াইয়ে নেমে পড়েন তিনি তৎকালীন চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠিত কবিয়াল মোহন বাঁশীর সঙ্গে। তরুণ মোহন বাঁশী আর বৃদ্ধ চিন্তাহরণের কবিগান চলার সময় অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন চিন্তাহরণ। তখন বন্ধুদের উৎসাহে রমেশ শীল আসরে উঠে দাড়ালেও মোহন বাঁশীর তুলনায় অনেক দুর্বল হয়েছিল তাঁর ছড়া ও ছন্দ। তবু সেদিনই রমেশ শীলের কবিয়াল-জীবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে যায়। শ্রোতাদের দ্বারা তিনি সেই প্রথম আসরেই নন্দিত হয়েছিলেন, আর্থিক পুরস্কারও লাভ করেছিলেন।

দীর্ঘ আয়ু লাভ করেছিলেন রমেশ শীল। নব্বই বছর বয়সে ১৯৬৪ সনের ৬ই এপ্রিল তাঁর জীবনাসান ঘটে। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি সব সময়ই তাঁর চোখ কান খোলা রেখেছেন, একজন লোককবি হয়েও যথার্থ 'পৃথিবীর কবি'র মতোই 'যেথা তার যতো ওঠে ধ্বনি' তাঁর বাঁশীর সুরে তার সাড়া জাগাতে পেরেছেন অগৌণে। তাই দুটো বিশ্বযুদ্ধ, অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কৃষকদের অধিকারের জন্য লড়াই, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, ভারত বিভাগ, ভাষা আন্দোলন ইত্যাদি সবই রমেশ-মানসে সক্রিয় ও সদর্থক আবেগের সৃষ্টি করে, আর সে-আবেগ তাঁর অবলম্বিত কবিগানের শিল্পরূপেও ঘটাতে থাকে ক্রমরূপান্তর। রমেশ শীলের হাতেই কবিগান সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ারে পরিণত হয়ে যায়। যার পরিণামে তৎকালীন সরকারের কোপানলে তাঁকে কারানির্যাতনও ভোগ করতে হয়।

১৯৪৫ সনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ প্রগতিশীল লেখক ও শিল্প সম্মেলন' উপলক্ষে কবিগানের আসরে পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান কবিয়াল শেখ গোমানীকে (এবং তাঁর শিষ্য লম্বোদর চক্রবর্তীকে) হারিয়ে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের কবিগানে সূচিত নবতরঙ্গের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিলেন। হরিচরণ আচার্যের সাধনায় যেটুকু সীমাবদ্ধতা ছিল, রমেশশীল তার অপনোদন ঘটালেন। যাত্রাগানের ক্ষেত্রে গণচেতনায় যে-নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন চারণ কবি মুকুন্দ দাস, কবিগানের ক্ষেত্রে রমেশশীলের অবদান তার চেয়েও অনেক বেশী গভীর। মুকুন্দ দাস 'স্বদেশী যাত্রার প্রবর্তন করে লোকচেতনায় আধুনিক জাতীয়তাবোধের সংক্রমণ ঘটান, আর রমেশশীল কবিগানের লোকায়ত আঙ্গিকে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-চেতনার প্রবাহ বইয়ে দেন।

রমেশশীল প্রবর্তিত কবিগানের ধারা স্বরূপতই পূর্বতন কবিগানের থেকে গুণগতভাবে পৃথক। রমেশশীল শুধু কবিত্বশক্তিরই অধিকারী ছিলেন না, সাংগঠনিক শক্তিও তাঁর যথেষ্টই ছিল। ১৯৪৩ সনের মহাদুর্ভিক্ষের সময় সাধাবণ মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে কবিয়ালদেবও যখন জীবন সংকট দেখা দেয়, তখন তিনি চট্টগ্রাম জেলার কবিয়ালদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'চট্টগ্রাম কবি সমিতি।' সে-সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন রমেশ শীল, সহসভাপতি—হেদায়েত ইসলাম খান, সম্পাদক—ফণী বড়ুয়া, সহ-সম্পাদক—গোবিন্দ চন্দ্র দে, আর সদস্য হন তারাচরণ দাস, সারদাচরণ বড়ুয়া, রাই গোপাল দাস, বরদাচরণ দে ও শৈলেন সেন। সাংগঠনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এ-সব কবিয়াল সেদিন দেশের সংকট মোচনের জন্য যেমন গণ-জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন, তেমনি কবিগানেরও সংকটমুক্তি ঘটালেন তাঁরা। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার দায় থেকে এঁরা কবিগানকে মুক্ত করলেন। মেহনতী মানুষদের প্রাণের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই এঁদের কবিত্ব শক্তি নিয়োজিত হলো, তাই নতুন ধারার এই কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করলো মেহনতী মানুষেরাই। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগুলোও এ ধারার কবিগানের অগ্রগতিতে যথেষ্ট সহায়তা দান করেছে।

রমেশ শীলের পুত্র যজ্ঞেশ্বর শীলও পিতৃ-প্রবর্তিত কবিগানের ধারার একজন উজ্জ্বল উত্তরাধিকারী। ফণী বড়ুয়া ও রাইগোপাল দাস—রমেশ শীলের দুই কৃতী শিষ্য। এ-ছাড়াও আছেন ইয়াকুব আলী ও তৈয়ব আলী প্রমুখ কয়েকজন কবিয়াল।

রমেশ শীল যুগস্রষ্টা কবিয়াল ; কিন্তু তাঁর যুগান্তকারী কবিগানের ধারা তাঁর চট্টগ্রামের শিষ্য-প্রশিষ্যদের বাইরে সারা দেশে বিস্তৃত হতে পারেনি—এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য। আজও বিভিন্ন স্থানে কবিয়ালরা ক্ষয়িষ্ণু সনাতনী ধারার কবিগানের টিমটিমে দীপটিকেই জ্বালিয়ে রাখছেন। সে-দীপ যে অচিরেই চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যাবে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। রমেশ শীল-সূচিত বিপ্লবী কবিগানের ধারাতে আরও নতুনতর মাত্রা যুক্ত করেই কেবল কবিগানকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু সেই অতি-আবশ্যক কাজটি কেন-যে হচ্ছে না, কেন-যে রমেশ শীলের উত্তরাধিকার বহনের প্রয়াস সর্বাত্মক হয়ে উঠছে না,—সে বিষয়ে হেতু-অনুসন্ধানেরও কোনো তাগিদ আছে বলে মনে হয় না। এক রকম নীরব অবহেলার মধ্য দিয়েই রমেশ শীলের জন্মশতবার্ষিকীর বছরটি (বাং ১৩৮৪, ইং ১৯৭৭) চলে গেল। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেবল বাংলা একাডেমীই সে-বছরে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, আরও দু'এক জায়গায় ছিটে ফোঁটা কিছু অনুষ্ঠান হয়তো হয়ে থাকবে, কিন্তু সারা দেশ জুড়ে রমেশ শীল কিংবা বাংলাদেশের কবিগানের ঐতিহ্য সম্পর্কে কোনো জ্বলন্ত উৎসাহের সঞ্চার ঘটেনি। ব্যাপারটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

পাঁচ

বর্তমান নিবন্ধটি বাংলাদেশের কবিগান ও কবিয়ালেব একটি অসম্পূর্ণ পরিচিতি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কবিগানের কলারূপের কোনো পরিচয় এখানে দেয়াই হয়নি ; কিংবা দৃষ্টান্তসহ বাংলাদেশের কবিগানের ভাববস্তুর বা প্রকরণের বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তনের কোনো পবিচয়ও তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়নি। তার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ (কিংবা পুস্তক) রচনা করা প্রয়োজন হবে। আমাদের বর্তমান আলোচনায় বাংলাদেশের কবিয়ালদেব যে-পরিচিতি প্রদান কবা হয়েছে, তা শুধু সংক্ষিপ্তই নয়—খণ্ডিতও। বাংলাদেশের মাত্র কয়েকটি জেলার কবিয়ালদের কথা এখানে উল্লেখিত, অন্য জেলাগুলোতেও কবিয়াল ছিলেন বা আছেন কি-না তারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। সে কাজে প্রত্যেক জেলারই সংস্কৃতি সেবীদের অবিলম্বে তৎপর হওয়া উচিত। বাংলাদেশের লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখা নিয়ে যে-রূপ অনুসন্ধান ও আলোচনা করা হয়েছে, কবিগান নিয়ে সে—রূপ কিছুই হয় নি। আব তারই ফলে, কবি গানের উপর পশ্চিমবঙ্গের একচেটিয়া দাবী প্রায়-প্রতিষ্ঠিতই হয়ে গিয়েছিল। অথচ, সামান্য অনুসন্ধানের ফলেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে : এককালের পূর্ব বাংলা ও আজকের বাংলাদেশের কবিগানের ঐতিহ্য শুধু সমৃদ্ধই নয়, এ অঞ্চলের কবিয়ালরাই কবিগানের কলারূপকে নব নব বিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা করলে যে কবিগানের ইতিহাস সম্পূর্ণ নতুন করে লিখতে হবে,—এ ব্যাপাবে সন্দেহ পোষণ করার বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই।

লোকনাট্য

মোহাম্মদ সাইদুর

লোকনাট্য কলা

নাট্যকলার উদ্ভব ও বিকাশ

নাট্যকলা বলতে সাধারণ কোন ঘটনার চরিত্রগুলোর চবিত্রানুযায়ী ভাবভঙ্গির অনুকরণ ও অনুসরণ ও অভিব্যক্তি প্রকাশকে বুঝিয়ে থাকে। এই অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে কথা, সংগীত, নৃত্য ও নৃত্ত। মানুষ কখন কোন কাল–বা কোন শতাব্দী থেকে যে, এ অনুকবণ ও অন্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে নিজে আনন্দ পাচ্ছে সেই সঙ্গে অপরকেও আনন্দ–দান করে আসছে তা সঠিকভাবে আজও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে মানব–সভ্যতার ঊষাকালেই যে এ কলার উদ্ভব ও বিকাশ এ কথা আজ লোকবিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা থেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

অবশ্য সূচনা পর্বে সেই নাট্যকলা আজকের সুদৃশ্য মঞ্চে অভিনয় কলাকুশলে সমৃদ্ধ ও জমজমাট নাট্যকলা থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আজ যেমন নাটকের চরিত্র রূপদানকারীরা সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ হিসেবে অভিনয় কলার মাধ্যমে নিজের আনন্দের বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে অপরকেও আনন্দ–দান করছে—সেদিক থেকে সূচনা পর্বে–আনন্দ উৎসব নয়,—বরং সে যুগের মানুষ চারপাশের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার তাগিদেই এ কলার প্রয়োগ ও ব্যবহার করেছিল। নৃতত্ত্ববিদদের ধারণায় মানব–সভ্যতার বিশেষ একযুগে অরণ্যচারী, গুহাবাসী ও শিকারজীবী মানুষের জীবন খুব সুখের ছিল না। তাদের চারপাশে ছিল প্রতিকূল প্রকৃতি, হিংস্র জীবজন্তু, রোগ–ব্যাধি, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ; উপরন্তু প্রতিদিনের অনিশ্চিত খাদ্য আহরণ। এমনি প্রতিকূলতায় সে যুগ ছিল মানুষের বাঁচা–মরা ও জীবন–সংগ্রামের যুগ। শুধু নখ–দন্ত ও পাথুরে অস্ত্র দিয়ে সে যুগের মানুষ প্রতিদিনের খাদ্য আহরণ, হিংস্র জীবজন্তু শিকার ও হিংস্র প্রতিবেশীদের থেকে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে কি করে সহজেই পরাজিত ও প্রতিহত করা যায়—এ চিন্তা ও পন্থাই ছিল তাদের প্রধান সংগ্রাম। এ সংগ্রামের জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি ছিল তাদের বাহুবল ও অনুন্নত পাথুরে অস্ত্র। কিন্তু এ নিয়ে তারা কখনও সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি এবং সব কিছুর মূলেই একটি অপরিজ্ঞাত ও অদৃশ্য শক্তির কল্পনা তাদের মনে ছিল। সে কল্পনা থেকেই অনুন্নত অস্ত্র ও বাহুবলের সঙ্গে সেই কল্পনীয় অপরিজ্ঞাত শক্তিকেও তারা অধিগত করতে চেষ্টা করেছে। সে চেষ্টা থেকেই জন্ম নিয়েছিল ইচ্ছা ও বিশ্বাসের। এই ইচ্ছা ও বিশ্বাস থেকেই শুরু হয় নানা আচার আর ক্রিয়াকর্মের। যার রূপ আমরা দেখতে পাই প্রাচীন গুহা চিত্রে ও ফলক চিত্রে। অর্থাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মহড়া, কল্পিত শত্রুকে উদ্দেশ্য করে পাথর, বল্লম, ডালপালা ছুঁড়ে মারা। শিকারে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে শিকারের নকল অভিনয়। শিকারের প্রতিকৃতি ধারণ, বর্শা, তীর

নিক্ষেপ করা। এমনি নানা অবস্থার পর শিকার বা শত্রুকে করায়ত্ত করার মাধ্যমে এর সমাপ্তি। এই ছিল প্রাচীন যুগের মানুষের সংগ্রামের নকল বা মহড়া—যে মহড়ায় তাদের বিশ্বাস ছিল—এ থেকে শত্রু অবশ্যই পরাজয় বরণ করবে এবং শিকারও সহজেই করায়ত্ত হবে এবং নিশ্চিতভাবেই মানুষের সেই অপরিজ্ঞাত অধোগতি শক্তি তাদের সাহায্য করবে। আদি মানুষের এই প্রক্রিয়া ও ধ্যান-ধারণাকে লোকবিজ্ঞানীরা 'ম্যাজিক' বা ইন্দ্রজাল বলে চিহ্নিত করেছেন। যদিও কোন যুক্তি নেই তবু এই ইন্দ্রজালকেই আমাদের লোকনাট্য কলা উদ্ভাবনের প্রথম সোপান হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

এই ইন্দ্রজাল ছাড়াও সে যুগের মানুষের আর একটি ধারণা ছিল যে রোগ-ব্যাধি, মড়ক-মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ-ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ গর্জন এর প্রতিটি ঘটনার পেছনেই এক একটি অদৃশ্য অশরীরী ও ভয়াল আত্মার অবস্থান রয়েছে এবং এ সব ভয়াল আত্মাব কারসাজিতেই এসব ঘটছে। এ ধারণা থেকেই প্রাচীন যুগের মানুষ অদৃশ্য এ সব আত্মা বা শক্তিকে নানা সাধ্যসাধনায় বশীভূত করতে চেয়েছে। এ সাধ্যসাধনার মধ্যে কখনও শক্তি প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন দ্বারা, আবার কখনও সে অদৃশ্য শক্তির স্তুতি প্রশংসায় আবার কখনও নানা প্রলোভনের দ্বারা। এই অশরীরী—অদৃশ্য আত্মার কল্পনা ও সন্তুষ্টির জন্যে যেমন প্রার্থনা ও নৃত্যের উদ্ভব, তেমনি প্রার্থনা ও নৃত্যের প্রথম পর্যায় থেকে কল্পিত আত্মার কল্পিত চালচলন, অনুকরণ, অনুসরণ করতে গিয়ে অভিনয় কলার উদ্ভবের কথাও অস্বীকার করা যায় না।

প্রাথমিক পর্যায়ের এ কলাই মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে। প্রথমে শত্রু প্রতিহত, সহজে শিকার করায়ত্ত, আদি দৈবিক বা আদি ভৌতিক শক্তির স্তুতি প্রশংসা সম্পদপ্রাপ্তি, সম্পদ বৃদ্ধি, লৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি ইত্যাদির কামনা থেকে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন ও লৌকিক ধর্ম প্রচারে এ কলার ক্রম ব্যবহার ও বিকাশ লাভ করেছে। যেমন আজও আমরা দেখি সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচারে "বেহুলার পালা" বনদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে "বনদুর্গা" বা "বনবিবির" পালা, ব্যাঘ্রপীর-গাজীর মাহাত্ম্য কীর্তনে "গাজীর পালা" শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত প্রচারে "নিমাই সন্ন্যাস পালা" ইত্যাদি বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত চরিত্রগুলোর গীতবাদ্য ও অভিনয়ে প্রচার। এ ভাবেই কথা, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের দ্বারা নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন ও প্রচারের পরই বিভিন্ন লৌকিক, ঐতিহাসিক, রূপকথা, উপকথার কাহিনীগুলি অভিনয় কলায় রূপ পরিগ্রহ করে ক্রমান্বয়ে আধুনিক লোকনাট্য কলায় পর্যবেশিত হয়েছে।

লোকনাট্য কলা

এখানে লোকনাট্য কলা বলতে এমন এক জাতীয় গীতাভিনয় ও অভিনয় কলার কথা বলা হয়েছে—যে কাহিনীর বচক, গীতাভিনয়ের দর্শক, শ্রোতা, কলাকুশলী, পাত্র-পাত্রী থেকে নর্তক-নর্তকী, গীতক-বাদক সবাই পল্লীর সাধারণ নিরক্ষর ও সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকসমাজ। এ জাতীয় কাহিনী-কলার অভিনয় বা নাটকীয় কোন ফর্ম বা লিখিত রূপ নেই। প্রাচীনকাল থেকেই এ কলার বিভিন্ন কাহিনী ও রূপ সাধারণ মানুষের স্মৃতি ফলকে রক্ষিত হয়ে যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুলি আজ পর্যন্ত

চলে আসছে। সে দিক থেকে এ কলা যেহেতু সাধারণ লোকসমাজে উদ্ভূত ও সাধারণ লোক সমাজেই এর ব্যাপ্তি সুতরাং একে 'লোকনাট্য কলা' বলাই শ্রেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে লোকনাট্য কলা শব্দটি অতি অর্বাচীনকালে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও পূর্বে লোকসাহিত্যের শ্রেণীকরণে অভিনয় কলাকে বিশেষ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। অতি সম্প্রতি লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় এ অভিনয় কলাকেও "লোকনাট্য কলা" নামে একটি বিশেষ অধ্যায় হিসেবে আলোচনা শুরু হয়েছে—এবং সেই সঙ্গে লোকনাট্য কলার সংজ্ঞা হিসেবে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন। এখানে সেই সংজ্ঞাগুলো উদ্ধৃত করছি—প্রখ্যাত লোকবিজ্ঞানী ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয় তাই লোকনাট্য।' আবার মানিক সরকারের মতে, লোকাশ্রিত কাহিনী, কাহিনী আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি, সহজ সরল বলিষ্ঠতার সঙ্গে লোকগীত, নৃত্য, স্বল্প সংলাপ এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে ঋজু দৃঢ় ভাবভঙ্গির দ্বারা লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা প্রকাশ হয় তাই সাধারণ অর্থে লোকনাট্য (ফোক ড্রামা)।'

লোকনাট্যের যুগ বিভাগ

লোকনাট্য কলার উপরোক্ত সংজ্ঞাকে অনুসরণ করে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসা ধারাকে আমরা মোটামুটি তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি। যেমন—খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত ধারাকে 'প্রাচীন যুগ' দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 'মধ্যযুগ' ও পরবর্তীকালের ধারাকে 'আধুনিক যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রাচীন যুগ

যতদূর জানা যায় প্রাচীন ধারার নাট্যাভিনয়গুলোতে গীত-বাদ্য-নৃত্যের প্রাধান্যই ছিল বেশী। গদ্য সংলাপের প্রয়োগ বলতে গেলে ছিলই না। এ জাতীয় অভিনয় কলাকে তখন নাট্য-গীত বা নৃত্যসংবলিত গীত বলা হতো। এ নাট্যগীতে অভিনয়ের জন্যে গীতক-নতর্ক ও বাদ্যকর ছাড়া অভিনেতার বিশেষ প্রয়োজন হতো না। প্রয়োজনে মূল গীতকই কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে ও অঙ্গ ভঙ্গির সাহায্যে অনেক চরিত্রের অভিনয় করে যেতো, আর পুরুষরাই নর্তকী সেজে নাচতো গাইতো। মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রকাশিত পালাগুলোও বাংলাদেশের পল্লীতে বহুল প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর পালাগীতি ও গাজীর গীতে এরূপ প্রাচীন ধারা আজও বিদ্যমান।

মধ্যযুগ

দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী যুগের নাটকে পদ্য সংলাপের প্রয়োগ আরম্ভ হয়। কিন্তু তাতেও নৃত্যগীতের প্রাধান্যই বেশী দেখা যেতো এবং এ যুগ থেকেই নাটকে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন-উত্তরের রীতি প্রচলিত হয়। এ ধারার নাটকগুলি অভিনয়ের জন্যে বাড়ীর উঠোন, বৈঠকঘরের বারান্দা অথবা মণ্ডপ ঘরে আসর করা হতো। চারপাশে বসতো শ্রোতা আর মাঝখানে গোলাকারে ফাঁক রেখে তার মধ্যে বসতো নাটকের পাত্র-পাত্রী, অভিনেতা-

অভিনেত্রী, বাদ্যকর ও দোহারগণ। দর্শকের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় অভিনেতা অভিনেত্রীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচ–গানের মাধ্যমে অভিনয় করতো।

বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে প্রচলিত বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের 'আলকাপ গান' রংপুরের 'ছোকরা নাচা গান' ময়মনসিংহের 'বাইদ্যার গান' 'চন্দ্রাবলীর গান' ফরিদপুর–চট্টগ্রামের 'গাজীর পালায়'—এ জাতীয় নাট্যধারার রূপ আজও বর্তমান।

আধুনিক যুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই আমাদের লোকনাট্যগুলোতে অভিনয় কলা ও সাজ–সজ্জার দিক দিয়ে ইংরেজী নাটক প্রভাবান্বিত বাংলা নাটক ও সখের যাত্রার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য এ প্রভাবের মধ্যেও লোকনাট্যের ধারা সম্পূর্ণ বদলে যায়নি। এ নাট্যাভিনয় গুলোতেও কথা থেকে গীত ও নৃত্যের প্রাধান্যই বেশী দেখা যায়। আর এ ধারার লোকনাট্যে মৌলিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ক কাহিনী সন্নিবেশিত হয়ে এ কলা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

লোকনাট্যের কাহিনী

লোকনাট্যকলার উদ্ভব ও বিকাশের ধারাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে—নানা ধ্যান–ধারণা–বিশ্বাস আচার–অনুষ্ঠান ও লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনকে কেন্দ্র করেই লোকনাট্যের উদ্ভব ও বিকাশ। সে দিক দিয়ে লোকনাট্য কলার কাহিনীও প্রধানত লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দেবদেবী সম্পৃক্ত। পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রূপকথা–উপকথা, সামাজিক ও লৌকিক কাহিনী লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেদিক দিয়ে প্রচলিত লোকনাট্যের কাহিনী প্রধানত নিম্নরূপ ছকে ভাগ করা যেতে পারে—
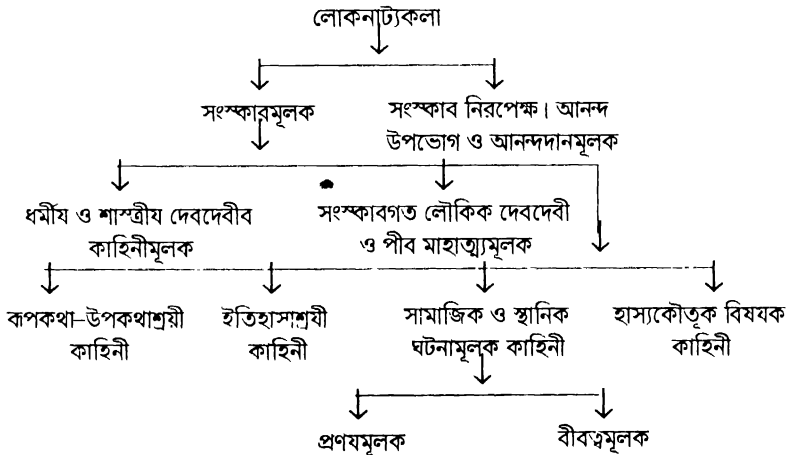
উল্লিখিত ছক অনুযায়ী বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ও বিশেষভাবে জনপ্রিয় কিছু সংখ্যক কাহিনীর নাম উল্লেখ করা যায় :

ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় দেবদেবী বিষয়ক কাহিনী

১. রামযাত্রা/রামলীলা ২. রাম সীতার পালা/সীতার বনবাস/সীতা হরণ ৩. কালীর দমন ৪. রাজা হরিশ্চন্দ্র ৫. সুরৎ উদ্ধার ৬. কৃষ্ণলীলা ৭. নৌকা বিলাস ৯. মানভঞ্জন ৯. সত্যবান-সাবিত্রী ১০. নলদয়মন্তী।

লৌকিক দেবদেবী ও পীর মাহাত্ম্যমূলক কাহিনী

১. মনসার ভাসান ২. বনদুর্গার পালা ৩. গাজীর পালা ৪. মাদারের পালা ৫. সত্যপীরের পালা ৬. গাজীপীরের পালা ৭. চম্পাবতী কন্যার পালা ৮. বেহুলা-লখিন্দরের পালা ৯. চাঁদ বেনের পালা ১০. গঙ্গার পালা ১১. বিষুরীর পালা ১২. তোনাই-মোনাইর পালা ১৩. ভক্ত জামালের পালা ১৪. গোর্খের পালা ১৫. নিমাই সন্ন্যাস পালা।

রূপকথা উপকথাশ্রয়ী কাহিনী

১. আয়নামতির পালা ২. গফুর রাজার পালা ৩. মদনকুমার মধুমালার পালা ৪. মেহের নেগারের পালা ৫. ছায়েদ পরীর পালা ৬. শঙ্খমতির পালা ৭. রূপবান রহিম বাদশার পালা ৮. সাগর ভাসার পালা ৯. গেন্দা গুলের পালা ১০. গোলে হরমুজের পালা ১১. ডালিম কুমারের পালা ১২. অতুলা সুন্দরীর পালা ১৩. ফুল কুমারীর পালা ১৪. মাধব মালঞ্চের পালা ১৫. লাইলী মজনুর পালা ১৬. লীলাবতীর পালা ১৭. মমতাজ পালা ১৮ ধরমিত বাদশার পালা ১৯. রানী রাক্ষসের পালা ২০. রূপসিনীর পালা ২১. রাক্ষসীর পালা ২২. নূরবানু শাহজাহানের পালা ২৩. নূর শাহজাহানের পালা ২৪. হেস্মেছ কেস্মেছের পালা ২৫. তপন মদনের পালা ২৬. হারুন বাদশাহ ও সুরুজমতির পালা ২৭. মালেকা সুন্দরীর পালা ২৮. কাঞ্চন সরার পালা ২৯. ছয়ফলমূলক বদিউজ্জামান পালা ৩০. সোনাভানের পালা ৩১. সূর্যউজাল বিবির পালা ৩২. কাঞ্চন মালার পালা ৩৩. শাহজামালের পালা ৩৪. শিরী ফরহাদ পালা ৩৫. ভেলুয়া সুন্দরীর পালা ৩৬. জামাল জরিনার পালা ৩৭. লালবানু শাহ জামাল পালা ৩৮ মুকুটরায়ের পালা ৩৯. তীলক বসন্তের পালা ৪০. সর্ন্নমালার পালা ৪১. গুলেবকাওয়ালীর পালা।

ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী

১. মেহের নেছার পালা ২. আলাল দুলালের পালা ৩. রাজুবালা সুন্দরীর পালা ৪ মালেকা সুন্দরীর পালা ৫. ভাওয়াল সন্ন্যাসীর পালা ৬. মইশাল রাজাব পালা ৭. ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের পালা ৮. ফুলমতির পালা ৯. রাজু সতীর পালা ১০. তীলারাজার পালা ১১. ফুলমালার পালা ১২. আফতাব-মাহতাবের পালা ১৩. আদম খাঁ বিরাম খার পালা ১৪. পৈলান খাঁ অরণ সোনাইর পালা ১৫. মুকুট রাজার পালা ১৬. বিজয় বসন্তের পালা ১৭. মাধব মালঞ্চের পালা ১৮. ইমামের পালা ১৯. হাজেরা বিবির পালা ২০. ভেলুয়া সুন্দরীর পালা ২১. বিজয় বসন্তের পালা ২২. ঈশা খাঁ সোনাময়ীর পালা ২৩. সোনারায়ের পালা।

সামাজিক ও স্থানিক কাহিনীমূলক কাহিনী

১. বাইদ্যার গান ২. গুনাই ৩. আসমান সিং ৪. সাইবের বাপ ৫.জমিলা সুন্দরী ৬. তোতামিয়া ৭. নীলমণির পালা ৮. চান বিনোদ পালা ৯. পৈলান খাঁ অরণ সোনাই ১০. ফুলমতির পালা

১১. আত্তাপ মাহতাব ১২. মইরামতির পালা ১৩. জননীর বিচার ১৪. ধোপার পাট ১৫. মনোয়ার খাঁ ১৬. মৈশাল বন্ধু।

হাস্য কৌতুকমূলক কাহিনী

১. গৌরদাস বাবাজীর সং ২. মালি মালিনীর সং ৩ ঘেসেরা-ঘেসেনীর সং ৪. জেলে জেলেনি।

উল্লেখিত কাহিনীগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের পল্লীগুলোতে আজও শত শত পালা, যাত্রা ও লোকনাট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

লোকনাট্যের অভিনয় প্রকরণ ও পাত্র-পাত্রী

বাংলা লোকনাট্যের অভিনয় সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রাচীন-যুগে এ জাতীয় অভিনয় কলার জন্যে কোন মঞ্চ বা বিশেষ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হতো না। সাধারণত বাড়ীর উঠানে, নাট্যমণ্ডপ অথবা বাড়ীর বহিরাঙ্গিনায় নিতান্ত সাধারণ পরিবেশে অতি সাধারণ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদিসহ এর অভিনয় চলতো। অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে মূলে থাকতো একজন সরকার বা সূত্রধর। এর পর মূল গীতক, বাদক, নর্তক, পাইল, দোহার, জুড়ি, ভাঁড়, পরমপুরুষ বা বিবেক। মূল কাহিনী শুরুর আগেই কতগুলো নিয়ম পালন করা হতো। এর মধ্যে প্রথমেই মূল সরকার বা সূত্রধর আসরে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে বা বিনীতভাবে প্রস্তাবনার আকারে সেদিনের অভিনীত পালা সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে অবহিত করতেন। সূত্রধরের প্রস্তাবনার পর পরই শুরু হতো বাদ্যযন্ত্রীদের ঐকতান। এরপর সূত্রধর বা নর্তক-নর্তকীর বন্দনা, বন্দনার পর শুরু হতো মূল পালা। মূল পালা বা কাহিনীর অভিনয়ে ও নানা ফর্মের প্রচলন ছিল, যেমন—অভিনয়, নাচ, গান, গীত, বাদ্য ও হাস্য কৌতুক। এসব মিলিয়ে মূল কাহিনীর অভিনয় শেষ হতো। লোকনাট্যকলার এ ফর্মকে নিম্নরূপ একটি ছকে দাঁড় করানো যায় :
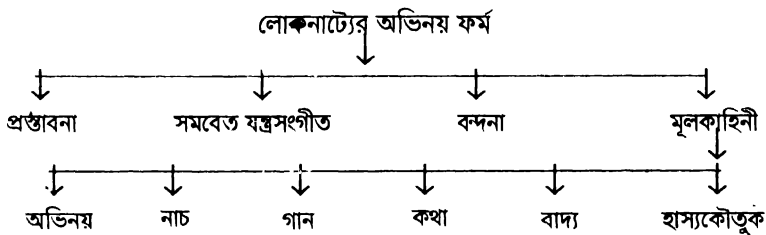
প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রচলিত লোকনাট্য অভিনয়ের এ ফর্মটি—আধুনিক যুগেও খুব একটা পরিবর্তন হয়নি, বরং সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে লোকনাট্য মঞ্চে এ ফর্মটিই প্রচলিত রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্র

প্রাচীন যুগের নাট্যকলায় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল সীমিত—যাও প্রচলিত ছিল তার মধ্যে শিঙ্গা, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাতিল ও একতারের যন্ত্রই ছিল প্রধান। মধ্যযুগে এ কলায় তার যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ি, মন্দিরা, করতাল, করনাল, বাঁশী, সানাই, খঞ্জনী, খঞ্জরী, খমক, ঢাক, ঢোল, খোল ইত্যাদি যোগ হয়েছে। আধুনিক যুগে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে হারমোনিয়ম, বায়া, ডুগী, বেহালা, ক্লারিওনেট ইত্যাদি বিদেশী বাদ্যযন্ত্রও যোগ হয়েছে।

লোকক্রীড়া

আশরাফ সিদ্দিকী

লোক-খেলাধুলা

আজ এখানে ছাপার হরফে রেকর্ড করে রাখবো পল্লী বাংলার কিছু খেলাধুলার বিবরণ—যা আমি নিজে দেখেছি। কম খেলাধুলা প্রচলিত ছিল না আবহমান পল্লী অঞ্চলে। এই খেলাধুলাগুলি নিয়ে গবেষণা চালালে হয়তো দেখা যাবে বহু খেলাধুলার সঙ্গেই বিভিন্ন অনার্য বা আদিবাসী খেলাধুলার মিল আছে। অর্থাৎ খেলাগুলি বহু প্রাচীন। ক'টার ইতিহাসই বা আমরা জানি। আমরা খেলতাম গোল্লাছুট। একদিকে গোলাকার গোল্লাব মত বৃত্ত করে দাঁড়িয়ে থাকতো 'গোল্লা'। সে গোলাকার বৃত্তের বাইরে গেলেই অন্য দল ছুঁয়ে দিলে খেলায় হার হ'বে। গোল্লাদলের মধ্যে থাকে অন্যান্য ছেলেরা—বলে 'খেউরি'। সংখ্যা ৫-১০ যা খুশী। বিপরীত দিকে থাকবে 'খেউরি'—মাঠের বিপরীত সীমায়, গোল্লার বিপরীত দিকের বাউণ্ডারী (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, যে কোন দিকে) পার হ'তে হ'বে—অন্য দলকে ফাঁকি দিয়ে। নানারূপ দৌড়ের কশরত ছিল। গোল্লার দলের খেউরিকে বিপরীত দিকের বাউণ্ডারীতে পৌছার আগে ছুঁয়ে দিলে সে মৃত গণ্য হ'বে। আর দুই দলের খেউরিগণ যখন সীমা অতিক্রম করা নিয়ে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত এক ফাঁকে 'গোল্লা' যদি বিপরীত বাউণ্ডারীতে ছুটে চলে যেতে পারে—কারো ছোঁয়াবিহীন, তবেই খেলাতে জিৎ। অবশ্য 'গোল্লা' যে কোনো সময়েই যেতে পারতো। আর খেউরিগণ থাকবে তার সাথে যতক্ষণ ততক্ষণ ছুঁলে কিছু ক্ষতি নেই। খেলার শুরুটা ভারী মজার। গোল্লার অন্যদের হাত ধরে ধরে—বেশ একটা লম্বা লাইন হ'ত। তারা কিছুক্ষণ হাত ধরে ঘুরতো চক্রাকারে গোল্লার চার পাশ দিয়ে—যেন এক সূত্রে বাঁধা একটি সমাজ—তারপর সীমানা অতিক্রমের জন্য খসে পড়তো অর্থাৎ চারিদিকে শত্রু কিন্তু দৌড়ের জোরে—শত্রুসীমা অতিক্রম করে নিরাপদ স্থানে পৌছাতে হ'বে।

গোল্লাছুটের সমগোত্রীয় খেলার নাম ছিল 'ছাউসি' খেলা। সেখানেও বৃত্তের মধ্যে বসে থাকতো 'ছা' অর্থাৎ শিশু। তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হ'বে। 'ছাউসি' খেলার খেউরিগণ কিন্তু বসে থাকতো একদল। অন্যদলের সবাই সীমানা পাহাড়া দিত—গোল্লাছুটের মতই। 'ছাউসি' দলের একজন তার মাথা ছুঁয়ে ছড়ার সুরে 'দম' দিত—এই যেমন :

"ছাউসি খেলা বড় ঠেলা। দশ বারটা মাইরা ফেলা"॥ "এক হাত বল্লার বার হাত শিং। উড়ে যায় বল্লা ধা-তিং-তিং"...। "অরম বিবির খড়ম পায় লাল বিবির জুতা পায়।" "দেখতো দেখি কেঠা যায়.. ॥" "আমার খেউরি মরিল। কোন্খানে গাড়িল"॥ "শিয়ালে খায় শুকুনে খায়। খেউরির শোকে পরাণ যায়॥..." "হুক্কুর গুতা লাড়ুয়া। মইষ মারে তাড়ুয়া॥ মইষের তেলে। পোড়াবাতি জ্বলে"॥ জ্বলুক বাতি পুড়ুক তেল। রাম শালিকেব পাক্কা বেল...॥" ইত্যাদি।

শেষোক্ত ছড়াটিকে আদিম সমাজের কোন মন্ত্রের অপভ্রংশ বলে মনে হয়।

'ছাউসি' পক্ষের খেউরি দম ডেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে শত্রু পক্ষকে—ছুঁতে পারলে তারা মৃত ; দম ফুরিয়ে গেলে তাকে ছুঁয়ে দিলে কিন্তু সে মৃত। এরই এক ফাঁকে ছানা বা 'ছা' দৌড়ে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছাবে। কৌশলটি অভিনব—গোল্লাছুটের মতই—শত্রুপক্ষকে ব্যস্ত রেখে চালাকীর সঙ্গে ছানা অথবা শিশুকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। পশু জগতেও কিন্তু দেখা যায়—চারদিকে হম্বি-তম্বি করে—লোকজন বা সম্ভাব্য আক্রমণকারীকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সে বাচ্চা বা শাবক নিয়ে পালিয়ে যায়।

হাডুডু বা দাঁড়িয়া বাধাও সম্ভবতঃ খুব প্রাচীন খেলা। এর দর্শন কিন্তু অন্য রকমের। অর্থাৎ আমরা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই আছি—আমরা জোটবদ্ধ—গোষ্ঠীবদ্ধ—তোমাদের হারিয়ে দিতে চাই আর প্রমাণ কবতে চাই আমরাই বড়—অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী।

আরেক রকমের খেলা দেখেছি ২০/৩০ ফুটের মত জায়গায় বৃত্তাকার দাগ দিয়ে সেখানে একদল পাটখড়ি ভেঙে ভেঙে রেখে যেত। অন্য দলকে সেগুলি খুঁটে খুঁটে তুলতে হত। একবারে না তুলতে পারলে পয়েন্ট কমে যেত। অর্থাৎ যত শোলা ভাঙা হয়েছে, প্রতিবার না বসে তুলতে হ'বে উবু হয়ে। একটি তুলেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এতে মাজার ব্যায়াম হ'ত খুব। ঘুরে ঘুরে দাঁড়িয়ে উঁবু হয়ে চলতো খেলা। এক একজন ক্রমান্বয়ে—আগেরজন পেছনে পড়তে পারবে না—পড়লে সে মৃত অর্থাৎ বাদ পড়ে গেল। এমনি করে যতজন খেলোয়ার বা খেউরি থাকতো ৫-১০-২০ সবাই অনবরত অংশ নিত—একই সময়ে। অর্থাৎ খেউরি যদি থাকতো ২০ জন একদলে—তবে শোলাও ভাঙা হ'বে ২০ টুক্‌রা—অন্য দলের জন্য। বেশ কিছুক্ষণ খেললেই সবাই হয়রান হয়ে যেত, বলতো মাজা ধরে গেছে—আর পারি না ! তখন অন্যদল আসতে পারতো। কিন্তু গোল্লাছুট কি ছাউসি—কি শোলা ভাঙা—অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যায় সীমাবদ্ধতার দরকার হ'ত না। একদম ডেমোক্রেটিক—আসো—খেলো—তবে খেউরিদের উভয় দলের সংখ্যাসাম্য থাকা চাই।

বাইরের আরো একটি খেলা ছিল লাঠি খেলা। সাধারণতঃ মাঠে গরু চরাতে রাখালগণ খেলতো। তারা সম্ভবতঃ শিখতো মহরম বা পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে নিয়মিত খেলা দেখে। এই সময় বিপুল উৎসাহে গ্রামে গঞ্জে লাঠি খেলা হ'ত। গোলাকার হয়ে লোক দাঁড়াতো চারদিকে, মধ্যখানে খেলা। মধ্যে মধ্যেই ডাকের গান হ'ত : কী-রে-এ-এ।...বেশ জোস্ এসে যেত। তরবারী খেলাও হ'ত একইভাবে তরবারী নিয়ে। গরু চরাবার পাঁচন নিয়ে একজন অনবরত বলতো—'আয় ভাই—চল্ খেলি এক হাত—বা-বা সাবাস সাবাস' খেলা শুরু হবার পূর্বে এই যে বৃত্তকারে ঘুরা নানারূপ চটকদার কথা বলে প্রতিপক্ষকে উল্লসিত বা আহ্বান করা—বেশ ভালো লাগতো। তারপর একসময় শুরু হ'ত খেলা পাঁচনে পাঁচনে ঠক্‌ঠক্ চট্‌চট্, পাঁচনের মার দু'একটা প্রতিপক্ষের গায়ে এসেও লাগতো। ফূর্তি হিসাবেই একে গ্রহণ করা হ'ত। এটিও যুদ্ধবদ্ধ আদিম সমাজের খেলার অংশ বলে মনে হয়।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন হ'ত 'ঢোপবাড়ি' খেলা। একটি গোলাকার বলের মত কাষ্ঠখণ্ডকে দড়ি দিয়ে চারদিকে বুনট করা হ'ত। ঠিক একটি মাঝারি বলের মত দেখতে হ'ত—উপরে শক্ত দড়ির আবরণ নাম ছিল ঢোপ। মাঝারি ধরনের বাঁশের গোড়ালি কেটে 'ঢোপ'-এর লাঠি বানানো হ'ত—কতকটা হকি স্টিকের মত। প্রতি দলে সমসংখ্যক খেউরি (১০-২০) জুটে বলকে হকির গোলের মতই একটি নির্দিষ্ট বেষ্টনীর মধ্যে নিতে হ'ত—বেষ্টনী করা হ'ত

সাধারণ ছোট খুটি গেড়ে বা শুধু ঢিলা বসিয়ে। বেশ জমতো খেলাটি। অনেকে ঢোপের লাঠির বেশ বাড়িও খেত—কিন্তু আনন্দ ছিল। এই খেলাটি সম্ভবতঃ দীর্ঘদিন থেকেই প্রচলিত ছিল।

শুধু মাটিতে নয়—গাছেও খেলা হ'ত।

এমনি একটি খেলার নাম ছিল 'আম পাকা'। নিচে মাটিতে একটি বৃত্তের মধ্যে মাটিতে পা দিয়ে দাগ দিয়ে বৃত্ত বানানো হ'ত, হাতে থাকতো আমের একটি পত্রগুচ্ছ। একদল গাছে উঠে বলতো ; আম পেকেচে'। আর নিচের জন যাকে বলা হ'ত 'আমচোর'—(কে চোর হত তা' হাতের আঙ্গুল ধরে ঠিক হ'ত)—যে কড়ে আঙ্গুল ধরবে সে-ই চোর আর চোরের কাজ হবে সে গাছের উপরের কাউকেই নিচে নামতে দেবে না—ছুঁয়ে দিতে পারলেই তার চোর জীবনের সমাপ্তি। যাকে ছুঁয়ে দেবে সে-ই চোর। ইতিমধ্যে যারা যারা নিচে নেমে আমপাতায় চুমো খেতে পারতো তাদের জিৎ। অর্থাৎ এক পাট্টি হ'ল। আবার তারা গাছে উঠবে এইভাবে যে যতবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে আমপত্র চুমা দিতে পারবে তার ততবার জিৎ। শুধু কি বৃক্ষে? শুধু কি স্থলে ; জলেও ছিল খেলা। ছেলেরা সাধারণতঃ স্নান করতে গিয়ে এ খেলা খেলতো। এর একটির নাম ছিল 'নলছিটি'। পুকুরে গিয়ে একদল সাঁতার দিত আর বলতো 'নলছিটি'। সমসংখ্যার অন্যদলকে—তাদের যে কোন কাউকে ছুঁতে হ'ত। ছুঁয়ে দিলেই সে মৃত। এমনি করে সবাই 'মৃত' হলে অন্যদল আবার 'নলছিটি' দিত। এ খেলায় প্রচুর সন্তরণ কৌশল এবং ডুব সাঁতার কৌশল জানতে হ'ত। অনেক সময় খেলা একদিনে দু'এক ঘণ্টায় শেষ হ'ত না পরদিন বা তার পরদিন চলতো স্নানের সময়। 'নলছিটির' সঙ্গেই ছিল, 'তাই তাই'। একটি কচুরিপানার ডগা পানিতে রেখে চারদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়াতো ছোট ছোট ছেলে অথবা মেয়েরা। তারপর 'তাই তাই' বলে খুব ঘন ঘন হাত দিয়ে পানিতে থাপড়ানো হ'ত। কোথায় চলে যেত কচুরির ডগা। তাকে খুঁজে বের করে যে আগে আনতে পারে তারই জিৎ। ক্রমাগতঃ তিনবার আনতে পারলে সে রাজা। দু'বারে 'মন্ত্রী' আর একবারে শুধু 'শহরের কোটাল' বা কোতোয়াল। রাজা মন্ত্রী কোটালেব বর্ণনা থেকে মনে হয় খেলাটি খুব প্রাচীন।

ঘরের ভেতরেও ছিল খেলা। মাটিতে দাগ কেটে হত 'ষোলগুটি বাঘচাল'। সুন্দর একটি আয়তক্ষেত্র মধ্যে দাগ, আবার দুই দিকে দুইটি ত্রিকোণ, ষোলটি গুটি যা সাধারণতঃ মাটির পাতিল ভাংগা কয়লা বা পাট শোলা বা তেঁতুলেব বীচি দিয়ে তৈরী হ'ত। দুই দিকে অবশ্য দুই রকম। কিছুটা দাবা খেলার মত। মোট কথা বাঘকে বন্দী করতে হ'বে। বাঘ একটি গুটি খেতে পারবে যদি ফাঁক পায় কিন্তু দু'টি নয়। মনে হয় খেলাটি ব্যাঘ্র বহুল অরণ্য অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে প্রথমে প্রচলিত হয়—এ খেলা আদিবাসীদের মধ্যে এখনো আছে—তাদের কাছ থেকে সম্ভবতঃ নিয়েছে অপেক্ষাকৃত সভ্য মানুষেরা। আর ছিল পাশা খেলা প্রায় ঘরে ঘরে। কড়ি আনা হ'ত দোকান থেকে কিনে। চারটি কড়ি এক সঙ্গে উপুড় হয়ে পড়লেই খেলা শুরু হ'ল 'ছক্কা' অর্থাৎ চার। আবাব সব উপুড় হ'ল না—এবারে হাতে টোকা দিয়ে লাগলে আবার দুই। এভাবে কুড়ি হ'লে খেলা শেষ। এ খেলা ১+১=দুইজনে বা ২+২=চারজনেও খেলতে পারে। যে পর্যন্ত ছক্কা না হবে সে পর্যন্ত এক পক্ষ খেলা শুরু করতে পারবে না। দেখা গেছে এক দলের ২০ হয়ে গেছে কিন্তু অন্যদল 'ছক্কার' বাঁধাই উৎরাতে পারে নাই। সুন্দরভাবে সেলাই করা কাপড়ের দানেও (দাইন) এ খেলা খেলতে দেখেছি—খেলা একইরূপ—এখানে মুখে হিসাব না করে একটি নির্দিষ্ট গুটি ২০-এর ঘর পর্যন্ত যায়। আমরা-।

খেলেছি সচিত্র 'গোলক ধাম'। ছাপানো কাগজ। ছবি আঁকা। একই ভাবে। তবে পাশাটি যদি পড়তো 'সাপের মুখে'—আবার গুটি ঘুরে আসতো নীচে। আবার হয়তো প্রায় 'গোলক ধাম' মানে স্বর্গলোকের কাছে গিয়ে পড়ে যেত 'রাক্ষসের' মুখে আর একদম নীচে চলে আসতো।

অর্থাৎ 'গোলক ধামে' পৌঁছা সহজ ছিল না—পথে অনেক বাধা লোভ-মোহ-মাৎসর্য ইত্যাদি। খেলাগুলি কিন্তু লোক-শিক্ষাও দিত কম নয়। পাশা খেলতে দেওয়া হ'ত নববধূকে —একদিকে বর অন্যদিকে নববধূ। বেশ কিন্তু জমতো। সঙ্গে ছিল পাড়ার 'গিতালী' বা দাদী-নানীদের গীত : গাঙ্গের কূলে ভাঙ্গের গাছ লো ও কইনা (কন্যা) লো চিরল চিরল পাতানারে; তারির তলে তারির তলে গো ও কইন্যা গো খেলো রঙের পাশা নারে।...

বিবাহিত দম্পতির সমস্ত সংসারটাই ত' পাশা খেলার মত। এই খেলায় কেউ জয়ী হয়—কেউ হেরে যায়। সেদিক বিচারে এই পাশা খেলাগুলির একটি বিশেষ অর্থও ছিল বৈ-কি !

খেলার কি শেষ ছিল ! ছিল ডাংগুটি খেলা। একটি বাঁশের ডাং দেড়-দুই হাত লম্বা—থাকতো বাঁশের তৈরী দুই বা চার ইঞ্চি পরিমাণ বস্তু (টন্‌কি) যাতে ডাং দিয়ে বাড়ি দেবে জোরে। একজন ছুঁড়ে দেবে খেলোয়াড়ের বৃত্তের দিকে। বাঁশের ডাং দিয়ে প্রত্যাঘাত করে দূরে উড়িয়ে মারবে। তারপর কতদূর গেল টন্‌কি ডাং দিয়ে দেখবে। মাপার অঙ্ক হ'ল অরি (হরি), ধরি, তিন ধরি, চারা বাড়ি, চম্পা, ঢেক, সুঢেক। এই মাপটি ৭-এর অঙ্ক দিয়ে যে অনার্যদের কাছ থেকে এসেছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ খেলাটিও। এখনো গ্রামে হিন্দুরা মাপতে হরি (অরি) বা 'রাম' শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করে। মুসলমানেরা 'আল্লা' বা রসুল বলে। খেলা ছিল ঘুড়ি (ঘুড্ডি) নিয়ে। কত রং-বেরং-এর ঘুড়ি যে তৈরী হ'ত। কোনটি পূর্বোক্ত পতেঙ্গা (হরতনের মত দেখতে), ঘুড্ডি (পাখীর মত), ফেচকা (ফচ্‌কো পাখীর মত), সাপা (সাপের মত) বাক্স, (বাক্সের মত), মানুষ (মানুষের মত) এবং চং। চং ছিল একটি আয়ত-ক্ষেত্রের মত। বাঁশের খাঁচার উপর লাগানো হ'ত কাগজ। উপরের দুই দিকে দুইটি কাপড়ের নিশান। নিচে কাপড়ের দু'টি লেজ। কাপড়ে বা উপরের দিকে বাঁকানো হ'ত একটি পাতলা বেত দিয়ে। বেতের টানায় বাতাস লেগে শব্দ হ'ত সুন্দর। বহুদূর থেকে শোনা যেত সে শব্দ। চং ঘুড়ি অনেক সময় মানুষ সমান বড় হ'ত। বেশ মোটা দড়ির ডোর দিয়ে তা উড়াতে হ'ত। ডোর ধরে রাখা অনেক সময় শক্তির ব্যাপার ছিল। ছোটদের ত' ছেচড়িয়ে নিয়ে যেত। অনেক সময় ঘুড়িতে ঘুড়িতে পাল্লা হ'ত। ডোরে ডোরে কাটাকাটি খেলা হ'ত। রং-বেরং-এর ঘুড়িতে ঘুড়িতে পল্লী বাংলার আকাশ ছেয়ে যেত। অনেক সময় চং ঘুড়িতে মালিকের নাম এবং গ্রামের নাম লেখা থাকতো। বহুদূর থেকে দেখা যেত। ঝড়ের সময় কোন ঘুড়ি দড়ি বা সূতা ছিঁড়ে বহু মাইল চলে যেত। মালিক খবর পেয়ে নিয়ে আসতো গিয়ে তার সখের বস্তুটিকে।

অন্য একটি খেলার কথা মনে পড়ছে। এটি ঘরের বাইরে বা ভিতরে যে-কোন স্থানে হ'তে পারতো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পরস্পরের হাত ধরে যথাসম্ভব গোলাকারভাবে ছড়িয়ে ছড়াটি আউড়ে যেত :

কি কথা? বেঙের মাথা। কেমন বেঙ? সরু বেঙ॥ কেমন সরু? মিহি সরু? কেমন মিহি? তাঁতির তিহি॥ কেমন তাঁতি? বামন তাঁতি॥ কেমন বামন? ভাট বামন॥ কেমন

ভাট? আচ্ছা ভাট॥ কেমন আচ্ছা? বাঁদর আচ্ছা॥ কেমন বাঁদর? বনের বাঁদর॥ কেমন বন? সুন্দর বন॥ কেমন সুন্দর? খোকার মতন॥ কেমন খোকা? আচ্ছা খোকা॥ এই খোকাটি কাদের? কপাল ভালো যাদের॥

সাধারণতঃ একজন বালক বা বালিকা একটি পংক্তিই বলতো। সকলে সম্মিলিতভাবে আবার সেই পংক্তিটিরই পুনরাবৃত্তি করতো। এমনিভাবে প্রতিটি ছেলেমেয়ে এক একটি করে শেষ পংক্তিটিতে যাবে। শেষ পংক্তিটি যার পালায় আসবে সে-ই ভাগ্যবান। সবাই মাটি থেকে দুর্বা তুলে তার মাথায় দেবে এবং ধান-দুর্বা দিয়ে তাকে বরণ করছে এই ভাব দেখাবে। অনেক সময় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা যদি বেশি হয় তবে যে পর্যন্ত না ছড়াটি প্রতিটি বালক-বালিকার আবৃত্তি করা শেষ হবে সে পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং শেষের জনই হবে ভাগ্যবান। এই পর্যায়েরই আরেকটি খেলা তাতে কিন্তু বেশ নাটক ছিল। আমোদ ত' ছিলই। সাধারণতঃ কৃষক সমাজেই খেলাটি প্রচলিত ছিল বেশি।

একটি ছেলে বুড়ো এবং অন্যজন মেয়েদের শাড়ী পরে 'বুড়ী' সাজতো, তারপর চলতো নাটক। বুড়ার হাতে থাকতো পাঁচন বা ছোট বেত।

বুড়া : ভাত রাইন্ধা দিবা তুমি। হাল বাইতে যামু আমি॥

বুড়ী : ভাত রান্ধতে পারমু না। বাপের বাড়ী যাইমুগা॥

বুড়া : বাপের বাড়ী যাইবা তুমি। চুল ধইরা আনমু আমি॥

বুড়ী : চুল ধইরা আনবা তুমি। খাম ধইরা থাকমু আমি॥

বুড়া : খাম ধইরা থাকবা তুমি। কান ধইরা আনমু আমি॥

বুড়ী : কান ধইরা টান্‌বা তুমি। থুথু দিয়া পলাইমু আমি॥

বুড়া : থুথু দিয়া পলাইবা তুমি। চুল ধইরা টানমু আমি॥

বুড়ী : চুল ধইরা টানবা তুমি। আগুনে পুইড়া মরুম আমি॥

বুড়া : আগুনে পুইড়া মরবা তুমি। তোমার সাথে মরমু আমি॥

বলা নিষ্প্রয়োজন, এ খেলাগুলি সনাতন পল্লী বাংলার চিরন্তনী কৃষক জীবনের মিলন-বিরহের চিত্রে রসমধুর। এ ছাড়াও ছিল 'কানা মাছি' বা 'চোখ বাঁধা' খেলা। একজন হ'ত চোর-চোরকে ছুঁতে হ'বে অন্যজনকে। ছুঁয়ে দিলে সে হ'বে চোর। একজন পাশ্চাত্য লোকবিজ্ঞানীর আলোচনায় পড়েছিলাম, অতীত দিনের চোরের কোন শাস্তির প্রচলিত প্রথার সঙ্গে এসব খেলার যোগসূত্র থাকতে পারে। আর খেলাটি সুদূর ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল প্রভৃতি বহু দেশেই প্রচলিত আছে। ছিল কোটবন্দী খেলা। মাটিতে ৪ ফুট ×১০ ফুট দাগ দিয়ে ৫টি ঘর করা হ'ত। একটি ঘর কাটা। খেলোয়াড়কে এক পায়ে একটি ভাঙ্গা পাত্র বা পাতিলের (মাটির বা স্ফটিকের) গোলাকার চাকতিকে শেষ দাগে নিতে হ'ত। অন্য পা মাটিতে ছুঁলে সে মৃত। চাক্‌তি কাটা ঘরে পড়লেও মৃত। এতে পায়ের ব্যায়াম হ'ত খুব। এবং বাধাকে অতিক্রম করারও প্রেরণা ছিল। আধুনিক যুগের ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল প্রভৃতি খেলাও এখন গ্রামে প্রচলিত।

খেলাধুলার মধ্যে প্রাচীন বহু বিশ্বাসের জেরও আবিষ্কার করা যেতে পারে। এমনি একটি খেলা ছিল 'ভাড়া-ভূঁড়া' বা 'ভালা-বুঢ়া' খেলা। সাধারণতঃ কার্তিকের শেষে অথবা চৈত্র সংক্রান্তির দিনও—বৎসরের শেষে এ খেলাটি হ'ত। গ্রামের ছেলেরা 'পাট-শোলার' 'বুন্দা' বাঁধতো—তারপর সেই পাটশোলায় আগুন ধরিয়ে তারা গ্রাম পথ-ঘাট-মাঠ প্রদক্ষিণ করতো —আগুনের বুন্দায় ভরে যেত চারদিক—গ্রামের পর গ্রাম-মাঠে-মাঠে শুধু আগুনের কুণ্ডলী—তারা ছড়া কাটতো—'ভাড়া (ভালা) আসে ভূড়া (বুঢ়া) যায়—বোছা কান মশায় খায়।'

হ'তে পারে প্রাচীন কোন বিশ্বাস-গ্রাম থেকে ভূত-প্রেত, বালা-মসিবত অথবা নিতান্ত অতি প্রয়োজনীয় মশকের উপদ্রব তাড়ানোর সঙ্গে এর একদা যোগসূত্র ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা' নিতান্তই হল বর্ষাশেষের বা বর্ষশেষের একটি প্রচলিত আনন্দ-উৎসব—পুরাতনকে বিদায় করে দিচ্ছে, আসুক নতুন।

চৈত্র সংক্রান্তির সময় মেলা বসতো গ্রামের নানা গঞ্জে হাটে। আসতো পল্লী শিল্পীর কতো খেলনা—হাতের তৈরী জিনিস। মেলার আকর্ষণ ছিল, পূর্বেই বলা হয়েছে, ঘোড়দৌড়। এজন্য বহুস্থানে মেডেলও ঘোষণা করা হ'ত। এখনো চোখ মুদলে দেখতে পাই গ্রাম বাংলার ঘোড়-সওয়ারের দল ছুটে চলেছে---পেছনে উড়ছে চৈত্রের পিঙ্গল ধুলি-ছুটছে বাংলার বেগবান ঘোড়া-তীব্র বেগে অতীত বর্ষের সব হতাশা নিরাশাকে পেছনে ফেলে। ঈদের পরেও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা দেখেছি। একই ভাবে। ছিল গরু দৌড়। ছিল কুকুরের লড়াই। ছিল মোরগের লড়াই। এজন্য গ্রামবাসী তাদের রীতিমত ট্রেনিং দিত। গরু বা কুকুরকে মাঠে এনে লেজ মুড়িয়ে ক'দিন দৌড় করাতো। এতেই সেগুলি শিখে যেতো যে, এবারে-মালিক দৌড়াতে বলছে। মালিকের কথা যেন তারা বুঝতে পারতো।

সখের খেলা বা আমোদের বস্তুর সঙ্গে নাম করতে পারি কবুতরের খেলার কথা-বিশেষ করে 'বাজিকর কবুতরের' খেলা। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই কবুতর পোষা হ'ত। বাজারে একরূপ ঝুনঝুনি জাতীয় রিং পাওয়া যেত। সেগুলি লাগিয়ে দেওয়া হ'ত সখের কবুতরের পায়ে। কবুতরগুলি 'বাকুম বাকুম' 'বাক্-বাকুম' শব্দ তুলে যখন ঘরের দাওয়ায় অথবা চালে ঘুরে বেড়াতো চমৎকার শব্দ হ'ত। উড়ার সময় এবং নিচে নামার সময়ও শব্দ হত ঝনঝন্... ঝুনঝুন...। কবুতরগুলি মধ্যে মধ্যেই দল বেঁধে আকাশে 'কাওয়া' দিত—এক ঝাঁক ফুলের মত মনে হ'ত নীল আকাশে। অনেক সময় জোড়াবিহীন এক পাড়ার কবুতরের সঙ্গে আরেক পাড়ার কবুতরের। বিয়েও দেওয়া হ'ত। এই উপলক্ষে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশ আনন্দ হাসিও হ'ত। ভিন পাড়ার মেয়ের সঙ্গে এই পাড়ার মেয়ের হ'ত বিয়েন সম্পর্ক। আর ভিন পাড়ার ছেলে হ'ত এ পাড়ার ছেলের বিয়াই। পাখীর সূত্রে মানুষে মানুষে এই আত্মীয়তা তাদের দয়া মায়া এবং মহত্ত্বের শিক্ষা দিত। ছিল কোড়া, ডাহুক, ঘুঘু এবং বেজী পালকদের শিকার খেলা। সৌখিন গৃহস্থ শিকারী সখ করে কোড়া ধরে বা কিনে আনতো পোষা কোড়াকে ; শিকারের সব কলাকৌশল তালিম দেওয়া হ'ত। মাঠে যেখানে অন্য বুনো কোড়া আছে পোষা কোড়াকে খাঁচার মধ্যে রেখে চারদিকে ফাঁদ পাতা হ'ত—গ্রামীণ ভাষায় এই ফাঁদের নাম 'ঠাট্‌কি'। খাঁচার কোড়ার অবিরাম যুদ্ধংদেহি 'টাব-টাব-টাব' ডাক শুনে বুনো কোড়া তার সাথে যুদ্ধ লড়তে আসতো। আসতেই ঠাঁট্‌কিতে আটকা পড়ে যেত। কোন কোন সময় পোষা কোড়াকে ছেড়েও দেওয়া হ'ত। বুনো কোড়ার কাছে গিয়ে সে পা দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে

বাখতো। শিকারী তখন গিয়ে বুনো কোড়াকে ধরে আনতো। বুনো ও পোষা-কে চেনার ভুলে অনেক সময় দুর্ঘটনাও ঘটে যেত। শিকারীর তখন আর মনঃস্তাপের অন্ত থাকতো না। ডাহুককে দিয়ে বুনো ডাহুক শিকারের কৌশলটিও ছিল একরূপ।

ঘুঘুকেও খাঁচার মধ্যে রাখা হ'ত। খাঁচার সামনে বারান্দার মত স্থানে জাল দিয়ে ফাঁদ পাতা হ'ত। পোষা ঘুঘুকে বসিয়ে দেওয়া হ'ত খাঁচাসহ কোন গাছের ডালে। পোষা অবিরাম ডেকে চলেছে ঘু ঘু ঘু... আর বুনো ঘু ঘু ঝগড়া করতে এসে বসতো খাঁচার বারান্দায় আর অমনি জালের হুড়কা টান লেগে সেটি হতো জালে আবদ্ধ।

পোষা বেজীর খেলাটি ছিল খুব রোমাঞ্চকর। বাড়ীর কোন স্থানে সাপ আছে টের পাওয়া গেলে বেজীকে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ত। সে নিজেই খুঁজে বের করত কোথায় সাপের আস্তানা। সাপকে অবিরাম ভেংচি দিয়ে দিয়ে বের করত গর্ত। তারপর লেগে যেত যুদ্ধ—যুদ্ধ যাকে বলে 'অহিনকূলের' যুদ্ধ। সাপের ছোবল খেয়ে নকুল মহাশয় প্রায়ই ছুটে যেত বাইরে। কোন এক নির্দিষ্ট গাছের শিকড় খেয়ে (এই গাছটি তার আগেই জানা থাকতো—অন্যান্য লোকরাও গাছটি চিনতো এবং সর্প দংশনের পর খেলে ভালো হ'বে বিশ্বাস করতো) আবাব এসে লাগাতো যুদ্ধ। আমি নিজে একবার এমন একটি যুদ্ধ চাক্ষুষ দেখেছিলাম। বেজীর সে-কি লম্ফ-ঝম্প ! সাপে ছোবল দিচ্ছে আর বেজী এক লম্ফে অন্যদিকে। আসলে সাপের থেকে বেজীর সম্ভবত ছিল প্রাণ-চাঞ্চল্য আর শারীরিক শ্রান্তিহীনতা দীর্ঘকাল স্থায়ী। সাপ হযতো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তো। আব তার এই ক্রমাগত শ্রান্তির এক ফাঁকে সে সাপের পিঠে বা মাথায় দাঁত বসিয়ে দিত। শোনা যায নেউলের দাঁতও বিষাক্ত। এসব অহি-নকুলের যুদ্ধ দেখতে অনেক সময় নিরাপদ দূরে ভিড় জমে যেত। সর্প মহারাজ একবার যুদ্ধে নামলে—ফেরেনই বা কেমন করে। বিশেষ কবে ফিরতে গেলেই যে বিপদ—নির্ঘাত মস্তকচূর্ণ বা পৃষ্ঠদেশে দংশন ! শেষ পর্যন্ত নকুলেরই কিন্তু জয় হ'ত। আর সাপটা মরে পড়ে থাকতো। এই সঙ্গে ছিল বানরের খেলা।

বানর ছানাকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে আস্তে আস্তে পোষ মানানো হ'ত। ক্রমে এমন হ'ত যে সে-যেন তার মালিকের সব কথাই বুঝতে পারতো। বাজনার তালে নৃত্য—ভাড় কাঁধে শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ইত্যাদি বহুবিধ খেলা শিখিযে মালিক বাজার বা গ্রাম্য মেলায গিয়ে দু-পয়সা উপার্জনও করতো। আমি এক বানরের কথা শুনেছিলাম সে চাষীর আম-জাম-লিচু গাছ পাহাবা দিত। কেউ ফল চুরি করতে এলে ভযানক কিচিরমিচির শুরু করতো—মালিককে ডেকে আনতো—অনেক সময় দাঁত ভেংচিযে চোরকে আক্রমণ করতে যেত। হাজার হলেও আমাদেবই পূর্বপুরুষ ত' ! কাজেই বুদ্ধি ত' কিছু থাকারই কথা ! আমাদেরই পাহাড়ী অঞ্চলে আমুয়াবাদ গ্রামে এক শিক্ষাপ্রাপ্ত বানর শাদীর মহফিল থেকে নওশার জুতা, পাগড়ী এবং বরযাত্রীদেব জামা কাপড় ইত্যাদি অন্যত্র সরিয়ে এবং নওশার পাগড়িটি শেষ পর্যন্ত মাথায় পরে (অবশ্য মালিকের ইঙ্গিতে) বৃক্ষশাখে উঠে শাদীর মহফিলে এক অপূর্ব হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত কদলি ঘুষ দিয়ে আমাদের সে পাগড়ি উদ্ধার করতে হ'ল।

এছাড়াও ছিল পোষা টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি। শিক্ষার গুণে পাখীগুলি এক সময় যেন বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মতই কথা বলতো। আমার নিজেরই টিয়া, ময়না ছিল। সকাল হ'লে কি সুন্দর আধো আধো বোলে ঘাড় কাত করে ডাকতো 'আল্লা বল'—'রসুল বল'।

বাড়ীতে আত্মীয় মেহমান এলে বলতো, 'ইষ্টিকুটুম—বসো–বসো—পান খাও—তামাক খাও'। আমাদের পাশের গ্রামে বৈষ্ণবদের কয়েকটি টিয়া ছিল। তারা সকাল দুপুরে বিকেল অনবরত বলতো 'রাধা–কৃষ্ণ...কৃষ্ণ বল'। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার এই পোষাপাখীগুলিকে ছেড়ে আমাকে যখন ময়মনসিংহ শহরে পড়তে পাঠানো হ'ল তখন কিশোর মনের সেই মনোযন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। প্রতিটি পত্রেই বাবা–মাকে বলতাম আমার টিয়া, ময়না কেমন আছে ! তাদের যেন দুধ কলা ছোলা নিয়মিত দেয়া হয়। ছুটিতে এলে সবার আগেই দেখতে যেতাম তাদের। আমি যেন বুঝতে পারতাম আমাকে ফিরে পেয়ে তারাও খুশি ! অবিরাম দুই পাখা তুলে 'কে–কে' করে তারা আমায় অভ্যর্থনা জানাতো। নদীর কুলু–কুলুধ্বনি, বাতাসের শন্ শন্, গোলা বোঝাই ধান, খেত ভরা ফসলের প্রাচুর্য, অজস্র লোকায়ত উৎসব আর সংগীতের সঙ্গে পাখিদের এই গান ও কথাও যেন মিলে গিয়ে একটি লোকায়ত ঐক্যসংগীত সৃষ্টি করতো। সে সংগীতের দোলা লাগতো গঞ্জের ঘাটে বটতলায় পড়ে থাকা প্রাচীন রথ, দেব–দেউল মন্দির–মস্‌জিদ আর দরগাগৃহের চূড়ায়।

এ ছাড়াও ছিল আরও বিভিন্ন খেলাধুলা—যার সঙ্গে ছিল অতীত ইতিহাসের—অতীতের উৎসব–অনুষ্ঠান–আচার–অনুষ্ঠান বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির সহঅবস্থান বা ভাবের আদান–প্রদানের অলিখিত ইতিহাসের যোগসূত্র।

লোকপুরাণ

ওয়াকিল আহমদ

বাংলা লোক-পুরাণ ও ঐতিহ্য চেতনা

সাধারণভাবে অবিশ্বাস্য কাল্পনিক কাহিনীকে পুরাণ বলা হয়। রূপকথাও অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক কাহিনী। পুরাণ প্রধানতঃ দেব-কাহিনী ; দেবতা, অর্ধদেবতা বা দেবকল্প বীরের জীবন-কাহিনীই পুরাণের কাহিনী। পুরাণ ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার-জাত। রূপকথার নায়ক মুখ্যত মানব-সন্তান ; সে দেবতার সহায়তায় অথবা মন্ত্রবলে অথবা নিজ চরিত্রগুণে অসাধ্য সাধন করে সফল হয়। রোমাঞ্চকর গল্পরস পরিবেশন রূপকথার প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং পুরাণ ও রূপকথার অন্তর্নিহিত পার্থক্য হল ধর্মরস ও গল্পরসের পার্থক্য। দেবকথার সেই অংশ পুরাণ যাতে সৃষ্টি-রহস্য ও চরিত্র-ব্যাখ্যা আছে। 'শূন্যপুরাণে' ধর্মঠাকুর এবং 'পদ্মাপুরাণে' মনসাদেবীর জন্ম-জীবন-চবিত্র ও দেব-দেবীদের বিবরণ আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষিত কবি এক ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ঐ সব পুরাণ রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় পুরাণ এবং গ্রীক-ল্যাটিন ভাষায় ইউরোপীয় পুরাণ বেশ প্রাচীন কালে রচিত হয়েছে। কোন কোন পুরাণের উৎস লোককাহিনী সন্দেহ নেই, কিন্তু যে যুগে তা গ্রন্থীবদ্ধ হয়, সে-যুগের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রূপকথা জাতীয় লোক-কাহিনী আবহমানকালের, যুগে যুগে রূপ পাল্টালেও তা মূলকে ত্যাগ করে না। ধর্ম, সংস্কার ও নীতিকথা আশ্রিত লিখিত পুরাণগুলি এক এক জনগোষ্ঠীর কাছে শাস্ত্রীয় মর্যাদা পেয়ে আসছে। সংস্কৃত পুরাণ ও গ্রীক পুরাণ এ-ধরনের প্রাচীন শাস্ত্র-কথা।

ধর্মবিশ্বাস, যাদুবিশ্বাস ও লোক-সংস্কার নিয়ে রচিত পুরাণের অলিখিত মৌখিক ধারা বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত আছে। এ-শ্রেণীর গল্প বা কাহিনী ইংরাজীতে Myth নামে পরিচিত। বাংলায় Myth-এর উপযুক্ত পরিভাষা বা প্রতিশব্দ নেই। পূর্বসূরীদের আলোচনায় প্রাচীন ইতিহাস, কিংবদন্তী ইত্যাদি নিয়ে রচিত শাস্ত্র, লৌকিক পুরাণ, পুরাকাহিনী, অতিকথা, কোনও দেশের বা জাতির অতিপ্রাচীন কাহিনী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। প্রতিটি Myth-এ একটি গল্প আছে। লোক-মুখে তা কথা বা কাহিনী রূপে পরিচিত। Myth লোক কাহিনীর প্রাচীনতম শাখা ; এই কারণে পুরাকাহিনী পুরাকথা শব্দের ব্যবহার যুক্তিসংগত। লৌকিক পুরাণ বা লোক-পুরাণ সমার্থক শব্দ। পুরাণ আখ্যানাশ্রিত রচনা ; অতিপ্রাকৃত ঘটনা বা কোন চরিত্রের অতিরঞ্জিত রূপায়ন যখন ঐতিহ্যগত বর্ণনা রীতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিষয়ের উপর আরোপিত হয় তখন তাকেই বলে পুরাণ। একটি বাংলা অভিধানে Myth-এর প্রতিশব্দ 'অতিকথা' করা হয়েছে। সাধারণের মৌখিক সাহিত্যকে যেমন লোক-সাহিত্য বলা হয়, মৌখিক পুরাণকে তেমনি 'লোক-পুরাণ' বলা যায়।

নিছক গল্পরস সৃষ্টির জন্য লোক-পুরাণ রচিত হয় না। প্রতি গল্পে আদিম মানুষের কোন না কোন কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা থাকে। বিশ্বের তাবৎ প্রাণী বা বস্তুর, লৌকিক-অলৌকিক ঘটনা বা ক্রিয়ায় জন্ম-উৎপত্তি কেন হল, কিভাবে হল এবং কিরূপ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লাভ করল সেসব নিয়ে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাকে লোক-পুরাণ বলা হয়। আদিম মানুষের বস্তু-জ্ঞান না থাকায় এসব জীব-জড় বস্তুর এবং লৌকিক ও নৈসর্গিক ঘটনা ক্রিয়ার অন্তরালে দৈবশক্তির প্রভাব আছে—এরূপ বিশ্বাস করা হত। লোক-পুরাণ সনাক্ত করার সহজ উপায় হল আদিম মানুষের ধর্ম-যাদু বিশ্বাস ও লোকসংস্কারযুক্ত কথা বা কাহিনীকে চিহ্নিত করা। পৃথিবীটা একটি মহিষের শিং-এর উপর আছে। যখন সে এক শিং বদল করে অন্য শিং-এ পৃথিবীকে ধারণ করে তখন ভূমিকল্প হয়। ভূমিকম্প একটি নৈসর্গিক ঘটনা। ভূমিকম্প কেন হয়—এখানে তার ব্যাখ্যা আছে। চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য গ্রহণ কেন হয়? রাহু নামক দৈত্য মাঝে মাঝে চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে, কেননা দেবতাদের সাথে সে যখন সুমদ্র-মন্থনজাত অমৃত পান করছিল তখন চন্দ্র ও সূর্য তারে চিনতে পেরে বিষ্ণুকে বলে দেয়। বিষ্ণু তাঁর চক্র দ্বারা, রাহুর মুণ্ড ছেদন করেন। কিন্তু অমৃত ধারণ করায় তার মৃত্যু ঘটেনি। রাহু চন্দ্র বা সূর্যকে গ্রাস করলেও যেহেতু তার মুণ্ড কাটা সেহেতু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা বেরিয়ে আসে। চন্দ্র ও সুর্য গ্রহণের কার্যকরণ সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষ এরূপ অবাস্তব গল্পের জন্ম দিয়েছে। চন্দ্র সূর্য কিভাবে জন্মগ্রহণ করল, তারও কাল্পনিক গল্প আছে। চন্দ্র-সূর্য দুই ভাই; একদিন দুই ভাই নিমন্ত্রণ খেতে গেলে তাদের মা নিমন্ত্রণের মাংস আনতে বলে। সূর্য বড় ছেলে; লজ্জাবশত সে মাংস আনতে পারেনি। চন্দ্র ছোট সে খাওয়ার সময় কিছু মাংস কাপড়ে লুকিয়ে রাখে এবং তা এনে মাকে খেতে দেয়। মা সূর্যকে অভিশাপ দেয় যে সে জ্বলে-পুড়ে মরবে আর দুনিয়ার মল-মূত্র শুকাবে। চন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বলে যে সে স্নিগ্ধ আলো বিতরণ করবে এবং সকলের সমাদর লাভ করবে (নিজস্ব সংগ্রহ)। জাগতিক ও নৈসর্গিক বস্তু ও ঘটনার জন্ম-রহস্য ও চরিত্র-ধর্ম ব্যাখ্যা সম্বলিত এসব কাহিনী প্রকৃতপক্ষে পুরাকাহিনী বা লোক-পুরাণ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। শেষোক্ত মূল গল্পটি সামাজিক। এতে একটি পারিবারিক চিত্র আছে—মাতৃভক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে মায়ের অভিশাপ ও আশীর্বাদ মটিফ হিসাবে কাজ করেছে। স্টিথ থমসনের মটিফ নির্ঘণ্টে এটি 'এন' অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত। মানব সন্তানের চন্দ্র সূর্যের রূপান্তর গ্রহণ ও একটি মটিফ—Transformation of Soul' বা আত্মার রূপান্তর হল এর মটিফগত বৈশিষ্ট্য। এটি 'ডি'-মটিফ যা যাদুবিশ্বাস থেকে উদ্ভুত হয়। সুতরাং আঙ্গিক ও চেতনায় এটি পুরোপুরি লোক-পুরাণের অন্তর্গত।

কুসুম পাখি বা হলুদ পাখির জন্ম-রহস্য নিয়ে একটি গল্প আছে। এক গৃহস্থের বাড়িতে কুটুম্ব বা আত্মীয়-অতিথি এসেছে। শাশুড়ি বধূকে ভাল করে রান্না করতে বলেছে। কিন্তু তার রান্নায় ভাল দক্ষতা ছিল না। সে ব্যঞ্জনে বেশি করে হলুদ দিয়ে ফেলেছে, সে-রঙ আর দূর হয় না। বধূটি লজ্জার ও অপমানের ভয়ে ব্যঞ্জনসহ হাঁড়ি মাথায় ভেঙ্গে দিয়ে হলুদ বর্ণের এক পাখির রূপ ধারণ করে উড়ে যায়। হাঁড়ির তলায় কালি ছিল—তাই তার মাথার রঙ কাল। আর কুটুম্বের জন্য এই দশা—তাই 'ইস্টি কুটুম', ইস্টি কুটুম' বলে সে ডাকে (বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ১৯৬২, ৬৪৪)। এটি এদেশে বহুল প্রচলিত একটি গল্প। অনুরূপভাবে 'কানাকুয়া' বা 'পুতপুতি' পাখি, 'সাত ভাই' পাখি, 'হাঁড়িচাচা', ঘুঘু কাক

প্রভৃতির জন্ম ও চরিত্র জ্ঞাপক গল্পও প্রচলিত আছে। হলুদ পাখির গল্পেও পারিবারিক চিত্র আছে। এখানে এক অদক্ষ বধূর দুর্গতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শাশুড়ির গঞ্জনা, বধূর আতঙ্ক-লজ্জা গল্পের অন্তরালে অনুভব করা যায়। নারীর পাখিতে রূপান্তর 'ডি' মটিফের সূত্রানুসারে হয়েছে।

স্বামী প্রতিদিন কই মাছ ধরে আনে। তার স্ত্রী ছেলেকে মাথা খেতে দেয়, স্বামীকে দেয় না। একদিন ছেলেকে মাছ ধরার নাম করে বিলে নিয়ে গিয়ে সে তাকে ডুবিয়ে হত্যা করে। একা ফিরে এসে কই মাছের মাথা খেয়ে দেখে যে তাতে সারবস্তু তেমন নেই। সে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীর কাছে অপরাধ স্বীকার করে এবং মনোদুঃখে 'পুত পুত' বলতে বলতে বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রীও তাকে অনুসরণ করে। পাখি রূপে সেই থেকে তারা পুত পুত রবে ডাক ছাড়ে (ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন, ১৯৭৪, ৩৮১)। এখানেও পরিবারের চিত্র : লোভ ও ভুলের মাশুল দিয়ে স্বামী-স্ত্রী পাখিতে পরিণত হয়েছে। গল্পগুলি এদেশের মাটি থেকে জন্ম লাভ করেছে—এদেশের পশু-পাখি গল্পের উপাদান হয়েছে। খুব অপরিণত মনের বিশ্বাস-সংস্কার থেকে এসব গল্পের উদ্ভব। গল্পে নৈতিক জ্ঞান ও শিক্ষার দিকটি উপেক্ষিত হয়নি। যে জ্ঞান নিয়ে সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যা হয়েছে, পুরাণবিদ একে 'Science of a pre-scientific age' বা 'বিজ্ঞান-পূর্ব যুগের বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন (SDFML, vol, II, 1950, 778) ! খুব সাধারণ চিন্তার ও সরল জীবন ব্যবস্থার ফসল এগুলি। আগে গাছে চালই ফলত ; কিন্তু মানুষ মলত্যাগ করতে বসে চাল ছিঁড়ে খাওয়ায় তা ধানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটা ধানের জন্ম-রহস্য। ধান চাষ ও মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে সমাজে —এরূপ লোক-পুরাণ সেই সমাজে জন্মেছে। পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ও হৃদয় বৃত্তি গল্পগুলিতে স্থান পেয়েছে। সুতরাং লোক-পুরাণে যেমন জীবন জিজ্ঞাসা আছে, তেমনি এর সৃষ্টিশীল জীবন ধারাও আছে। লোককাহিনীর অন্য অনেক ধারা থেকে লোক-পুরাণ যে আলাদা রচনা তা এসব উপাদান থেকে বুঝা যায়। কোন কোন ব্রতকথা উৎকৃষ্ট লোক-পুরাণের দৃষ্টান্ত। এসব ব্রতে আদিম ধর্মচেতনা ব্যক্ত হয়েছে। লৌকিক দেব দেবীর জন্ম ও পূজাকে অবলম্বন করে ব্রতকথা রচিত হয়। একাধারে ধর্মচেতনা, অন্যধারে গার্হস্থ্য জীবনবোধ উভয়ের সংমিশ্রণে ব্রতকাহিনী বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধারণ করে আসছে যার আস্বাদ্যমানতা সম্প্রদায় বিশেষে আজও ম্লান হয়নি। এতে দেবতা ও মানুষ একাকার হয়ে আছে। "A myth remains properly a myth only as long as the divinity of its actors is recognised" (Ibid, 778). লোক-পুরাণের এই শর্ত ব্রতকাহিনী পূরণ করে। শিবব্রত, সূর্যব্রত, ভাদু ব্রত, টুসু ব্রত, ভাইফোটা ব্রত ইত্যাদিতে দৈবশক্তির কাছে মনস্কামনা ব্যক্ত করা হয় সুন্দর, সুস্থ জীবনের জন্য। এতে সাধারণ মানুষের জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। তারা ইহকালকে উপেক্ষা করে পরকালকে অধিক মূল্য দেয়নি। শাস্ত্রীয় ধর্মে এর উল্টো দেখি—ইহকাল অপেক্ষা পরকালের গুরুত্ব অধিক। বাংলার সনাতন ধর্মীয় চেতনায় ইহজাগতিকতার প্রাধান্য আছে তা লোক-কৃষ্টির ধারা বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়। যেহেতু লোক-পুরাণ লোকাহিনীর প্রাচীনতম শাখা, সেহেতু এগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে জাতির বহু অতীতের মানসধারা আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

আমাদের লোক-পুরাণের কোন সংকলন এ যাবৎ প্রকাশিত হয়নি। এ সম্পর্কে আলোচনাও অপ্রতুল। প্রথমত লোককাহিনীর বিভিন্ন ধারা থেকে এগুলিকে আলাদা করা

দরকার যা সংজ্ঞা-বৈশিষ্ট্য দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। অতঃপর উপযুক্ত শ্রেণী-বিন্যাস প্রয়োজন। এরপর মটিফ-বিচার, সমাজ-সংস্কৃতির বিশ্লেষণ ইত্যাদি করা যায়।

লোক-পুরাণের কাছকাছি আছে বীরকথা (Legend), রূপকথা, জাতক কাহিনী ইত্যাদি। কাহিনীর নায়ক-চরিত্র দেবত্ব হারিয়ে মানবত্বে পরিণত হলে পুরাণ বীরকথায় রূপান্তরিত হয়। অনুরূপভাবে রূপকথার নায়ক ও পুরাণের নায়কের মধ্যে দেবত্বের ও মানবত্বের পার্থক্য আছে। বীরকথায় নায়ক ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু রূপকথার নায়ক অনৈতিহাসিক ব্যক্তি। জাতকে পশু কাহিনী আছে, কিন্তু তার মূল লক্ষ্য হল নীতিজ্ঞান ও আদর্শ শিক্ষা। লোক-পুরাণে জীব-জন্তুর জন্ম-রহস্য ও চরিত্রের ব্যাখ্যা হয় অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য। দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এজন্য ভূলোক, স্বর্গলোক, অন্তঃরীক্ষ, পাতালপুরী কিছুই বাদ যায় না। লোক-পুরাণের সনাক্তকরণের বিষয়টি তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল-আকাশের নানা বস্তু, প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক-আধ্যাত্মিক-মানবিক ঘটনা ও আচরণমালা পুরাণের বিষয় হতে পারে। বস্তু, ঘটনা, ক্রিয়া এরূপ শ্রেণীকরণ হতে পারে, আবার জীব জড়, দৈব, মানব, নৈসর্গিক এভাবেও শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়। একজন বিশেষজ্ঞ একে আটভাগে ভাগ করেছেন—যথা, বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টিমূলক, প্রাণী সৃষ্টিমূলক, প্রাকৃতিক সৃষ্টিমূলক, সংস্কৃতিমূলক, আচারমূলক, বীর-ব্যক্তিত্বমূলক, চন্দ্র-সূর্য-তারকামূলক এবং পরলোক মৃতাত্মামূলক (ফোকলোর পরিচিতি এবং লোক-সাহিত্যের পঠন-পাঠন, ৩৭৪-৭৫)। বিশ্বব্রহ্মান্ড ও চন্দ্র-সূর্য-তারকামূলক বিভাগ দুটিকে এক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায় ; অনুরূপভাবে সংস্কৃতি ও আচার-বিশ্বাসমূলক বিভাগ দুটিকে একত্রে দেখান যায়। সুতরাং উক্ত বিভাগ ছয়ে নেমে আসতে পারে।

জড়, জীব, ঘটনা (Phenomena), ক্রিয়া (Action) ও আত্মার কথা মনে রেখে আমরা প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক, প্রাণীবাচক, সৌর, দেব ও আচরণমূলক—এই ছটি ভাগে লোক-পুরাণকে শ্রেণীভুক্ত করতে চাই।

লোক-পুরাণের মটিফ আর লোককাহিনীর মটিফ আলাদা কিছুই নয়। তথাপি স্মিথ থমসন ও জোনাস বালিস 'পৌরাণিক-মটিফের কথা ভেবে ভারতীয় লোককাহিনীর তের প্রকার মটিফের উল্লেখ করেছেন—যেমন, সৃষ্টিকর্তা দেবতা, আর্যদেবতা ও বীর-চরিত্র, সৌরমণ্ডল, ভূ-প্রকৃতি, নৈসর্গিক দুর্ঘটনা, প্রকৃতি, মানুষ, প্রাণীর জন্ম, প্রাণীর চারিত্র ধর্ম, গাছপালার উৎপত্তি, গাছপালার বৈশিষ্ট্য ও বিবিধ বিষয়ের ব্যাখ্যা। (The Oral Tales of India, 1958). যেহেতু সবকিছুতে সৃষ্টি রহস্যের ব্যাখ্যা আছে, সেহেতু সব মটিফই শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। কেবল সংখ্যা দিয়ে আলাদা সূচী নির্দেশ করা হয়েছে। পুরা-কাহিনীর মধ্যস্থ আর সব মটিফ লোককাহিনীর মটিফের সাথে অভিন্ন।

পুরাণের উৎস-ভূমির অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন দেশের পুরাণের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে ; এগুলির মধ্যে 'ইন্দো-ইউরোপীয় পুরাণ-তত্ত্ব', 'ভেঙ্গে যাওয়া পুরাণ-তত্ত্ব' ও 'সমান্তরাল পুরাণ-তত্ত্ব' প্রধান। বাংলা লোক-পুরাণ আলোচনায় এসব তত্ত্বের প্রযোগ-যোগ্যতা বিচার করা প্রয়োজন। তুলনামূলক

আলোচনার মাধ্যমে কোনটি নিজস্ব সংস্কৃতি আর কোনটি ধার-করা সংস্কৃতি তা নির্ণয় করাও সম্ভব।

পুরাণ-সৃষ্টির যুগ শেষ হয়েছে অনেক আগে। সমাজের অশিক্ষিত মানুষ সংস্কার ও কৌতূহলবশত যেটুকু ধরে রেখেছে, যুগের দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সেটুকু হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্য বাংলা লোক-পুরাণ সংগ্রহের ও সম্পাদনার উপযুক্ত সময় এসেছে। দেশব্যাপী জরিপের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা যায়। দরকার উপযুক্ত গবেষক এবং পরিমিত অর্থ-তহবিল। লোক-পুরাণের সাথে ঐতিহ্যের নিবিড় যোগ আছে। সে-ঐতিহ্যের মূল্যায়নের জন্যই এটি করা আবশ্যক।

সাঈদ-উর-রহমান

চাঁদ সদাগরের লাঠি ও হজরত মুসার 'আষা'

বাঙালির জাতীয় কাব্য বলে অভিহিত মনসামঙ্গলের কেন্দ্রীয় চরিত্র চাঁদ সদাগরের হাতে সব সময় একটি লাঠি থাকে। সেই লাঠিকে সাপের দেবী মনসার বড় ভয়! দেবীর ইচ্ছা যে, সদাগর তাঁর পূজা করুক ; কিন্তু লাঠির ভয়ে দেবী সদাগরের কাছে আসতে সাহস করে না। একবার নাগালে আসায়, চাঁদ লাঠির আঘাতে দেবীর কোমর ভেঙে দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত সদাগর পূজা করতে বাধ্য হলেও তার হাতে লাঠি থাকা অবস্থায় পূজার ফুল গ্রহণ করার জন্য মর্তে অবতরণ করতে দেবী রাজী হননি। দেবীর আতংক বুঝতে পেরে চাঁদ লাঠি দূরে ফেলে দিলে দেবী পূজা গ্রহণ করেন ও আশীর্বাদ জানান।

বিভিন্ন কবির কাব্যে সদাগরের লাঠি বিভিন্ন নামে পরিচিত। বরিশাল এলাকার কবি বিজয় গুপ্ত বলেছেন 'হেতাল বাড়ি'।

চান্দ বেটা দুরাচার অতি করে অহংকার
মোরে মন্দ বলিল বিস্তর।
ধরিয়া হেতাল বাড়ি ঘটগোট চুর করি
মোর নামে কাঁপে থরথর।[১]

'হেতাল' নাম উল্লেখ করেছেন চব্বিশ পরগনার বিপ্রদাস পিপলাই, ও বর্ধমান জেলার কেতকদাস ক্ষেমানন্দ।

উড়িষ্যার কবি দ্বারিকদাস লিখেছেন, 'হেন্তালের বাড়ি'। তিনি সাময়িকভাবে মেদিনীপুর জেলায় বাস করার কালে মনসামঙ্গল কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন,

চান্দ বাণ্যা বলে কি তারে ডরি।
দেখা পাল্যে প্রাণে ধরিয়া মারি॥
যত দুঃখ দিয়া আছয়ে মোরে।
হেন্তালের বাড়ি তাহার তরে॥[২]

'হেন্তালের নড়ি' উল্লেখ করেছেন ক্ষেমানন্দ দাসও। কিন্তু বীরভূম জেলার বিষ্ণু পাল লিখেছেন 'হেটালের নড়ি'।

হেটাল-নড়ি লইয়া চান্দো রামা ধাঅ।
দক্ষিণ সাগর ঘরে রাজা আসিয়া ডাড়াঅ।[৩]

কবি নারায়ণদেব (কিশোরগঞ্জ) ব্যবহার করেছেন 'হেমতাল বাড়ি'।

হেমতাল বাড়ি লইয়া কান্দের উপর
লড় পাড়িয়া আইসে চান্দো সদাগর।[৪]

মালদহ জেলার কবি তন্ত্রবিভূতি এবং সিলেটের কবি ষষ্ঠীবরও লিখেছেন 'হেমতাল'। কিন্তু বগুড়া জেলার অধিবাসী জীবনমৈত্র রচিত কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে 'হেমতার'।

কানীর কারণে আছে এতিম হেমতার
লাগ পাইলে কানীর সুধিব এই ধার।[৫]

সুতরাং চাঁদ সদাগরের হাতে একটি দণ্ড পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র। সেটার নাম বিভিন্ন—হেন্তাল, হেতাল, হেঁতাল, হেটাল, হেমতাল ও হেমতার।[৬]

বিপ্রদাস, পিপলাইর মনসা বিজয় কাব্য সম্পাদনার সময় ড: সুকুমার সেন 'হেমতাল' শব্দটিকেই গ্রহণ করেছেন ; যদিও স্বয়ং কবি ব্যবহার করেছিলেন 'হেতাল'। ড: সেন মনে করেন যে, শব্দটির সঙ্গে হেতাল গাছের কোন সম্পর্ক নেই। এটি এসেছে নাগ-অধিপতি অনন্তের (শেষ) প্রতীক হৈম তালধ্বজ থেকে। নাগ-অধিপতির প্রতীক বলে সব নাগই একে মান্য করতে বাধ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থেও তিনি সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৭] অধিকাংশ অভিধানকারও সেভাবে ব্যাখ্যা করেন।

বাংলা ভাষায় 'হেতালবেদনা' বলে একটি শব্দ আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এর অর্থ করেছেন এরূপ—'ফুল পড়িবার পর জরায়ুর সঙ্কোচনকালে জরায়ু মধ্যস্থ জমাট রক্ত প্রভৃতি বাহির করিয়া দিবার উপায় স্বরূপ মুহুর্মুহু বেদনা।' এই যদি হয়, তাহলে সাপ-মনসা-হেতাল-হেতালবেদনা সবগুলি মিলিয়ে দেখলে সাপের সঙ্গে প্রজনন শক্তির যে সম্পর্ক চিন্তা করা হয়, তা-ও সমর্থিত হয়। যাই হোক আমাদের বর্তমান আলোচনার সেটা প্রাসঙ্গিক নয়।

চাঁদ সদাগরের লাঠি হেমতালের বা হেতালের হতে পারে। এটা কোন সাধারণ লাঠি নয়—এর সঙ্গে একটি রহস্য জড়িয়ে আছে। সাপ এবং সাপের দেবী উভয়ই একে ভয় করে বা মান্য করে।

সদাগর সে-লাঠি পেলেন কোথায়—এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠবে। এটা কি বাঙালি কবির নিজস্ব ভাবনা থেকে এসেছে, না অন্য কোন প্রভাবে এসেছে—তার উত্তর খোজা নিরর্থক নয়। যে-তথ্য আমাদের হাতে আছে, তার ভিত্তিতে বর্তমান পর্যায়ে এর সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে অন্ধকারে তীর ছুঁড়তে বাধা কোথায়?

২

ইসলামী উপাখ্যানে কয়েকজন নবীর হাতে একটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লাঠি মাঝে মাঝে দেখা যায়। এর আরবী নাম 'আষা'। মিসর দেশের ইসরাইল সম্প্রদায়ের নবী হযরত মুসার আষার কাহিনী সুপ্রচলিত। কোরান শরীফের অন্তত তিনটি সুরায় আষা-র মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বিরচিত কোরান সূত্র[৮] থেকে নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায় :

১। তারপর মুসা তার লাঠি ছুঁড়ে ফেলল আর সাথে সাথে সেটি এক সাক্ষাৎ অজগর সাপ হয়ে গেল।' (সুরা আরাফ, বাক্য—১০৮)

২। তারপর মুসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, "তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে বাড়ি মার।" তখন তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বড় পাহাড়ের মত হয়ে গেল। আর অপর দলটিকে আমি সেখানে পৌঁছে দিলাম, আর মুসা ও তার সঙ্গীদের আমি উদ্ধার করলাম।' (সুরা শোয়ারা, বাক্য ৬৭—৬৮)

কোরানের এই কাঠামো ঠিক রেখে সতের শতকের বিখ্যাত আলেম পীর ও কবি সৈয়দ সুলতান কাহিনীকে একটু সম্প্রসারিত করেছেন। তাঁর রচিত 'নবীবংশ' কাব্যে নিম্নরূপ কাহিনী পাওয়া যায় :

প্রথম মানব হযরত আদমকে আল্লাহ্ স্বর্গে বাস করার সময় চারটি জিনিষ দিয়েছিলেন —সেগুলির অন্যতম ছিল বেহেশতের বৃক্ষের ডাল দিয়ে তৈরি একটি লাঠি বা আষা। আদম—পত্নী বিবি হাওয়ার বন্ধু ছিল একটি ময়ূর ও একটি সাপিনী। সাপিনী স্বর্গের বহির্দেশ থেকে উদরে করে শয়তানকে বেহেশতে নিয়ে এসেছিল। শয়তানকে উদরে স্থান দেয়ার কারণে তখন থেকে সাপের বিষ জন্মায়। শয়তানের কুপরামর্শে আদম নিষিদ্ধ বৃক্ষেব ফল ভক্ষণ করলে তাঁর হাত থেকে 'আষা' খসে পড়ে। পরবর্তীকালে আরো দুই পয়গম্বর হয়ে সেটা পৌঁছায় হযরত মুসার কাছে। মুসা আষা দিয়ে অজগর সংহার করেছেন। প্রভুর ইচ্ছায় সেটা সর্পরূপ ধারণ করে ফেরাউনের সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছে ; এবং শেষপর্যন্ত আষার সাহায্যেই মুসা নবী নীল নদকে দুই ভাগ করে ইসরাইল সম্প্রদায়কে নিরাপদে অপর পাড়ে নিয়ে গেছেন। নীল নদের তীরে দণ্ডায়মান মুসার প্রতি জিবরাইলের পরামর্শ :

জিব্রাইল পাঠাইলা মুসার যে পাশ
সাক্ষাতে আসিয়া কহে বহুল আসোয়াস।
মারহ 'আষার' বারি এহি সাগরেরে
বোল পন্থ করি দিতে তুহ্মি যাইবারে।
তা শুনিয়া আষা হাতে লৈলা পয়গম্বরে
মারিলা আষার বারি সেই সাগরেরে।
সাগরে চিক্কার ছাড়ি কান্দিতে লাগিলা।
অতি উচ্চস্বরে ডাক বহুল ছাড়িলা।।
শুনি মুসা পয়গম্বরে আষা হাতে করি
মারিলেক সাগরেরে সে আষার বারি।[৯]

মিসর-প্রবাসী কেনান দেশের আরেক নবী হযরত ইউসুফও আল্লার কাছ থেকে একটি 'আষা' পেয়েছিলেন বলে কবি শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে উল্লেখ করেছেন।

নির্মল স্বরূপ আষা বিধির নির্মিত
হেন আষা ইছুফক দিলেন্ত বিদিত।[১০]

অবশ্য এই স্বর্গীয় লাঠি-র কোন ব্যবহার কাব্যের কোন অংশে দেখা যায়নি।

৩

মুসার আষা এবং চাঁদ সদাগরের লাঠির মধ্যে কোন যোগসূত্র না-থাকাই আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হয়। কোথায় বাংলাদেশে, আর কোথায় বা মিসর? চাঁদ সদাগরের কাহিনী পাঁচশ বছরের পুরানো, আর মুসা মর্তে এসেছিলেন কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। সেজন্য মনে হয়, এদের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান না করাই উচিত।

কিন্তু আবার যখন মনে হয় যে, পৃথিবীর কোন ধর্ম বা সভ্যতাই অবিমিশ্র নয়, তখন অসম্ভব কল্পনা করতে ইচ্ছা হয়। পৃথিবীর প্রধান সব ধর্ম এশিয়ায় জন্ম নিয়েছে, এবং

একটির দ্বারা অপরটি পুষ্ট হয়েছে। মুসার জীবনকালের আগে ও পরে সারা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব–সংঘাত–সমন্বয় চলছিল। প্রাচীন কেনান জাতির মধ্যে অনেক নবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেনান জাতির একটি অংশ ফোনেশীয়রা বর্তমান লেবানন, ইসরাইল ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে গড়ে তুলেছিল সমৃদ্ধ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। তারা বাণিজ্য ব্যপদেশে পৃথিবীর দেশে-দেশে ছড়িয়ে পড়ে পণ্যের আদান–প্রদান যেমন করেছিল তেমনিভাবে একস্থানের ধর্মকে অপরদেশে নিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব পনের শতকে উত্তর সিরিয়ায় মিতান্নি (Mitanni) নামক রাজ্যে ইন্দো–ইউরোপীয় গোষ্ঠীর রাজারা রাজত্ব করত। পরবর্তী কালে হিট্টাইট বংশীয় রাজাদের কাছে পরাস্ত হয়ে তারা বিভিন্ন দেশে গমন করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৩৮০ সালে হিট্টাইট ও মিতান্নির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিল ঋকবেদীয় দেবতা মিত্র, বরুণ ও ইন্দ্র, মেসোপটেমীয় দেবতা Anu এবং এনলিল ; এবং হিট্টাইটদের ঝড়ের দেবতা তেশুব (Teshub) এবং সূর্যদেবতা শিমেগী (shimegi)। এ সব তথ্যের আলোকে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকায় বলা হয়েছে—As might be expected, the late Bronze Age presents a complex religious picture . a great many local cults were scattered throughout Syria-Palestine, and the possibility for transmission and borrowing from one area to another were practically unlimited.[১১] ইন্দো–ইউরোপীয়দের এক শাখাই ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করে।

এই সীমাহীন সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করা যায়। সর্পপূজার উদ্ভব, মনসামঙ্গল কাব্য রচনা ও হেতাল গাছের প্রসঙ্গ।

চাঁদ সদাগরের কাহিনী সর্পপূজার সঙ্গে জড়িত সাপের দেবী মনসার পৃথিবীতে নিজের পূজা প্রচারের উদগ্র বাসনা থেকেই সদাগরের সঙ্গে তার বিবাদ বেঁধেছিল ও চাঁদের লাঠিঘাতে দেবীর কাঁকাল ভেঙে গিয়েছিল। মুসার কাহিনীতে সর্পপূজা নেই, কিন্তু সাপের উল্লেখ আছে। তিনি 'আষা'র আঘাতে নীলনদকে যে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, তারও একটি প্রতীকী তাৎপর্য দেখা যায়। মিসরীয় পুরাণ কাহিনীতে নীলনদী ও দেবী অসিরিস সমার্থক। তাই বলা যায়, মুসা ভেঙেছিলেন দেবী অসিরিসকে, যেমন করে সদাগর ভেঙেছিলেন মনসা দেবীকে।

প্রাচীন মিসরেও সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। সর্পাকৃতির অসংখ্য দেবীর পূজার্চনা সেদেশে প্রচলিত ছিল—এমনকি দেবীর চিত্রলিপি (hieroglyph) হিসেবে তৎকালে সর্পাকৃতি ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে।[১২] একদল পণ্ডিতের ধারণা যে, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দে মিসরে প্রথম সর্পপূজার উদ্ভব ঘটেছিল এবং ফোনেশীয় বণিকেরা সেটা ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিল।[১৩]

মধ্যযুগের বাংলায় মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হবার পটভূমি হিসেবে হুমায়ুন কবীর ইসলামের প্রভাবকে নির্দেশ করেছেন। পূর্ব বাংলার বৈরী পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকার প্রতীকী–ভাষ্য চাঁদ সদাগর ও বেহুলা—দু'জনেই প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে নিত্য সংগ্রাম করেছে। শিবের প্রতি সদাগরের অচলা ভক্তি ইসলামের একেশ্বরবাদেরই প্রভাবে এসেছে। তাছাড়া মনসামঙ্গলের কাঠামো, মুসলমানী চরিত্রের ব্যবহার, রচনাকাল বিশ্লেষণ করলে নতুন প্রচারিত ইসলাম ধর্মের প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়।

মিশ্র মাধ্যম

শাহনাজ হুসনে জাহান লীনা

গাজীর পট : উপস্থাপনা রীতি, চিত্রাঙ্কন শৈলী ও উৎস

একদা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, বিশেষত ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালি, যশোহর, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল গাজীর পট। বর্তমানে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ভি.সি.আর.-এর ভিড়ে এই জনপ্রিয় মাধ্যমটি বিলুপ্ত প্রায়। দু'একটি দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে ঐ সকল পটের নিদর্শন আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত দু'জন গাজীর পটকুশীলবের সন্ধান পাওয়া গেছে, একজন নরসিংদী জেলার হাজিপুর গ্রামের দুর্জন আলী এবং অপরজন একই জেলার বেদে পাড়ার কোনাই মিয়া। দুর্জন আলীর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। তিনি আজও গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত দৈন্য অবস্থায় গাজীর পট পরিবেশন করে থাকেন। তিনি দাবী করেন যে, তাঁরা সাতপুরুষ ধরে গাজীব পট পবিবেশন করে আসছেন।[১]

গাজীর পট পরিবেশনকালে দুর্জন আলী সাধারণত পাজামা ও পাঞ্জাবি পরিধান কবেন। কোন একটি বাড়ির উঠানের এক প্রান্তে পট নিয়ে দাঁড়ান দুর্জন আলী এবং তাঁব পাশে থাকেন এক বা একাধিক তালবাদক—যাঁরা জুড়ি, ঢোল, চটি প্রভৃতি বাজিয়ে থাকেন। আর তাঁর সম্মুখে তিন দিক ঘিরে বসে (বা দাঁড়িয়ে) দর্শকগণ পরিবেশনা উপভোগ কবেন (চিত্র নং ১ দ্রষ্টব্য)। দুর্জন আলীর পরিবেশনা শুরু হয় গাজী পীরের নামে একটি বন্দনা গীতির মাধ্যমে। যেমন—

> ওরে পাযাণ মন আমার
> হরদম গাজীর নাম লইও।
> আর হরদমে হরদমে গাজী দমে করি সার
> মাঙ্গিলে মিলাইতে পারে মহিমা তাহার।

বন্দনাগীতি শেষ হবার পর তিনি বাম হাতে পটটি ধরে ডান হাতে একটি কাঠি দিয়ে পটে অঙ্কিত চিত্রসমূহ একে একে দর্শকদের দেখিয়ে যান। সেই সাথে নৃত্যের তালে তালে সুর ও কথার মাধ্যমে পটে অঙ্কিত চিত্রসমূহ বর্ণনা করেন (চিত্র নং ২ দ্রষ্টব্য)।

১ নিবন্ধকাব কর্তৃক ১২ সেপ্টেম্বব, ১৯৯৫ তাবিখে নবসিংদী জেলাব হাজীপুব গ্রামে পটকুশীলব দুর্জন আলীব সাক্ষাৎকাব হতে প্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, এই নিবন্ধে পট পবিবেশনা রীতি, বর্ণনাংশ ও দুর্জন আলীব পবিচয সংক্রান্ত সকল তথ্য এই সাক্ষাৎকাব এবং গাজীব পট পবিবেশনা প্রত্যক্ষ দর্শনেব ভিত্তিতে বচিত।

পটকুশীলবের বর্ণনার কোন লিখিত রূপ নেই। মৌখিকভাবে সৃষ্ট এবং বংশ পরম্পরাগতভাবে হস্তান্তরিত এই বর্ণনায় সামান্য কিছু তারতম্য দেখা গেলেও মূল বিষয়বস্তু এক। সুনির্দিষ্ট কোন কাহিনীর পরিবর্তে গাজীর পটের বর্ণনা অংশে তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে—(১) পীর জিন্দা গাজীর মাহাত্ম্য ও অলৌকিক ক্ষমতা, (২) কৌতুক মিশ্রিত সামাজিক হিতোপদেশ এবং (৩) মৃত্যু তথা যম রাজের ভয়। এই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে পটকুশীলব একটি সরল বক্তব্য উপস্থাপন করেন—গাজীকে ভক্তি কর এবং সামাজিক ব্যবস্থা মান্য করে চল, নতুবা মৃত্যুর ওপারে নিদারুণ যম রাজার কঠিন শাস্তি তোমার জন্য অশেষ দুঃখ বয়ে আনবে। এই বক্তব্য পটকুশীলব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেন কখনও হাস্যরস, কখনও ভয়ানক ও করুণ রস সঞ্চারণের মাধ্যমে। সামগ্রিক পরিবেশনার মূল সূত্র পীর জিন্দা গাজী। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে বর্ণিত হয়—

গাজীর বাপের নাম শাহ সেকান্দার।
রত্তন শহরে বানছে মদিনা বাড়ীঘর॥

(কোনাই মিয়া)[২]

পাতালেতে করছিল বিয়া উজুপা সুন্দরী।
সেই ঘরেতে পয়দা নিলেন পীর জিন্দা গাজী॥

(দুর্জন আলী)

উজুপা সুন্দরীর পুত্র গাজীর মুখে কেবল আল্লাহর কালাম। তিনি তাঁর ভাই কালুর সাথে সংসার পরিত্যাগ করে বনের মধ্যে সাধনা করেন। একদিন কালু অনুরোধ করে—

এক যুগ বার বছর রইলাম বনে বনে।
কি ফকিরী পাইলা ভাই দেখাও আমারে॥

(কোনাই মিয়া)[৩]

কালু আরও জানায়, কেরামতি প্রদর্শনে ব্যর্থ হলে সে গাজীর সঙ্গ ত্যাগ করবে। তখন—

বিসমিল্লাহ বলিয়া গাজী গাছে রাখে হাত।
গাজীর দোয়ায় বাঁইচ্চা উঠে মরা শিমুল গাছ॥

(কোনাই মিয়া)[৪]

অতঃপর মহত্বের নিদর্শনস্বরূপ—

গাজীর ভাই কালু মিয়া ছাত্তি ধরিল।
সামনেতে মানিক পীর নিশান ধরিল॥...
জংগলে গাজী পীর খুলিলেন কালাম।
আসিয়া বনের বাঘ জানায় তারে সেলাম॥

২ তোফায়েল আহমদ, *'পট ও পটুয়া আচার্য'*, কারুশিল্পী পুরস্কার ১৯৮৯, বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ৫
৩. ঐ, পৃ. ৫
৪. ঐ, পৃ. ৬

গাজী আমার সত্যের পীর কে বা তারে চিনে।
পানির কুম্ভীর বনের বাঘ গাজীর দোহাই মানে॥
(দুর্জন আলী)

পরবর্তীতে গাজী পীর বিভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। উল্লেখ্য যে, দুর্জন আলী ও কোনাই মিয়া দু'জনের বর্ণনাতেই গাজী পীর ও তাঁর ভাই কালুর সাথে মানিক পীর, ছাওয়াল ফকির প্রমুখ লৌকিক পীর-আউলিয়ারও সন্নিবেশ ঘটেছে।

দুর্জন আলী এবং কোনাই মিয়ার বর্ণনায় গাজী পীরের মাহাত্ম্য-কীর্তনের মাঝে মাঝে কৌতুক রসাশ্রিত সামাজিক হিতোপদেশ কথিত হয়। যেমন—

এই দেখ রান্দিয়া বাড়িয়া যদি স্বামীর আগে খায়।
পুরানা কলসের পানি তিরাসে শুকায়॥
স্বামীর বিছানা করতে যারা পায় লাথ্যায় আগে।
সেও নারী অভাগিনী নরক কুণ্ডে যাবে॥
(দুর্জন আলী)

দুব দুবাইয়া হাটে নারী চোখ গোরাইয়া চায়।
অলক্ষ্মীরে দিয়া ঘরে লক্ষ্মী লইয়া যায়॥...
চুলনা বুড়ি চুলের লাগি কান্দে।
কচুর পাতা দিয়ে তার খোপা বড় করে॥
আটতে জানে না বুড়ি চিবি গুয়া খায়।
বিয়া সাদীর কথা শুনলে তুর তুরাইয়া যায়॥[৫]
(কোনাই মিয়া)

সকল পাপীর জন্য যম রাজা যে ভয়ঙ্কর শাস্তি নিয়ে পরকালে অপেক্ষা করছেন, তার বর্ণনা নিম্নরূপ—

যমদূত কালদূত ডাইনে আর বাঁয়।
মধ্যখানে বইসা আছে যমরাজের মায়॥
যমদূত কালদূত দেইখা লইবেন তারে।
দুই হাতে দুই লোহার গদা যমের মত ফিরে॥
যমরাজের মায় বইছে তামার ডেকচি লইয়া।
অতিপাপী মানুষের কল্লা দিছে সে ডেগে ফালাইয়া॥[৬]
(কোনাই মিয়া)

পটকুশীলব তাঁর বর্ণনার মাঝে মাঝে পাপীদের করুণ মৃত্যু সম্পর্কে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন—

৫. ঐ, পৃ. ৬
৬. ঐ, পৃ. ৫

তোরা দেখবি যদি আয়।
এই ভাবে মরিয়া গেলে কানবে দু'দিন মায়॥
(দুর্জন আলী)

এভাবে পটকুশীলব তাঁর পটে অঙ্কিত বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রসমূহ একের পর এক সুর ও কথার মাধ্যমে বর্ণনা করে চলেন। বিভিন্ন সুরে বাধা বিভিন্ন বিষয় অপূর্বভাবে একই সূত্রে গ্রথিত করে অতি সহজেই তিনি দর্শক–মন মুগ্ধ করেন। সকল চিত্র প্রদর্শন ও বর্ণনা শেষ হলে দুর্জন আলী নিম্নোক্ত চরণ দু'টি গেয়ে তাঁর পরিবেশনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন—

এই পর্যন্ত বইলা আমি ইতি দিয়া যাই।
আল্লায় বাঁচাইলে আবার আরেক দিন গাই॥
(দুর্জন আলী)

পটকুশীলব কোনাই মিয়া বৃত্তিগতভাবে একজন বেদে। অপরদিকে দুর্জন আলী সবজি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন ; তিনিও আদিতে বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এরা দু'জনেই মুসলিম ধর্মাবলম্বী। কিন্তু এরা কেউই নিজেরা পট অঙ্কন করেন না। অন্তত দুই যুগ আগে মূলত অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার মৌসুমে পটকুশীলবগণ সওদাগর নামে কথিত মহাজনদের নিকট হতে পট ভাড়া নিয়ে গ্রামে গ্রামে পরিবেশন করতেন। বিনিময়ে তাঁরা ধান সংগ্রহ করতেন। এই ধানের তিন ভাগের এক ভাগ মহাজনের প্রাপ্য ছিল, দুই ভাগ ছিল কুশীলবের।[৭] বর্তমানে অবশ্য এমন ব্যবস্থা আর নেই। দুর্জন আলীর নিজস্ব পট রয়েছে। সে–পট প্রদর্শন করে। তাঁর আয় অতি সামান্য বিধায় তিনি এ–পেশা প্রায় পরিত্যাগ করেছেন।

দুর্জন আলীর গাজীর পটের চিত্রসমূহ ৪´ × ৮″ দীর্ঘ ও ১´ × ১০″ প্রশস্ত একটি মোটা মার্কিন কাপড়ের উপর অঙ্কিত। সাধারণত এটিকে জড়িয়ে রাখা হয় বলে এ ধরনের পট 'জোড়ানো পট' হিসেবে পরিচিত। পরিবেশনার সময় পটটির উপরে ও নিচের শেষ দু'প্রান্তে দুটো বাঁশের অথবা কাঠের লাঠি এবং পটের পশ্চাতে ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে অপর একটি বাঁশের লাঠি সংযুক্ত করা হয়। শেষোক্ত লাঠিটি পটের স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র পটটি উল্লম্ব ও আনুভূমিকভাবে সৃষ্ট মোট পঁচাশিটি প্যানেলে বিভক্ত। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্যানেলটির পরিমাপ ১২″ × ২০$\frac{১}{৪}$″ এর উপরে ৪$\frac{১}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″ পরিমাণ বিশিষ্ট মোট বারটি প্যানেল এবং নীচে একই পরিমাপ বিশিষ্ট (অর্থাৎ ৪$\frac{১}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″ মোট নয়টি প্যানেল দেখা যায়। তবে পটের সর্বশেষ সারির তিনটি প্যানেলের পরিমাপ ৫$\frac{১}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″ পটের কেন্দ্রীয় প্যানেল ব্যতিরেকে অপর সকল প্যানেল আনুভূমিকভাবে আট (কেন্দ্রীয় প্যানেলের উপরে চার + নিচে চার) সারিতে অথবা উল্লম্বভাবে ছয় (কেন্দ্রীয় "প্যানেলের"র উপর তিন + নিচে তিন) সারিতে বিন্যস্ত।

৭. ঐ, পৃ. ৬

আলোচ্য গাজীর পটটির কেন্দ্রীয় প্যানেলে তিনটি খিলানকৃত কাঠামোর মধ্যে স্বয়ং গাজী এবং দু'পাশে মানিক পীর ও কালুকে অঙ্কন করা হয়েছে (চিত্র নং ৩ দ্রষ্টব্য)। গাজী চিত্রিত হয়েছেন হলুদের উপর কাল ফোটা ফোটা দাগযুক্ত এক বাঘের পিঠে উপবিষ্ট অবস্থায়। তাঁর পরনে নীলের উপর সাদা বুটিদার পাজামা আর সাদার উপর লাল বুটিদার জামা ও তার উপরে হলুদের উপর লাল ডোরা বিশিষ্ট বিশেষ ধরনের একটি 'কোটি' দেখা যায়। গাজীর মাথায় মুকুট এবং বাঁ হাতে 'তসবি' ও ডান হাতে 'চামর' অংকিত হয়েছে। তাঁর মাথার উপর ছাতা ধরে পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন কালু এবং সামনে একটি ত্রিকোণাকার নিশান হাতে দাঁড়িয়ে আছেন মানিক পীর। কালু ও মানিক পীর উভয়ই বিপরীত দিক হতে মুখোমুখি অবস্থায় একই ভঙ্গীতে চিত্রায়িত হয়েছেন। দু'জনেরই মাথায় টুপি এবং পরনে ফুলহাতা 'সার্ট' ও ধুতি; তবে পোশাকের রং বিপরীতধর্মী। যেমন মানিক পীরের টুপির রং নীল, জামার রং হালকা গোলাপী এবং ধুতির রং নীল। পক্ষান্তরে কালুর টুপি হালকা গোলাপী, জামা নীল ও ধুতি হালকা গোলাপী।

এছাড়া কেন্দ্রীয় প্যানেলের উপরে ও নীচে আনুভূমিকভাবে মোট আটটি সারিতে বিন্যস্ত চব্বিশটি ক্ষুদ্র প্যানেলে নানা ধরনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চিত্র নং ৪ অনুসারে পটের সর্বোপরে অর্থাৎ প্রথম সারির সর্ব বামে মকর মাছের পিঠে উপবিষ্ট গঙ্গা দেবী (১), মাঝে ঘোড়া ও সহিস (২), ও ডানে হুক্কা পানরত পুইস্কার বাবা ও পাশে দণ্ডায়মান পুইস্কার মা (৩), দ্বিতীয় সারির বাঁমে হরিণ জবাইরত দুই ভাই অনা ও মনা (৪), মাঝে নাকাড়া বাদনরত ছাওয়াল ফকির (৫), ও ডানে সপ্তডিংগা নৌকায় মনাই সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা (৬), তৃতীয় সারির ডানে চিড়া কুটনরত চৈতার মা ও অপর এক মহিলা (৭), মাঝে কেরামতি শিমুল গাছ (৮) এবং ডানে 'আসা' হাতে হাজীর গুণকীর্তনরত দুই মহিলা (৯), চিত্র নং ৩ অনুসারে সর্বোপরে বামে আন্দুরা বাঘ (১০), মাঝে গাজীর ছাতা আর দু'পাশে শুক-সারি পাখি (১১) ও ডানে খান্দুরা বাঘ (১২), চিত্র নং ৫ অনুসারে সর্বোপরে বামে চরকা কাটনরত দুই মহিলা (১৩), মাঝে গাজীর ভগ্নী সাথী ও তাঁর বাহন লক্ষ্মী পেঁচা (১৪) এবং ডানে স্ত্রী প্রহাররত স্বামী (১৫), নিম্ন সারির বামে বাঘ ও গাভীর সংঘর্ষ (১৬), মাঝে লাঠি হাতে গোয়ালার মা (১৭) এবং ডানে মকর মাছের পিঠে উপবিষ্ট গঙ্গা দেবী (১৮), চিত্র নং ৬ অনুসারে সর্বোপরে বামে শাস্তি-প্রাপ্ত বক্ষিলা (কৃপণ) (১৯), মাঝে বাঘ দ্বারা আক্রান্ত কৈল্যার মা (২০) এবং ডানে দুধের ভারসহ গোয়ালা (২১), সর্ব নিম্ন সারিতে বামে যমদূত (২২), মাঝে মানুষের মাথা রন্ধনরত যমরাজের মা (২৩) এবং ডানে কালু দূত (২৪)। শেষোক্ত সারির প্রতিকৃতিসমূহ কেন্দ্রীয় প্যানেলের ন্যায় তিনটি খিলানকৃত কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত। এছাড়া প্রতিটি ফ্রেমের চার পাশে সাদার উপরে খয়েরী রঙের শিকল নক্সাকৃত বর্ডার অংকিত হয়েছে।

গাজীর পটের অঙ্কন শৈলী প্রসঙ্গ আলোচনায় সর্বপ্রথমে উল্লেখ্য-এর বিন্যাসগত সুষমতা। প্রথমে প্যানেলে পটভূমির রং বিচার করা যেতে পারে। নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে পটভূমিতে ব্যবহৃত রঙের বিন্যাস লক্ষ করা যায়—

লাল	সবুজ	লাল
সবুজ	লাল	সবুজ

লাল	সাদা	লাল
সবুজ	লাল	সবুজ
লাল	সবুজ	লাল
সবুজ	লাল	সবুজ
লাল	সবুজ	লাল
সবুজ	লাল	সবুজ
লাল	সবুজ	লাল

উপর্যুক্ত ছকটিকে উল্লম্ব বা আনুভূমিক যেভাবেই বিচার করা যাক না কেন, পটভূমিতে বিপরীত দুই রং, উজ্জ্বল লাল ও কচিপাতা সবুজের পালাক্রমিক ব্যবহারে চিত্রের বিন্যাসগত বৈচিত্র্য ও সুষমতা আনয়নে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল শিমুল গাছের সাদা পটভূমি। এছাড়া সকল প্রতিকৃতির মুখ হলুদ, কেবল গাজী ও যমদূতের মুখ গোলাপী এবং কালদূতের মুখ নীল রঙে অঙ্কিত। আবার সকল প্রতিকৃতির পোশাক নীল ও গোলাপী রঙের পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার লক্ষণীয়, ব্যতিক্রম কেবল গাজী, যমদূত ও কালদূত। যম ও কাল দূতের জামা হলুদ আর গাজীর 'কোটি' হলুদ।

মনুষ্য প্রতিকৃতির বিন্যাসের ক্ষেত্রেও সুষমতা লক্ষণীয়। উপর হতে পটের চতুর্থ সারিটিকে যদি কেন্দ্রীয় প্যানেলের অংশ ধরে নেয়া হয় এবং ৮নং চিত্রের শিমুল গাছ, ১৬নং চিত্রের বাঘ ও ২০নং চিত্রের বাঘকে যদি গাজীর প্রতিরূপ ধরা হয় তবে প্রতিকৃতির বিন্যাসের ছকটি নিম্নরূপ দাঁড়ায়—

১	১	২
২	১	১
২	১	২
×	×	×
১	১	১
২	১	২
১	১	১
১	২	১
১	১	১

উপর্যুক্ত ছকটি হতে সহজেই বোঝা যায় যে, এখানে ২ ও ১ এর বিন্যাসে সংস্থাপিত হয়েছে সকল প্রতিকৃতি। গাজীর চিত্র সম্বলিত কেন্দ্রীয় প্যানেল এবং সর্বনিম্ন সারি অর্থাৎ যম দৃশ্য উভয় চিত্রেই তিনটি খিলানকৃত কাঠামোর মধ্যে একটি করে প্রতিকৃতি চিত্রিত হয়েছে। এছাড়া নিচ হতে তৃতীয় সারিটিতেও প্রতিটি প্যানেলে একটি করে প্রতিকৃতি চিত্রিত হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিকৃতির বিন্যাস ১, ১, ১। আবার কেন্দ্রীয় প্যানেলের উপরে ও নীচে দুটি সারিতেই ২, ১, ২ এর বিন্যাস লক্ষণীয়। আর পটের সর্ব উপরের সারিটির প্রতিকৃতি বিন্যাস (১,১,২), দ্বিতীয় সারিতে যা কেবল উল্টে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ দ্বিতীয় সারির বিন্যাস ২, ১, ১)। যমদূত ও কালদূত ব্যতীত পটের সকল প্রতিকৃতি 'প্রোফাইলে' অঙ্কিত। প্রতিটি চিত্রেই

দুই চরিত্র হলে মুখোমুখি আর এক চরিত্র হলে বাম দিকে মুখ করে অঙ্কিত। ব্যতিক্রম কেবল যমদূত ও কালদূত (সম্মুখে মুখ করে অঙ্কিত) এবং বক্কিলা (ডানে মুখ)। বক্কিলার প্রতিকৃতি একই সারিতে সর্ব ডানে অঙ্কিত গোয়ালার উল্টোরূপ বলা যায়।

আলোচ্য চিত্রসমূহে হলুদ, লাল, নীল, সাদা ও কাল প্রভৃতি অবিমিশ্র রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। এসব রঙের সবই প্রায় রাসায়নিকভাবে সৃষ্ট। যেমন, 'জিংক অক্সাইড' থেকে সাদা, "ব্ল্যাক অক্সাইড" থেকে কাল, ভারমিনা (ভারমিলিয়ান) থেকে লাল, পিউরি থেকে হলুদ রঙ পাওয়া যায়। নীলের জন্য ব্যবহৃত হয় চাকানীল বা রাজনীল। মেটে রঙ পাওয়া যায় এলামাটি বা গোপী মাটি হতে। উল্লিখিত অবিমিশ্র রঙসমূহ বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মিশ্র রঙের সৃষ্টি হয়। যেমন, পিউরি আর নীল মিলিয়ে সবুজ, লালের সাথে সাদা মিশিয়ে হালকা গোলাপী, নীলের সাথে সাদা মিশিয়ে আকাশী প্রভৃতি রঙ সৃষ্টি করা হয়।

গাজীর পটের চিত্রসমূহে রঙের ব্যবহারে প্রথমেই চোখে পড়ে বর্তনা (roundness অথবা relief সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত shading) সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনীহা। কেবল মাত্র লাল ও নীল বর্ণের ক্ষেত্রে দুটি ছায় ব্যবহার করে রক্ত ও গোলাপী এবং শ্যাম ও আকাশী রং ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিকৃতি সুস্পষ্টভাবে দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এবং রেখা সর্বস্ব। এসকল প্রতিকৃতির গায়ে বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে তির্যক রেখা (নাকাড়া, সপ্তডিংগা, কালু ও মানিক পীরের ধুতি, গাজীর জামা), ছোট বড় উল্লম্ব ও আনুভূমিক রেখা (চিড়া কুটার পাত্র, গাজীর ছাতা ও পাজামা, যমদূতের মা'র তামার ডেক্‌চি), বিভিন্ন আকৃতির ফোটা (বাঘ) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ রেখার ব্যবহারের ফলে প্রতিকৃতিসমূহে কোন প্রকার সুললিত ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায় না। শিমুলগাছ, আসা, তসবিহ, শিকার করা হরিণ, হুক্কা, ইত্যাদির অঙ্কন স্পষ্টতই অতিমাত্রায় বাস্তবতা বিবর্জিত। গাজী, কালু, মানিক পীর, যমদূত, কালদূত, শুক ও সারি ইত্যাদি প্রতিকৃতিসমূহের শারীরিক ভঙ্গিমায় জীবনের গতিময়তা রুদ্ধ করে প্রথাগত আকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রথা-সিদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলায় গাজীর পট সম্পূর্ণরূপে অনড়।

গাজীর পটের অপর কিছু নিদর্শন যথাক্রমে আশুতোষ মিউজিয়াম সংগ্রহ (কলকাতা), গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহ (কলকাতা), সোনার গাঁ লোকশিল্প যাদুঘর (নারায়ণগঞ্জ) এবং বাংলা একাডেমী সংগ্রহ (ঢাকা)-এ সংরক্ষিত রয়েছে। এসকল গাজীর পটের মধ্যে আশুতোষ সংগ্রহশালার একটি গাজীর পটের সাথে দুর্জন আলীর গাজীর পটের বিষয়বস্তুগত অধিক সাদৃশ্য বিদ্যমান।[৮] দুটো পটেই গাজী ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে উপবিষ্ট এবং তাঁর সামনে ও পিছনে দণ্ডায়মান রয়েছেন মানিক পীর ও কালু। মানিক পীরের হাতের নিশান এবং কালুর হাতের ছাতা ও ছাতার দুপাশে শুক ও সারি পাখি দুটি পটেই একই ধরনের। এছাড়া মকর মাছের পিঠে উপবিষ্ট গঙ্গাদেবী, বাঘ ও গাভীর সংঘর্ষ, বাঘ দ্বারা আক্রান্ত মহিলা, লক্ষ্মী ও তাঁর বাহন পেঁচা, শাস্তিপ্রাপ্ত বক্কিলা (কৃপণ), যমদূত, কালদূত, মানুষের মাথা রন্ধনরত যমরাজের মা ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র দুর্জন আলীর গাজীর পটের ন্যায় আশুতোষ সংগ্রহশালার পটেও দেখা

৮. সুকুমার সেন, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা, ১৩৫৮, আশুতোষ মিউজিয়াম সংগ্রহের গাজীর পটের চিত্র দ্রষ্টব্য।

যায়। দুটি পটেই শিকল নক্‌শাকৃত বর্ডার দ্বারা প্যানেল ভাগ করা হয়েছে। তবে বিন্যাস ও অঙ্কন শৈলীর ক্ষেত্রে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। যেমন, আশুতোষ সংগ্রহের পটে গাজী, মানিক পীর ও কালুর চিত্র সম্বলিত কেন্দ্রীয় 'প্যানেলটি' পটের সর্বোপরে একটি খিলানকৃত কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত এবং গাজী ও কালুর মুখে চাপ দাড়ি দেখা যায়। অপরদিকে দুর্জন আলীর গাজীর পটের কেন্দ্রীয় প্যানেলে দেখা যায় উক্ত পটে অঙ্কিত সকল প্রতিকৃতি (যমদূত ও কালদূত ব্যতিরেকে) 'প্রোফাইলে' অঙ্কিত। দুর্জন আলীর পটের তুলনায় আশুতোষ সংগ্রহশালার পটের প্রতিকৃতিসমূহ অধিকতর বাস্তবধর্মী। শারীরিক ভঙ্গিমার ক্ষেত্রেও তুলনামূলকভাবে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। পটুয়া শম্ভু আচার্য মনে করেন, আশুতোষ সংগ্রহশালার এই পটটি তাঁর পরিবারের পূর্বপুরুষ লগ্ন আচার্য কর্তৃক অঙ্কিত।[৯]

সোনারগাঁও লোকশিল্প যাদুঘরে সংরক্ষিত গাজীর পটটি ময়মনসিংহে বিশ শতকে চিত্রিত হয় বলে জানা যায়।[১০] এখানেও গাজী ব্যাঘ্র পৃষ্টে উপবিষ্ট এবং তাঁর সামনে ও পিছনে যথাক্রমে মানিকপীর ও কালু দণ্ডায়মান। এই চিত্রটিও আশুতোষ সংগ্রহের ন্যায় একটি খিলানকৃত কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত। এ চিত্রটির সাথে দুর্জন আলীর পটের একই চিত্রের তুলনা করলে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন, লোকশিল্প যাদুঘরের পটে গাজীর মাথায় মুকুটের পরিবর্তে পাগড়ি এবং পরনে পাজামা ও পাঞ্জাবি দেখা যায়। আশুতোষ সংগ্রহের চিত্রের ন্যায় এ-চিত্রেও গাজীর মুখে চাপ দাড়ি অঙ্কিত হয়েছে। একইভাবে কালু ও মানিক পীরের মাথায়ও টুপির পরিবর্তে পাগড়ি দেখা যায়। লোকশিল্প যাদুঘরের গাজীর পটের চিত্রসমূহে সুললিত রেখার ছন্দময় ব্যবহার প্রতিকৃতিসমূহকে অপর দুটো পটের প্রতিকৃতির তুলনায় অধিকতর গতিময়তা দান করেছে। অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও লোকশিল্প যাদুঘরের গাজীর পটে অধিকতর জীবন-ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়।

বাংলা একাডেমীতে রক্ষিত পটটি অবশ্য সম্পূর্ণ নয়, এটি একটি খণ্ডাংশ মাত্র। এ অংশে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে উপবিষ্ট গাজীর পরনে যাত্রা লোকনাট্যের রাজকীয় চরিত্রের পোষাক অঙ্কিত হয়েছে। এখানেও গাজীর মুখে চাপ-দাড়ি দেখা যায়।[১১] উপরোল্লিখিত গাজীর পটের নিদর্শনসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণে বেশ কিছু বৈষম্য চোখে পড়লেও এগুলিতে বিষয়বস্তুগত একটি নিবিড় সম্পর্ক যে বিদ্যমান রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অঙ্কনশৈলী বিচারে সবগুলি পটই একটি দীর্ঘ সমতল বস্তু খণ্ডে দ্বিমাত্রিক পদ্ধতিতে অঙ্কিত, সেখানে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। সকল পটেই প্রতিকৃতি অঙ্কনের ক্ষেত্রে

৯. নিবন্ধকার কর্তৃক ১৯ এপ্রিল ১৯৯৬ তারিখে গৃহীত পটুয়া শম্ভু আচার্যের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত। এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় মুন্সীগঞ্জ জেলার কাঠপট্টির কালিন্দী পাড়ায় শিল্পীর বাড়িতে গিয়ে। নিবন্ধে গাজীর পট অঙ্কন শৈলী, রং প্রস্তুত করণ, শম্ভু আচার্য ও তাঁর বংশ পরিচয় এবং সুধীর আচার্য সংক্রান্ত সকল তথ্য এই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।

১০. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সম্পাদিত, *বাংলাদেশ লোকশিল্প*, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮৩, ৬(ক) নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

১১. রজতানন্দ দাসগুপ্ত, *'ভারতীয় উপমহাদেশে পটচিত্রকলা'*, *'বাংলাদেশ লোকশিল্প'*, সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৬

রেখার প্রাধান্য এবং বর্তনা সৃষ্টি সম্পর্কে অনীহা সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। উপরোক্ত বিষয়বস্তু ও অঙ্কনশৈলীগত বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে ধারণা করা সঙ্গত হবে যে, গাজীর পট অঙ্কনের ক্ষেত্রে একটি স্বকীয় ধারা বিদ্যমান–যা স্পষ্টতই অজন্তা, বাঘ প্রভৃতি গুহা চিত্রাবলীতে বিধৃত গুপ্তকালীন মার্গরীতি এবং পাল–যুগের পুঁথি চিত্রে বিধৃত পূর্ব ভারতীয় শিল্পরীতি হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, বাংলাদেশে পট আঁকার কেন্দ্র ছিল ময়মনসিংহ[১২] এবং যশোর--খুলনার গাজীর পটই ছিল সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।[১৩] কিন্তু বর্তমানে সে–সব অঞ্চলে গাজীর পটশিল্পী বা পটুয়ার সন্ধান পাওয়া যায় না। বর্তমানে বাংলাদেশে একমাত্র গাজীর পট–শিল্পীর সন্ধান পাওয়া গেছে মুন্সীগঞ্জ জেলার কাঠপট্টির কালিন্দী পাড়ায়। এই নিবন্ধে আলোচিত গাজীর পটটির শিল্পীর নাম শম্ভু আচার্য, তিনি আচার্য কুলভুক্ত ব্রাহ্মণ এবং বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশের কোঠায়। পটুয়া শম্ভু আচার্যের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, তাঁরা বংশপরম্পরায় নয় পুরুষ ধরে পটচিত্র অঙ্কনে নিয়োজিত। এঁদের মধ্যে পাঁচ পুরুষের নাম জানা যায় : রাম গোপাল আচার্য, তৎপুত্র রামসুন্দর আচার্য, তৎপুত্র প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, তৎপুত্র সুধীর আচার্য, তৎপুত্র শম্ভু আচার্য। এঁরা সকলেই ছিলেন পট–শিল্পী। তন্তুবায় অধ্যুষিত নরসিংদীতে এ পরিবার আট পুরুষ ধরে পটচিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি তাঁতের শাড়ির পাড়ে নক্‌শা অঙ্কনেও নিযোজিত ছিলেন।[১৪] উল্লেখ্য যে, সুধীর আচার্য পরবর্তীতে বর্তমান নিবাসে বসতি স্থাপন করেন। এছাড়া সুধীর আচার্য মাটির মূর্তি গড়ার কাজ ও প্রাণকৃষ্ণ আচার্য কাঠের কাজ করতেন। সুধীর আচার্য নিজে জ্যোতিষ শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। গণনা ও ঝাড়–ফুঁকের জন্য তাঁর কাছে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই আনাগোনা ছিল। শম্ভু আচার্য জানান, তাঁর পূর্ব পুরুষগণ লগ্ন বিশ্লেষণেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা গাজীর পট, মনসা পট, কৃষ্ণলীলা পট, মহাভারত পট, রামায়ণ/রামপট ইত্যাদি অঙ্কন করতেন। এগুলির মধ্যে গাজীর পট ও মনসা পটের চাহিদা বেশি ছিল বলে শম্ভু আচার্য মত প্রকাশ করেছেন। শৈশবস্মৃতি রোমন্থন করে শম্ভু আচার্য জানান, পটের গ্রাহকগণ বেশির ভাগ ছিলেন সিলেট অঞ্চলের মুসলিম বেদে সম্প্রদায়। তিনি বলেন, সিলেটের বিয়ানী বাজার হতে এক 'দরবেশ' (যিনি ছিলেন একাধারে পটকুশীলব ও 'সওদাগর') তাঁদের বাড়িতে এসে তার বাবার কাছ থেকে গাজীর পট ও মনসাপট ক্রয় করে নিয়ে যেতেন। কিন্তু বাংলাদেশে বতমানে রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, মনসামঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে পট প্রদর্শন ও গায়ন রীতি প্রচলিত না থাকায় শম্ভু আচার্য উল্লিখিত বিষয়ে কোন জোড়ান পট (বা দীঘল পট) অঙ্কন না করে পটের একটি ক্ষুদ্র অংশ চৌকো পটে অঙ্কন করেন বিক্রয়ের আশায়।

শম্ভু আচার্য পট অঙ্কনের জন্য পছন্দ করেন মোটা মার্কিন কাপড়। প্রথমে ভাজা তেঁতুল বিচি রাতে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয় এবং সকালে বিচি হতে কাল খোসা ছাড়িয়ে ভিতরের সাদা শাসটি পাটায় বেটে তা পানি দিয়ে উনুনে জাল দিলে এক প্রকার আঠা তৈরি হয়। পরে এই আঠা গামছা দিয়ে ছেঁকে নেয়া হয়। এরপর ইটের গুঁড়া পাটায় বেটে গামছা দিয়ে চেলে তা

১২. ঐ, পৃ ৬৬
১৩. খগেশকিরণ তালুকদার, *বাংলাদেশের লোকায়াত শিল্পকলা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৭৭
১৪ তোফায়েল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

তেঁতুল বিচির আঠার সাথে মেশান হয়। যে কাপড়ে চিত্র অঙ্কিত হবে সেটি রোদের মধ্যে একটি পাটিতে বিছিয়ে তার সম্মুখ ভাগে (অর্থাৎ যেদিকে চিত্র আঁকা হবে) এক কোট ও পশ্চাৎ ভাগে দুই কোট পূর্বে প্রস্তুতকৃত তেঁতুল বিচির আঠা ও ইটের গুঁড়ার মিশ্রণের প্রলেপ দিয়ে পটের জমিন প্রস্তুত করা হয়। উক্ত জমিনের সম্মুখ ভাগের উপর এক কোট চক পাউডার ও তেঁতুল বিচির আঠার মিশ্রণের আস্তর দেয়া হয়। তারপর চক পাউডার, জিংক অক্সাইড ও বেলের আঠার মিশ্রণ দিয়ে সমগ্র পটটি প্যানেলে ভাগ করা হয়। বেলের আঠার প্রস্তুত প্রণালী একটু ভিন্ন ধরনের। রাতে কাঁচা বেল কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয় এবং সকালে সেই পানি গামছা দিয়ে ছেঁকে নিলেই প্রয়োজনীয় আঠা পাওয়া যায়।

প্যানেল ভাগ করা হয়ে গেলে বিভিন্ন রং—যথা 'ব্ল্যাক অক্সাইড', 'জিংক অক্সাইড', 'ভারমিনা', পিউরি, চাকানীল বা রাজনীল, গোপী মাটি বা এলামাটি ইত্যাদির সাথে বেলের আঠা মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ দ্বারা চিত্রসমূহ অঙ্কন করা হয়। পটুয়া শম্ভু আচার্য পটচিত্র অঙ্কনে বাজার থেকে আনা বিভিন্ন ধরনের তুলি ব্যবহার করে থাকেন। (চিত্র নং ৭ দ্রষ্টব্য)।

শম্ভু আচার্যের কাছ থেকে তাঁর বাবা সুধীর আচার্যের অঙ্কন-কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সুধীর আচার্য গাজীর পট অঙ্কনের জন্য ১৯৮৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ কর্তৃক শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন পুরস্কারে ভূষিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেই অর্থাৎ একই সালের ৬ ফেব্রুয়ারী সুধীর আচার্য ৭৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সুধীর আচার্য মোটা মার্কিন কাপড়ের পাশাপাশি চার হাত দীর্ঘ ও দেড় হাত প্রশস্ত ঘন বুননের গামছাও পট অঙ্কনের জন্য ব্যবহার করতেন। ছবি আঁকার জন্য প্রয়োজনীয় রঙ তিনি নানা ধরনের উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ হতে সংগ্রহ করতেন। যেমন, মশালের উপর উপুর করা মাটির সরার কালি বা কাজল বেলের আঠার সাথে মিশিয়ে প্রস্তুত করতেন কাল রঙ। শামুক বা শঙ্খ গুঁড়ার সাথে বেলের আঠা মিশিয়ে তৈরি হত সাদা রঙ। লাল রঙ পাওয়া যেত মেটে সিঁদুর হতে। শুকনো হলুদ গুঁড়ার সাথে বেলের আঠা মিশিয়ে সৃষ্টি করতেন হলুদ রঙ। নীল রঙ হিসেবে ব্যবহার করতেন তিনি বাজার থেকে কেনা কাপড়ে দেবার নীল। আর সাভার থেকে আনীত গোপী মাটি বা এলামাটি হতে এক ধরনের মেটে হলুদ রঙ সৃষ্টি করতেন। চিত্রাঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় তুলি তিনি নিজেই তৈরি করতেন ছাগল বা ভেড়ার ঘাড়ের লোম দিয়ে। আর জমিন প্রস্তুতকালে আস্তর দেবার জন্য তৈরি করতেন পাটের তুলি। সুধীর আচার্য একইভাবে রোদের মধ্যে একটি পাটিতে গামছাটি বিছিয়ে সম্মুখ ভাগে এক কোট ও পশ্চাৎ ভাগে দুই কোট ইটের গুঁড়া ও তেঁতুল বিচির আঠার মিশ্রণের আস্তর দিয়ে জমিন সৃষ্টি করতেন। তিনি অবশ্য এই আস্তর বেশির ভাগ সময় হাত দিয়ে দিতেন। তবে মাঝে মধ্যে পাটের তুলিও ব্যবহার করতেন। উক্ত আস্তর শুকিয়ে গেলে তার উপর আরো এক কোট সাদা চক পাউডার ও তেঁতুল বিচির আঠার মিশ্রণের প্রলেপ দিতেন। পরে কাঠ খড়ির সাথে বেলের আঠা মিশিয়ে প্রস্তুতকৃত রঙ দ্বারা পটটিকে প্যানেলে ভাগ করতেন। তারপর বিভিন্ন উদ্ভিজ ও খনিজ রঙ ও বেলের আঠার মিশ্রণ দ্বারা পটের চিত্রসমূহ অঙ্কন করতেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, গাজীর পটের মূল চরিত্র গাজী কে? তাঁর সময়কাল কি? এবং গাজী সম্পর্কে যে কাহিনী গাজীর পটে বিবৃত হয়ে থাকে তাঁর সূত্রপাত কবে?

বিশেষজ্ঞগণের অনেকে মনে করেন মুসলিমদের মধ্যে গাজীর কিসসার চিত্রিতরূপ গাজীর পটের নায়ক হলেন ইসমাইল গাজী এবং এ পটের আবির্ভাব ঘটে পনের শতকে।[১৫] কিন্তু এ ধারণা যে ভ্রান্ত তা নিম্নোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হবে।

'গাজী' আরবী শব্দ, অর্থ ধর্মযোদ্ধা। সে অর্থে ইসলাম ধর্ম-প্রচারকদের সবাই 'গাজী'।[১৬] কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম ধর্ম-প্রচারকগণ সাধারণত দুটি দলে বিভক্ত : ১. মুমিন বা নিতান্তই ধর্ম প্রচারক দল এবং ২. গাজী বা ধর্মযোদ্ধা। সাধারণত যাঁরা বিভিন্ন সময়ে সৈন্য-সেনাপতিরূপে বাংলায় এসে ধর্ম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করেছেন তাঁরাই গাজী হিসেবে পরিচিত।[১৭] এঁদের অনেকেই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন কিংবদন্তীমূলক কাব্যে অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ত্রিবেণীর জাফর খান গাজী, উত্তরবঙ্গের শাহ্ ইসমাইল গাজী, দক্ষিণ বঙ্গের বড়খান গাজী প্রমুখ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে জাফর খান গাজী এবং তদীয় পুত্র উগয়ান খান ও বড় খান গাজীর সমাধি বিদ্যমান। সমাধি গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপি হতে জানা যায় যে, ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে (১৩০১-১৩২১) ইসলামের ও রাজন্যবর্গের সাহায্যকারী ও বিশ্বাসীদের পৃষ্ঠপোষক খান জাহান জাফর খান বড় খাঁ কর্তৃক 'দ্বার-আল-খায়রাত' নামে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয়। ত্রিবেণীর ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দের অপর একটি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে যে, দিল্লীর সুলতান কাইকাউসের রাজত্বকালে (১২৯১-১৩০১) এবং জাফর খান গাজী শাসনকর্তা থাকা কালে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। শেষোক্ত লিপিটিতে জাফর খানকে 'সিংহদের সিংহ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আরো উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি প্রতিটি অভিযানে ভারতের বিভিন্ন শহর দখল করেছেন এবং তিনি তাঁর তরবারি ও বর্শার সাহায্যে বিধর্মী বিদ্রোহীদেরকে ধ্বংস করেছেন।[১৮] এছাড়া ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে দেবী কোটের অন্য একটি উৎকীর্ণ লিপিতে সুলতান কাইকাউসের রাজত্বকালে শাসনকর্তা জাফর খান কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মাণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৯] জাফর খান গাজীর *কুসীনামা* (তাঁর মাজারের খাদিমদের দ্বারা সংরক্ষিত) অনুযায়ী তিনি তাঁর ভাগ্নে শাহ্ সুফীর সাথে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসেন। তিনি রাজা মান নৃপতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তবে তিনি হুগলীর রাজা ভূদেবের সাথে এক যুদ্ধে নিহত হন। অবশ্য তাঁর পুত্র উগয়ান খান রাজা ভূদেবকে পরাজিত করেন এবং রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। স্থানীয় একটি জনপ্রবাদ মতে, হুগলীর রাজা ভূদেব সন্তানের জন্মোৎসব করায় জনৈক মুসলমানের পুত্রকে হত্যা করেন। সন্তান হারা শোকাতুর পিতা দিল্লীর দরবারে নালিশ জানান। ফলে

১৫. পারভীন হাসান, "স্থাপত্য ও চিত্রকলা", *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খণ্ড, *সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৬৪৩ ; তোফায়েল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১ ; ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, ঢাকা, ১৯৭৪

১৬. মোমেন চৌধুরী, "গাজীর গান", *বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০*, স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯৯

১৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব, *যশোহর জেলায় ইসলাম*, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৫

১৮. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (১২০৩-১৫৭৬ খ্রি.), মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১০৮

১৯. ঐ, পৃ. ১৫৬। ১৫৬নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দিল্লীর সুলতান জালালউদ্দীন ফিরুজ খলজি তাঁর ভাগ্নে শাহ্ সুফী ও জাফর খান গাজীকে প্রেরণ করেন। তাঁরা ভূদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন।[২০]

বাংলায় ধর্ম প্রচার ও মুসলিম রাজ্যের সম্প্রসারণ ও সংহতির জন্য অপর যে ধর্ম-যোদ্ধার প্রতি বাঙালি মুসলমানগণ সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন তিনি হলেন শাহ্ ইসমাইল গাজী। *রিসালাত-আল-আহদাহ* (ইসমাইল গাজীর জীবন-বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ) হতে জানা যায় যে, শাহ ইসমাইল গাজী মক্কায় নবীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হতেই ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং নিজেকে শিক্ষা দান ও ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত করেন। তিনি বাংলার সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯-৭৪)-এর রাজত্বকালে লক্ষণাবতীতে আসেন। অতি শীঘ্রই তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করে সুলতান কর্তৃক গাজী উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। শাহ্ ইসমাইল গাজী উড়িষ্যার রাজা গজপতিকে পরাজিত করে মান্দারণ দখল করেন এবং কামরূপের রাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযানে জয়লাভ করে তাঁকে সুলতানের করদ রাজে পরিণত করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি ঘোড়াঘাট দুর্গের হিন্দু অধিনায়ক ভান্দসী রায়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সুলতানের আদেশে ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ইসমাইল গাজীর শির রংপুরের কাঁটা দুয়ারে (কান্তদুয়ার) এবং মস্তকহীন দেহ হুগলী জেলার মান্দারণে সমাধিস্থ করা হয়।[২১] এখনও দু'স্থানেই তার মাজার বিদ্যমান-যা কালক্রমে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত।[২২] মধ্যযুগের বহু মঙ্গলকাব্যের দিক-বন্দনায় কবিরা বিভিন্ন দেব-দেবী ও পীরের সঙ্গে পীর ইসমাইলেরও বন্দনা করেছেন।[২৩] আলোচ্য ইসমাইল গাজীর মাহাত্ম্য কাহিনী নিয়ে ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শেখ ফয়জুল্লাহ *গাজী বিজয়* রচনা করেন। সেখানে ইসমাইল গাজীকে রংপুরের খোঁটা দুয়ারের পীর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[২৪]

অপরদিকে, সম্ভবত, আঠার শতকের শেষ ভাগে রচিত আব্দুল গফুরের *গাজী সাহেবের গান* বা *কালু গাজী-চম্পাবতীর পাঁচালী,* সৈয়দ হালু মিঞার *বড়ে খাঁ গাজীর কেরামতি* এবং ময়মনসিংহের আব্দুল রহীমের *গাজীর পুঁথি* ইত্যাদিতে বর্ণিত কাহিনীর মূল উপজীব্য বড় খান গাজীর মাহাত্ম্য ও গুণকীর্তন, যিনি যশোর-খুলনা অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। *গাজী সাহেবের গান*-এর বিবরণানুযায়ী, বড় খান গাজী ছিলেন বৈরাট নগরের বাদশাহ্ শাহ সেকান্দরের পুত্র। শাহ্ সেকান্দরের বড় পুত্র জুলহাস শিকারে গিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়। পুত্রহারা রানী সমুদ্রে ভেসে আসা মঞ্জুষার মধ্যে একটি শিশুকে পেয়ে ছেলের মত মানুষ করতে থাকে। যার নাম কালু, কিছু পরে রাণীর কোলে বড় খান গাজীর জন্ম হয়। কালু ও গাজী শৈশব হতেই ধর্মপ্রবণ হয়ে ওঠে। এক রাত্রে কালুকে সাথে নিয়ে গাজী ফকির সেজে

২০. ঐ, পৃ. ১০৮-১০৯
২১. ঐ, পৃ. ১১৬
২২. মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, *রংপুরে ইসলাম,* ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬৯
২৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছরের ইতিহাস* (স্বাধীন সুলতানের আমল) পৃ. ১৮৮-১৮৯। উদ্ধৃত, মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, *রংপুরে ইসলাম,* পৃ. ৬৯
২৪. আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৪৬

বেড়িয়ে পড়েন বৃহৎ সংসারের খাতিরে। তাঁরা এসে পৌঁছেন সুন্দরবনে। সেখানে বাঘ–কুমীর, জেন–পরী সকলে গাজীর শিষ্যত্ব বরণ করেন।

কিছুকাল পরে তাঁরা সাফাইনগরের রাজা শ্রীরামের দেশে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা রাজা শ্রীরামকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। রাজসভার আতিথ্য সুখে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর কালু ও গাজী এক বনান্তে পৌঁছে সোনাপুর নামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। একরাতে পরীদের মতলবে হিন্দু ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের ভক্ত অনুসারী ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতীর সাথে গাজীর আংটি বদল হয়। এরপর থেকে চম্পাবতী স্বামী (গাজী)–কে পাবার আশায় শিবপূজা করতে থাকে। অন্যদিকে গাজী বিরহে ব্যাকুল হয়ে কালুকে সাথে নিয়ে ব্রাহ্মণ নগরের পথে রওনা হন। তিন মাস পর তারা ব্রাহ্মণ নগরের উপকণ্ঠে পৌঁছেন। রাজা চম্পাবতীর সাথে গাজীর বিয়ে দিতে অস্বীকার করায় এবং কালুকে বন্দী করায় গাজী রাজা মুকুট রায়ের বিরুদ্ধে ব্যাঘ্রবাহিনী প্রেরণ করেন। তুমুল সংঘর্ষের পর মুকুট রায় পরাজিত হন। সেই সাথে গাজী চম্পাবতীকে লাভ করেন। অবশেষে সকলে মিলে বৈরাট নগরে প্রত্যাবর্তন করেন।[২৫]

উল্লেখ্য যে. উপরোক্ত সকল পুঁথিতেই বড় খান গাজীকে সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্রপীর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, গাজী সাহেব ব্যাঘ্রপীর হিসেবে প্রথমে আবির্ভূত হন বাদা অঞ্চলে তথা সুন্দরবনে এবং সেখান থেকে সারা বাংলায় তার খ্যাতি প্রসার লাভ করে।[২৬]

গাজী কোথাও জিন্দাগাজী বা জিন্দাপীর আবার কোথাও কোথাও বাঘাই পীর হিসেবে পবিচিত। বাঘের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার আশায় অনেকেই গাজীর পূজা শিরনি দেয়। উল্লিখিত কিংবদন্তীর গাজী সম্পর্কে কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত, তিনি তের শতকের প্রথমার্ধে সিলেট থেকে সুন্দরবনে আগমন করেন। সেখানে বেশ কিছুকাল যাবৎ ধর্মপ্রচার ও আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এরপর তিনি বারবাজারের ছাপাই নগরের রাজা শ্রীরামের দেশে গিয়ে তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে রাজা পরাজিত ও নিহত হন।[২৭] বার বাজার হতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে আজও গাজী, কালু ও চম্পাবতীর কথিত সমাধি বিদ্যমান। আর এর পশ্চাতে বিদ্যমান দীঘিটি স্থানীয়ভাবে রাজা শ্রীরামের দীঘি এবং দীঘির মাঝে দ্বীপের ন্যায় যে উঁচু জায়গাটি দেখা যায় সেখানে রাজা শ্রীবামের প্রাসাদ ছিল বলে স্থানীয় জনশ্রুতি–মূলে জানা যায়।[২৮]

উপরে উল্লিখিত জাফর খান গাজী, শাহ্ ইসমাইল গাজী ও বড় খান গাজী সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্যাদি ও কথা–কিংবদন্তীসমূহের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল : হিন্দু রাজ্য দখল ও হিন্দু রাজাদের ধর্মান্তরিতকরণ। উপরন্তু এঁরা সকলেই দু'জন হিন্দু রাজার সাথে যুদ্ধ করেন। *কুর্সীনামার* বিবরণ অনুসারে জাফর খান গাজী যেখানে রাজা ভূদেব কর্তৃক পরাজিত

২৫. *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, পৃ ৮২–৮৬
২৬. মোমেন চৌধুবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০
২৭. নাসিব হেলাল সম্পাদিত, *সীমান্ত*, পঞ্চম সংখ্যা, '*বাববাজাবেব ঐতিহ্য*', সংখ্যা ঢাকা ১৯৯৩, পৃ ১৭
২৮. নিবন্ধকাব কর্তৃক বাববাজাব এলাকা পবিদর্শনকালে স্থানীয় জনগণ হতে প্রাপ্ত তথ্য।

ও নিহত হন এবং তদীয় পুত্র উগয়ান খান আবার রাজা ভূদেবকে পরাজিত করে রাজকন্যাকে বিয়ে করেন, গাজী সাহেবের গানে সেখানে বড় খান গাজী রাজা মুকুট রায়কে পরাজিত করে রাজকন্যা চম্পাবতীকে বিয়ে করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাফর খান গাজী ও তৎপুত্র উগয়ান খানের কাহিনী মিলে গিয়ে অপর পুত্র বড় খান গাজীকে কিংবদন্তীর বড় খান গাজীতে রূপান্তর করা হয়। এর সাথে শাহ্ ইসমাইল গাজীর কাহিনীর অংশ বিশেষ এবং কিছু লোককথা ও পীর-দরবেশদের যে ভাবমূর্তি সাধারণ মানুষের মাঝে গড়ে উঠেছিল সে-সকল উপাদানের সমন্বয়েই সৃষ্টি হয় বর্তমানে প্রচলিত পীর বড় খান গাজীর মাহাত্ম্য কাহিনী।[২৯]

এখন প্রশ্ন হল কিংবদন্তীর এই বড় খান গাজীর উদ্ভব কবে? এ প্রসঙ্গে স্থানীয় দেব-দেবীর পূজা উৎসবের উদ্দেশ্যে রচিত মঙ্গলকাব্য আমাদের অনুসন্ধানে একটি সহায়ক সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়কে মূল উপজীব্য করে প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য কৃষ্ণরাম রচিত রায় মঙ্গল (১৬৮৬-৮৭)-এ বড় খান গাজীর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এ-কাব্যে হিন্দু দেবতা দক্ষিণ রায় ও মুসলমান পীর গাজীর তুল্য মাহাত্ম্য ও সখ্য দেখিয়ে কাহিনী শেষ হয়েছে। সুকুমার সেন বলেন, সুন্দরবন অঞ্চলের হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের প্রতিপক্ষ হিসেবেই বাঙালি মুসলমানগণ কর্তৃক দক্ষিণের অধীশ্বররূপে বড়খান গাজীর সৃষ্টি।[৩০] সেই সূত্রে মুসলমান কবির *গাজী মঙ্গল* বা *গাজীর পাঁচালী* নিবন্ধকে হিন্দু কবির রায় মঙ্গল নিবন্ধের প্রতিরূপ বলা চলে।[৩১]

কৃষ্ণরাম রচিত *রায় মঙ্গল* দক্ষিণ রায় সম্পর্কিত প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্য হলেও কবি মাধব আচার্য নামের পূর্বতন এক কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন যিনি কৃষ্ণরামের পূর্বে *রায় মঙ্গল* রচনা করেছিলেন। এ থেকে অনুমান করা সঙ্গত হবে যে, পীর বড় খান গাজী ১৬৮৬-৮৭-এর পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত এক পীর। অপর দিকে সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, মুকুন্দরাম বিরচিত *চণ্ডী মঙ্গল* কাব্যে কালকেতু ও বাঘের সংঘর্ষ দৃশ্য হতে বোঝা যায় যে, যে সময় *চণ্ডী মঙ্গলকাব্য* রচিত হয় (অর্থাৎ ১৫৫৫-৫৬) ঠিক তখনও দক্ষিণের ক্ষেত্রপাল ব্যাঘ্র দেবতার (দক্ষিণ রায়) উদ্ভব হয়নি।[৩২] অতএব দক্ষিণ রায়ের উদ্ভবকাল ১৫৫৫ এবং ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কোন সময়। আনুমানিক ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ ধরে নেয়া যেতে পারে। সুকুমার সেনের সূত্র ধরে আরো অনুমিত হয় যে, দক্ষিণ রায়ের প্রতিপক্ষ হিসেবে মুসলমানগণ কর্তৃক পীর বড় খান গাজীর কাহিনীর উদ্ভব ঘটে। অতএব বলা যায় যে, বড় খান গাজী সম্ভবত দক্ষিণ রায়ের সমসাময়িক অথবা তার কিছু পরে আবির্ভূত হন। পরবর্তীতে সম্ভবত সতের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এই পীরকে নিয়ে কিংবদন্তীমূলক কাব্য

---

২৯ সৈয়দ জামিল আহমেদ রচিত, 'Indigenous Theatre of Bangladesh' শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ।

৩০. *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৭৩

৩১ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৪৭২

৩২. ঐ, পৃ ২৬১

মৌখিকভাবে রচিত হতে শুরু করে। আমরা জানি যে, আঠার শতকে হুগলী জেলার ভুরশুট মান্দারণে বড় খাঁ গাজীকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সাহিত্যের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।[৩৩] এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বড় খান গাজীর মাহাত্ম্য-কাহিনীর লিখিতরূপ প্রকাশিত হয় আঠার শতকে এবং ভুরশুট হতেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সকল পুঁথি ছড়িয়ে পড়ে।

ওয়াকিল আহমদ, পারভীন হাসান, তোফায়েল আহমদ প্রমুখ পণ্ডিত যে দাবী করেছেন, গাজীর পটের উৎস শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত *গাজী বিজয়,* সে-দাবী অগ্রাহ্য করার কারণ উল্লিখিত কাব্যের সাথে পীর বড় খাঁ গাজীর সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। বরং উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সতের শতকের মধ্যবর্তী সময় হতে মৌখিকভাবে পীর বড় খাঁ গাজীকে কেন্দ্র করে রচিত কিংবদন্তীমূলক কাব্যের সাথে গাজীর পটের কেন্দ্রীয় চরিত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। অতএব অনুমান করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে গাজীর পটের উদ্ভব ঘটেছে সতের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে অথবা তার কিছু পরে। যদি তিন পুরুষ সমান এক শতক ধরা যায়, তবে উপরোক্ত অনুমানের সাথে শম্ভু আচার্যের দাবী যে তাঁর বংশ নয় পুরুষ ধরে গাজীর পট অঙ্কন করেন, তার সমর্থন মেলে।

এতক্ষণে গাজীর পটের বর্ণনাংশের উৎস সম্পর্কে পাঠক মনে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা জন্মেছে আশা করি। এবারে গাজীর পট অঙ্কনের উৎস অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করা যেতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাজীর পটে তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে : (১) গাজীর মাহাত্ম্য ও গুণকীর্তন, (২) সামাজিক হিতোপদেশ, এবং (৩) যমরাজের শাস্তি। একইভাবে হিন্দু পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর কাহিনী-আশ্রিত বেশকিছু পটেও উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত দুটো কৃষ্ণলীলা, দুটো রাম অবতার, একটি রামলক্ষ্মণ ও একটি সিন্ধুবধ প্রভৃতি পটের বর্ণনাংশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৩৪] কৃষ্ণলীলা, রাম অবতার প্রভৃতি পট ও গাজীর পট উভয় ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল পটের শেষ ভাগে কয়েকটি চিত্রের মাধ্যমে পাপকার্যের জন্য যমরাজের শাস্তি সম্পর্কিত বর্ণনা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বিচারে দুটো পটের উৎস একই, যা সম্ভবত যমপট। প্রাচীন যমপটসমূহে ধর্মরাজ যমের মূর্তি এবং যমালয়ের নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য অঙ্কিত হত। উদ্দেশ্য ছিল যমালয়ে পাপীর নিদারুণ শাস্তি ভোগ সম্পর্কে চিত্র ও কথার মাধ্যমে সচেতন করে মানুষকে জাগতিক পাপ ও অন্যায় কার্য হতে বিরত করা। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে বাণভট্ট বিরচিত হর্ষচরিতে এ ধরনের যমপটের উল্লেখ পাওয়া যায়। হর্ষচরিতের বর্ণনা মতে রাজা প্রভাকর বর্ধনের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে যুবরাজ হর্ষবর্ধন শিকার হতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে একজন যমপটুয়াকে গানের মাধ্যমে পট প্রদর্শন কবতে দেখেন—

(নগরে) প্রবেশ করেই বাজারের
রাস্তায় (হর্ষবর্ধন) দেখলেন যে
একদল উৎসুক ছেলে ঘিরে আছে

৩৩. *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* পৃ. ৯১
৩৪. গুরুসদয় দত্ত, *পটুয়া সঙ্গীত,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, পৃ. ৬-৯, ১২-১৬, ৪১-৫২, ৫৫-৬২, ৬৬-৬৮

গাজীর পট পরিবেশনরত দুর্জন আলী

গাজীর পট : কেন্দ্রীয় প্যানেল
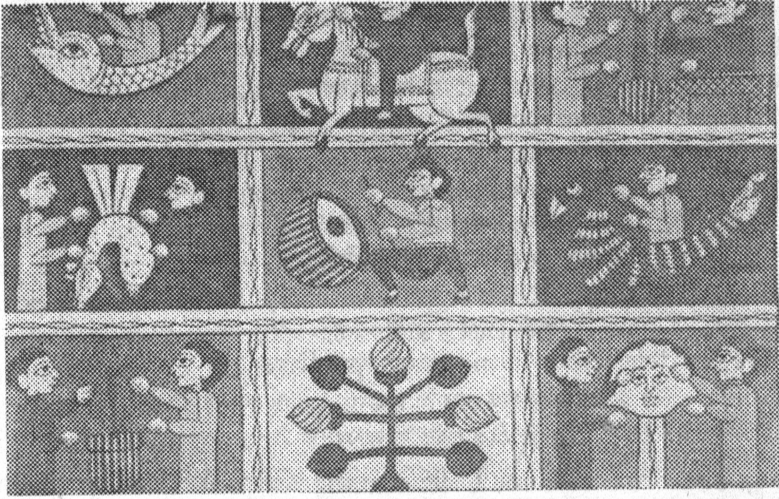
গাজীর পট : উপরের তিন সারি প্যানেল
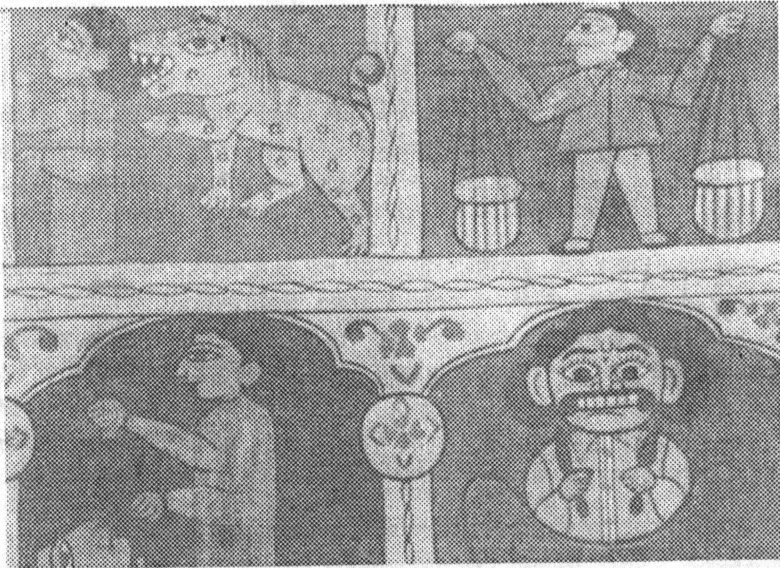
গাজীর পট : নিচের দুই সারি প্যানেল

আর এক যমপটুয়া ("যমপট্টিক")
বাঁ হাতে লাঠিতে উঁচু তুলে ধরা,
ভীষণ মহিষের উপর আরূঢ়
যম রাজের চিত্রযুক্ত পটে ডান হাতে
ধরা একটি শরকাঠি দিয়ে
(দেখিয়ে) পরলোক (পাপার)
দুর্দশা বর্ণনা করছে। তার
গাওয়া এই শ্লোকটিও (তিনি)
শুনলেন,
'হাজার হাজার মাতা পিতা
শত শত পুত্র পরিবার
যুগে যুগে চলে গিয়েছে
তারা কার তুমিই বা কার।[৩৫]

বাংলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল রাজা হর্ষবর্ধনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন।[৩৬] সেই সূত্রে তাঁর আমলে বাংলায়ও যে যমপট প্রদর্শন ও গায়নরীতি প্রচারিত ছিল তা অনুমান করা অস্বাভাবিক নয়। কিছুকাল পূর্বেও ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ এলাকায় যমপট প্রদর্শিত হত বলে জানা যায়। সেখানে যমরাজা কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত বিভিন্ন পাপীর কাহিনী বর্ণনা করা হত ৪ হাত দীর্ঘ ও ২১/২ হাত প্রশস্ত পটের মাধ্যমে।[৩৭] খুব সম্ভব, মধ্যযুগের শুরু হতে কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মনসামঙ্গলের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে পট আঁকা শুরু হয়, যার শেষভাগে যমরাজের শাস্তি সম্পর্কিত চিত্রের স্থান নির্ধারিত হয়। গাজীর পট অঙ্কনের ক্ষেত্রেও একই কাঠামোব অনুসরণ করা হয়েছে বিধায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধা থাকে না যে, উপরোক্ত হিন্দু পৌরাণিক ও লৌকিক বিষয় সম্বলিত পটসমূহের অনুকরণেই সম্ভবত গাজীর কাহিনী উপস্থাপনের নিমিত্তে গাজীর পট অঙ্কন ও প্রদর্শন রীতির প্রচলন ঘটে।

তবে মজার বিষয় হল, কৃষ্ণলীলা পট, মনসা পট, রাম অবতার পট ইত্যাদির সাথে গাজীর পটের বিন্যাসগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও অঙ্কন শৈলীগত বৈসাদৃশ্য প্রকট। অতএব গাজীর পটকে কেবল অনুকরণ বলা ঠিক হবে না। কেননা, কৃষ্ণলীলা, মনসা কিংবা রাম অবতার পটে শিল্পী কেবল সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক রেখা এবং অল্প কিছু রঙের প্রয়োগে আড়ষ্টহীন বাস্তবধর্মী চিত্র রূপায়ণে লাবণ্য ও লালিত্য যোজনা করতে সমর্থ হয়েছেন। এখানে অঙ্কিত মনুষ্য প্রতিকৃতিসমূহ সজীব ও স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি সম্পন্ন। এমনকি জীবজন্তু অঙ্কনের ক্ষেত্রেও অসাধারণ দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। তবে বৃক্ষলতাদির অঙ্কন

৩৫. সুকুমাব সেন, *নট নাট্য নাটক*, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ২৪, ২৫
৩৬. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, *বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা* : ১১০০-১৯০০, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১২
৩৭. মোহাম্মদ সাইদুর (গবেষক, ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী)-এব সাথে নিবন্ধকাবেব সাক্ষাৎকার।

কৌশল এখানে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অর্থাৎ আলঙ্কারিক। অপরদিকে, গাজীর পটের চিত্রসমূহ তুলনামূলকভাবে বাস্তবতা বিবর্জিত কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতার জালে আবদ্ধ। উপরন্তু জীবজন্তু ও মনুষ্য সকল প্রতিকৃতি অঙ্কনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সুললিত ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায় না। প্রতিকৃতিসমূহের অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রথাসিদ্ধ রীতির অনুসরণ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া রেখার প্রয়োগ ও বর্তনা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও শিল্পীর ইচ্ছাকৃত অনীহা প্রতীয়মান হয়। উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, বাংলায় প্রচলিত অন্য সকল পটের অঙ্কন শৈলী হতে গাজীর পটের অঙ্কন শৈলী একটি ভিন্ন রীতির দাবীদার। আর সে কারণেই একই শিল্পী শম্ভু আচার্য অঙ্কিত কৃষ্ণলীলা (চিত্র নং-৮, ৯, ১০ দ্রষ্টব্য), মহাভারত চিত্র নং-১১ দ্রষ্টব্য), মনসা (চিত্র নং-১২ দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি পটের ছন্দ ও লালিত্যে ভরা আড়ষ্টহীন ও সজীব প্রতিকৃতিসমূহের পাশাপাশি গাজীর পটে প্রথাসিদ্ধ রীতিতে চিত্রায়িত প্রতিকৃতিসমূহ কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতার জালে আবদ্ধ। সুতরাং শিল্পী অদক্ষ এমন ধারণা করার কোন কারণ নেই বরং তিনি একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রীতির ঐতিহ্য অনুসরণ করেই গাজীর পট অঙ্কন করেন। গাজীর পটের চিত্রসমূহকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দানের উদ্দেশ্যেই সম্ভবত এই শ্রেণীর পটের আদি শিল্পী ইচ্ছাকৃতভাবে অঙ্কন শৈলীতে এরূপ ভিন্নতা আনয়ন করেন। কিংবা ইসলাম ধর্মে ত্রিমাত্রিক পদ্ধতিতে মনুষ্য ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কন নিষিদ্ধ ধারণা করায় সম্ভবত মুসলিম সমাজে গাজীর পট অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে এই আলঙ্কারিক রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল। অথবা হিন্দু শিল্পীর নিজস্ব বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার সাথে মুসলিম ঐতিহ্যের বৈসাদৃশ্য থাকায় নিজের অজান্তেই এ পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

গাজীর পটের উপস্থাপনা রীতি, চিত্রাঙ্কন শৈলী ও উৎস সংক্রান্ত আলোচনার শেষে গায়েন, চিত্রকরদের সামাজিক বিষয়ে গুটি কয়েক জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের পটের গান সম্পর্কে খুব সামান্য সমীক্ষণ-বিশ্লেষণ হয়েছে। এ সম্পর্কে আলোকপাত করার মত যথেষ্ট উপাত্ত এখনও সংগৃহীত হয়নি বিধায় বিষয়টির উপর মন্তব্য করা সমীচীন নয়। তবুও আগ্রহী পাঠকের মনে কৌতূহল উদ্রেক হবে এবং এ-সম্পর্কে ভবিষ্যতে বিস্তারিত অনুসন্ধান হবে এই আশা করে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত নিম্নে সন্নিবেশ করা গেল।

আশুতোষ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রধানত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি পশ্চিম সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলায় চিত্রকর বা পটুয়া নামে পরিচিত এক শ্রেণীর লোক বাস করেন। এঁরা একাধারে পট অঙ্কন, বর্ণনাংশ রচনা ও পটের গান পরিবেশন করেন এবং সাপুড়ের ব্যবসা এঁদের কৌলিক বৃত্তি। কিন্তু হিন্দু সমাজে এঁরা পতিত, মুসলমান সমাজেও এঁদের ঠাঁই নেই। জনশ্রুতির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, দেবতার মহিমা কীর্তনের পরিবর্তে লৌকিক আদর্শ অনুসরণের জন্য ব্রহ্মার শাপবশত তাঁদের এই দুর্গতি হয়েছে। এথেকে তিনি অনুমান করেন যে, হিন্দু আদর্শ অতিক্রম করার প্রবল এই বাসনা একটি অনার্য ধারার ইঙ্গিতবহ।[৩৮] প্রায় একই মত পোষণ করেন গুরুসদয় দত্ত। তিনি দেখিয়েছেন যে, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণের দশম অধ্যায়ে 'চিত্রকর' জাতির উৎপত্তি কাহিনীর সূত্রানুসারে ব্রাহ্মণ বৈবর্ত্ত ভগবান বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে গোপকন্যাবেশী অপ্সরা

৩৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ১৭২-৭৩

ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রকর জাতির আদিপুরুষ জন্ম লাভ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ও ঘৃতাচীর পুত্র জন্মেছিল নয় জন : মালাকার (মালাকর), কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধর, চিত্রকার (চিত্রকর) ও স্বর্ণকার। এই হিসাবে পটুয়ারা হিন্দু সমাজের অপর শিল্পী শ্রেণীর সগোত্র এবং তাঁদের মতই সম্মানর্হ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এও উল্লেখ করেছে যে, চিত্রকরগণ ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট চিত্র পদ্ধতির ব্যতিক্রম করেছিলেন বলে তাঁরা সমাজে পতিত হয়। এথেকে তিনি অনুমান করেন যে, "বাংলার জাতীয় শিল্পী পটুয়াগণ (...) ব্রাহ্মণ সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই তাহারা সমাজ হইতে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পতিত হইয়াছিল।"[৩৯]

অপর দিকে, বিনয় ঘোষ ও বারীদবরণ ঘোষ দেখিয়েছেন যে, সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত 'চক্ষুদান' পট অঙ্কন ও পদ্ধতি হতে যমপট এবং যমপট হতে বিভিন্ন দেব-দেবীর স্তুতিবিষয়ক পটের উদ্ভব।[৪০]

পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, এখানে পটুয়া নামের কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই। তাঁর মতে, এখানে পঞ্চকল্যাণী (অর্থাৎ বিভিন্ন দেব-দেবীর লীলা আশ্রিত পট) দেখান হয়—যা আচার্য ব্রাহ্মণ কিংবা কুম্ভকারগণ চিত্রিত করেন। কিন্তু এ সকল পট দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করেন নমঃশূদ্র প্রমুখ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ। গাজীর পট সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, এই শ্রেণীর পট অলৌকিকতার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হবার কারণে 'ইহাদের মধ্য হইতে সাহিত্য রস উদ্ধার অসম্ভব'। 'ধর্ম প্রচারের বাহন' গাজীর পট সাহিত্যরস পরিবেশক নয় হেতু তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেছেন।[৪১] অপরদিকে খগেশকিরণ তালুকদার বলেন, "সিলেট-ময়মনসিংহে এখনও নাগারতি সম্প্রদায়ভুক্ত পটুয়ারা গাজীর পট দেখিয়ে গাজীর পালা পরিবেশন করে থাকেন।"[৪২] এরা মুসলমানের রীতি ও হিন্দুর ধর্ম পালন করেন। তিনি মনে করেন, "সম্ভবতঃ এঁরা আদিম কৌম সমাজ থেকে সরাসরি ইসলাম গ্রহণ করে কৌম সংস্কার ও জীবিকার তাগিদে পট শিল্পের বৃত্তি অবলম্বনে অথবা পূর্বতন বৃত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে সাবেক গ্রাম সমবায় ব্যবস্থার সামিল ছিল।"[৪৩] কিন্তু বর্তমান নিবন্ধকারের মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে দেখা গেছে গাজীর পটের দু'জন গায়ের (দুর্জন আলী ও কোনাই মিয়া) বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত এবং দুজন শিল্পী (সুধীর আচার্য ও তদীয় পুত্র শম্ভু আচার্য) আচার্যকুলভুক্ত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের পূর্বোল্লিখিত সূত্রের ইঙ্গিত হতে প্রতীয়মান হয় যে, চিত্রকর জাতি সম্ভবত আর্য ব্রাহ্মণ ও অনার্য সূত্র হতে উদ্ভব মিশ্র বা সংকর জাতি। বাংলাদেশের আচার্য ব্রাহ্মণ বেদে ও অনার্য সূত্র হতে উদ্ভব মিশ্র বা সংকর জাতি। কিন্তু বাংলাদেশের আচার্য ব্রাহ্মণ বেদে এবং নাগারচি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের

৩৯. গুরুসদয় দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১/-১/.
৪০. বিনয় ঘোষ, Traditionul Arts & Crafts of West Bengal, (A Sociological Survey), কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৮১-৮২ ; বারীদববণ ঘোষ, *পটপটুয়া পট-গীতি*, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৭
৪১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
৪২. খগেশকিরণ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৪৩. ঐ, পৃ. ৭৫

মধ্যকার সম্পর্ক সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এখন প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের গাজীর পট পরিবেশনকারী কুশীলবদের প্রকৃত পরিচয় কি? এঁরা কি সত্যি আদিম কোন কৌম ভুক্ত জনগোষ্ঠীর শেষ বংশধর, নাকি অনার্য জনগোষ্ঠীর অবশিষ্টাংশ যাঁরা ব্রাহ্মণত্বের চাপে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হতে বাধ্য হন, কিন্তু মুসলমানদের আগমনের পর পূর্বোক্ত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন? কিভাবে এঁরা গাজীর পট পরিবেশনে আগ্রহী হলেন? পশ্চিমবঙ্গের পটুয়াদের সাথে এঁদের সম্পর্ক কি? আচার্য ব্রাহ্মণগণ প্রকৃতপক্ষে কারা? এবং কি করে তাঁরা পট অঙ্কনের সাথে যুক্ত হলেন? আশা করা উচিত হবে যে, শীঘ্রই কোন গবেষণার মাধ্যমে এসকল প্রশ্নের উত্তর লাভ করা যাবে।

তরুণ ঘোষ

পটচিত্রে মিথ : প্রসঙ্গ বেহুলা

লোকশিল্পকলা ও লোকধর্মের সাথে মিথের রয়েছে এক অন্তর্লীন সম্পর্ক। মিথিক্যাল ভাবনাসম্পৃক্ত ধর্ম-কৃত্যের পরিক্রমায় আমাদের দেশের শিল্পকলার একটি বড় অংশ গড়ে উঠেছে—কেবল আমাদের দেশেই কেন, প্রায় সব দেশেই।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে যাদু ধর্ম পুরাণ প্রতীকের অন্তরালে অন্তনির্হিত বিশ্বাসই আদিম মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশে জীবনের প্রয়োজনীয় রসদ যুগিয়েছে। বাস্তবতার সমান্তরালে মানুষের অতিলৌকিক-কাল্পনিক এই সব মিথ—পুরাণ মানুষের চিন্তায় চেতনায় মননে শিল্প-সাহিত্যে ধর্মে আহারে উৎসবে আজ অবধি বহমান। প্রাক-পৌরাণিক সময় কাল থেকেই আদিম মানুষ একত্রে শিকার লাভের গোষ্ঠীগত আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতো নানা কৃত্যের (Ritual) মাধ্যমে। বিভিন্ন জায়গায় অভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ একই নিয়মকানুনে অভ্যস্ত হতে শিখেছে। গড়ে উঠেছে সেই গোষ্ঠীর নিজস্ব শিক্ষা, শিল্প, কৃষ্টি তথা সার্বিক জীবনচর্যা। যার ফলে গোত্রের অন্তর্গত কোন একজন শিল্পী কার্যত তার গোষ্ঠীর সামষ্টিক অনুভূতিকেই উপস্থাপন করেন। একই কারণে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত অন্যসব শিল্পীও প্রায়-অভিন্ন প্রকরণ-রীতি অনুসরণ করে থাকেন।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের প্রায় অনক্ষর সমাজে মানুষের যাপিত জীবনে লোক-ধর্ম ও মিথ-পুরাণে বিশ্বাস অত্যন্ত প্রকট। এদেশের জনগোষ্ঠী আবহমান কাল ধরে এইসব পুরাণ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধারণ করে আসছে মানবতার ধারাক্রম। আর তাই জনমানসে গড়ে উঠেছে পৌরাণিক আবহের সমান্তরাল এক মানুষিক সম্পর্ক। অলৌকিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয় এদেশের মানুষকে ধর্মের অনুগামী যেমন করেছে তেমনি ধর্মকে করেছি মিথ-আশ্রয়ী।

ভারতীয় উপমহাদেশে সর্ব প্রাচীন চিত্র পদ্ধতিটি হলো পটচিত্র ; হিন্দু ও মুসলিম বিষয়বস্তু নিয়ে আজও পটচিত্র আঁকা চলছে। গ্রাম-বাংলার শিল্পীদের আঁকা পটচিত্র এদেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মের লোকজ বোধকে ধারণ করে চলেছে। শিল্পীদের উপলব্ধিজাত এইসব পটচিত্র এদেশের সাধারণ মানুষের মানবিক অনুভূতিকে স্পন্দিত করে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আমরা এখানে বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয়—মনসা পটচিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করবো। অসংখ্য নদীনালা, খালবিল ঘেরা বাংলাদেশে সর্পদেবী 'মনসা'র ভূমিকার কথা বাঙালিমাত্রেরই জানা। মনসা এদেশের অন্যতম প্রধান লোক-দেবতা। ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে, এদেশে সাপের আত্যন্তিক উৎপাতের ভীতি থেকেই আদিম সর্পপূজার উদ্ভব ; ভীতসন্ত্রস্ত অসহায় সাধারণ মানুষকে শরণ নিতে হয়েছে সর্পদেবী মনসার। ভয় এবং প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বাংলার জনসাধারণের মধ্যে লোকধর্ম-পুরাণের বিশ্বাস হয়েছে সুদৃঢ়।

মনসা-কাহিনীর সূত্রপাত বৈদিক যুগ শেষ হওয়ায় পূর্বেই। তখন তিনি বাস্তুদেবী ও গ্রামদেবীতে পরিগণিত হতেন। বিভিন্ন রকম প্রাচীন মিথ-পুরাণের মিথষ্ক্রিয়ায় মনসা কাহিনীটি গঠিত। মনসার অনিবার্য উপস্থিতি ও দুর্দমনীয় প্রতাপে-বাংলার পটচিত্রীরা পরবর্তীকালে মনসা উপাখ্যানকেই তাদের অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আর এই মনসা পটে "বেহুলা লখীন্দর" উপাখ্যান অংশটুকু সাধারণ জন-মানসে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পায় এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ উপাখ্যানচিত্রে পটুয়ারা যে ছকবন্ধ কাহিনী পরম্পরা তৈরী করেন তাতে প্রথমে দেখা যাবে—কুণ্ডলীকৃত পদ্ম, পদ্মের নিম্নাংশের পাপড়ির রং সবুজ। সাপের ডোরা কাটা দাগগুলি অনেকটা কড়ির মত—যা ভীতির সঞ্চারক। সাপের ওপর উপবিষ্ট চতুর্ভুজা মনসা। দৃপ্ত নেত্র—দূরে নিবদ্ধ দৃষ্টি। তিনি যে সাপের দেবী এটা বোঝানোর জন্য তাকে দেখানো হয়েছে—সর্পাসীনা এবং দু'হাতে দুটি কালো রঙের কাল-কেউটে। একটি পা তার সাপের মাথায় ন্যস্ত। এক হাত মুষ্টিবদ্ধ-দৃঢ়, অন্য হাতে অভয়মুদ্রা। সাপ-বিষ আর ভয়ের মুদ্রায় একদিকে তিনি ভয়ংকর চণ্ড-মূর্তিমতী, বিপরীতে তিনিই আবার বরাভয় বরদাত্রী অভয়মুদ্রাধারিণী করুণা ও মাতৃকাসুলভ অভয়দাত্রী। একপাশে দেখা যাবে একজন পরিচারিকা অন্য পার্শ্বে অনমনীয় 'চাঁদ সওদাগর' গদা হাতে দৃঢ় ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে। লক্ষণীয়, এই বৈপরীত্য এসব পটচিত্রের একটি বিশেষ চরিত্র। পরবর্তী একটি ফ্রেমে দেখা যাবে বেহুলা ও লখীন্দরের বিবাহ-বন্ধনের এক আনুষ্ঠানিক পর্ব। বর ও কনে পাশাপাশি বসে আছে—সামনে মঙ্গলঘট। ঠিক তাদের মাথার ওপর পাল্কি নিয়ে অপেক্ষমান চারজন পাল্কিবাহক বা বেহারা। বেহারাদের দু'পাশে দু'জন বাদ্যকার। বাঙালির বিবাহকৃত্যের আনুষ্ঠনিকতার প্রতিফলন রয়েছে এদের মধ্যে। পরিমিত জ্ঞানে কাহিনীর ভূমিক্ষেত্রটি রচিত ও বিভক্ত করা হয়েছে। আবেদন যেখানে গীতিময় সেখানেও পটের গান বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয়। পটের ছবির সাথে উপস্থাপন করা পটের একটি গান এখানে উদ্ধৃত করছি। এখান থেকেই সত্যের যথার্থ প্রমাণিত হবে—

"মনসা সে জগৎগামী জয় বিষহরি।
আমি নাগের মালার পরমা সুন্দরী॥
নাগের হল ঘাট-পাট নাগের সিংহাসন।
মঙ্গলা বড়ার পিঠে দেবীরই আসন॥
তরজে গরজে বেন্যা মুড়ায় দাড়ি।
কাধে করে নিল বেন্যা হেতালের বাড়ি॥
যদি বুড়ি ডেমনীর নাগাল কভু পাই।
মারিব হেতাল বাড়ি কম্বল ঘুচাই॥
সেই গাল বিষহরি আপনি শুনিল।
কোরোধ করিয়া চাঁদের ছয় বেটা খেল॥"

পটচিত্রে প্রচলিত মনসামঙ্গল কাহিনীর বর্ণনা—অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ভাষ্যে পাওয়া যায়। লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যজনিত এই হেরফের বাদ দিলে কাহিনীটি মোটামুটি একই রকম। আগেই উল্লেখ করেছি মনসামঙ্গল গানের মাঝে বেহুলা-লখীন্দর উপাখ্যানের প্রতি বাঙালির অতিরিক্ত মনোযোগের কথা। বেহুলার পটচিত্রের কাহিনীবিন্যাসকে বোঝার জন্য আমরা

এখানে মঙ্গলকাব্যের বেহুলা-লখীন্দর উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করবো। কাহিনীটি মোটামুটি এরকম—

"পরম শৈব চাঁদ নন্দন কাননে শিব পূজার নিমিত্তে ফুল তুলতে গেলেন। স্বর্গের অরণ্যে নগাবরণ—নাগভূষণ মনসা দেবীর সঙ্গে তার দেখা। চাঁদের উপস্থিতিতে নাগেরা ভয়ে পালায় ; এতে করে দেবী হয়ে পড়েন নিবারণ-নিরাভরণ। মনসা ক্রুদ্ধ হন আর চাঁদকে অভিশাপ দেন—'*মর্ত্যে গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করো।*' শাপগ্রস্ত চাঁদও উত্তর করলেন—'*আমি পূজা না করলে মর্ত্যলোকে তোমার পূজা প্রচারিত হবে না।*'

'চাঁদ মর্ত্যলোকে বিজয় সাধুর পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মর্ত্যে তার স্ত্রীর নাম 'সনকা'। চাঁদ নিত্য শিব পূজা করেন আর স্ত্রী সনকা গোপনে মনসার ঘট-পূজা করতে লাগলেন। জানতে পেরে ক্রুদ্ধ চাঁদ একদিন সনকার মনসাঘট লাথি দিয়ে ভেঙে দেন। মনসা এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিশোধের সংকল্প গ্রহণ করেন। এরপর চাঁদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেল, রাজ্যের অসংখ্য নারী-পুরুষ সর্প দংশনে প্রাণ হারালো। অপরদিকে, চাঁদ ছিলেন মহাজ্ঞানে অধিকারী ; ফলে তিনি আবার তাদের পুরুজ্জীবিত করলেন। চাঁদের এক বন্ধু হলো শঙ্করগারুড়ী। শঙ্করগারুড়ী নেতার শিষ্য, নেতার বরে সে অমর। ওঝা শঙ্করগারুড়ী মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারতো। ফলে মনসার সকল কোপদৃষ্টি থেকে চাঁদ রক্ষা পেলেন। মনসার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে, মনসা কৌশলে শঙ্করগারুড়ীর পত্নীর কাছে শঙ্করের মৃত্যুর উপায় জেনে—তাকে বধ করেন। চাঁদের সাহায্যকারী ডানহাতরূপী শঙ্করগারুড়ীর পতনে, মনসা ছলনা করে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেন এবং চাঁদের ছয় শিশুপুত্রকে খাবারে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলেন। তখন মনসা আবির্ভূত হয়ে চাঁদকে তাঁর পূজা করতে বলেন—মহাজ্ঞান, ছয়পুত্র ফিরিয়ে দেবার প্রলোভন দেখান। প্রত্যুত্তরে চাঁদ মনসাকে লাঠির আঘাত করেন। ছয়পুত্র ফিরে পাবার প্রত্যাশায় সনকা স্বামী-চাঁদকে মনসার পূজা দিতে অনুরোধ করেন। চাঁদ তাতে গা করেন না। মনসার পূজায় সনকা গোপনে স্বামীর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন। মনসা সনকাকে পুত্রবর দিলেন। কিন্তু এক শর্তে, বিয়ের রাত্রে সর্পদংশনে পুত্রের মৃত্যু হবে। পুত্রমুখ দেখবেন এই খুশীতে সনকা বাড়ী ফিরে এলেন।

"চৌদ্দ ডিঙা পশরা সাজিয়ে চাঁদ বাণিজ্যে যাত্রার উদ্যোগ নিলেন। যাত্রাকালে মনসা পুনরায় আবির্ভূত হয়ে চাঁদের নিকট পূজা চাইলেন। যথারীতি চাঁদ তাকে আবারো অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। চাঁদ তার ডিঙা নিয়ে পাটনে পৌছলেন এবং বাণিজ্য-বিনিময়ে অনেক মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার নিয়ে স্বদেশ যাত্রা করেন। পথে মনসা আবারো আবির্ভূত হয়ে চাঁদকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'আমার তরে একটি বারের জন্য ফুলজল দাও।' চাঁদ ক্ষোভ আর অহঙ্কারের সাথে জবাব দিলেন—'যে হাতে শিব পূজা করেছি, সেই হাতে চেমড়ি কালীর পূজা করবো না।' অপমান আক্রোশে মনসা মাঝ সমুদ্রে বান ডেকে আনেন। একে একে চাঁদের চৌদ্দ ডিঙা তাতে নিমজ্জিত হল। কিন্তু চাঁদ যদি মরে যায়, তবে মনসার পূজা প্রবর্তনের বিঘ্ন ঘটে ; তাই মনসা চাঁদের নিকট একটি আশ্রয় প্রেরণ করেন। যা হোক, চাঁদ অবশেষে তীরে পৌছলেন। তারপর নানা দুঃখ কষ্টে চাঁদ বারো বছর প্রবাস জীবন কাটিয়ে ভিক্ষুকের বেশে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দর এখন পূর্ণ যুবক। সব দুঃখ কষ্ট ভুলে তিনি লখীন্দরের বিবাহের উদ্যোগ নেন। উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে

লখীন্দরের বিয়ে স্থির হলো। বিবাহরাত্রে সর্পদংশনে অনিবার্য মৃত্যুর কথা মনে রেখে তিনি এক নিশ্ছিদ্র লৌহবাসর নির্মাণ করেন। কিন্তু তাতে আর নির্মম নিয়তিকে রোধ করা গেল না। লৌহবাসরেই সর্পদংশনে লখীন্দরের মৃত্যু হলো। সে সময় সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে নদীতে ভাসান-এর প্রথা প্রচলিত ছিল। লখীন্দরের শবদেহের অনুরূপ ব্যবস্থা স্থির হলো। বেহুলা স্বেচ্ছায় মৃত স্বামীর অনুগামিনী হলেন। শুরু হলো দেবতার কাছ থেকে বেহুলার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার অন্তহীন যাত্রা।

মৃত স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে বেহুলা গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে চললেন। ভেলা এসে গোদার ঘাটে ঠেকলো ; গোদা সে সময় ঘাটে বসে বড়শীতে মাছ ধরছিল। বেহুলার রূপে মুগ্ধ গোদা বেহুলাকে বিবাহ—প্রস্তাব দেয়। প্রত্যুত্তরে বেহুলা তাকে অভিশাপ দেয়—যতদিন পর্যন্ত সে দেবপুর থেকে ফিরে না আসবে, ততদিন গোদা বড়শীবিদ্ধ হয়ে থাকবে। এরপর বেহুলার ভেলা অপুডোমের ঘাটে এসে ভিড়লে সেও অনুরূপ বাসনা জানায়। বেহুলা তাকে অভিশাপ দিলে নদী তীরে সে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। এভাবে চলতে চলতে বেহুলা বোনা মনার ঘাট পেরিয়ে নেতার ঘাটের দিকে চললো। মনসার আদেশে নেতা বাঘের রূপ ধরে লখীন্দরের গলিত শবদেহের মাংস খেতে চায়, বেহুলা তখন লখীন্দরের বদলে তাকেই খেতে অনুরোধ করে। নেতা আবারো চিলের রূপ ধরে এসে লখীন্দরের পাঁজরের হাড় ছোঁ মেরে নেয়ার চেষ্টা করে, বেহুলা তখন আঁচলে ঢেলে লখীন্দরের পাঁজরের হাড় রক্ষা করে। স্বর্গের ধোপানী নেতার ঘাটে ভেলা পৌঁছল। বেহুলা দেখল—ধোপানী ছোট একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে কাপড় কাঁচতে আসে এবং ছেলেটির দুরন্তপনার জন্য তাকে এক আঘাতে মেরে ফেলে, তারপর কাপড় কাঁচতে শুরু করে। ফেরার সময় ছেলেটার কানের কাছে কী এক মন্ত্র পড়ে তাকে জীবিত করে যায়। ধোপানী মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে ভেবে, বেহুলা পরদিন সকালে আবারো ধোপানী ঘাটে এলে—তার কাছে অনেক অনুনয় করে স্বামীর প্রাণ-ভিক্ষা চায়। তখন নেতা ধোপানী উত্তর করলো, 'মনসার শাপে তোমার স্বামী মারা গেছে, আমি কিছু করতে পারবো না। তবে তুমি যদি দেবপুরীতে গিয়ে দেবতাদের নৃত্য দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পার, তবে তাঁরা মনসাকে বলে তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারেন।' বেহুলা তাতেই রাজী। দেবপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে নেতাকে অনুরোধ করলো।

বেহুলার দৃষ্টিনন্দন নৃত্যকলায় সমবেত দেবতাগণ মুগ্ধ হলেন। স্বয়ং মহাদেব বেহুলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—সে কোন বর চায় কিনা। বেহুলা তখন তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলো। মহাদেব মনসাকে আদেশ করলেন লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য। মনসার শর্ত—চাঁদকে তার পূজা দিতে হবে। মনসা শুধু লখীন্দরকেই নয় চাঁদের আরো ছয় সন্তান, চৌদ্দ ডিঙ্গা সব ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত, মনসা চায় শুধু চাঁদের পূজা। বেহুলা চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করানোর অঙ্গীকার করলে মনসা চাঁদের সমস্ত সম্পদ ও মৃত সন্তানদের ফিরিয়ে দিলেন। বেহুলা ধনরত্নপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙ্গা আর চাঁদের সাত পুত্র সহ গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়ে বেহুলা—লখীন্দর গাঙ্গড়ের ঘাটে পৌঁছল। চাঁদ আনন্দোন্মাদ হয়ে ছুটে এলেন। কিন্তু যে-ই মুহূর্তে শুনলেন—তাকে মনসার পূজা করতে হবে তখন তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চাঁদের জীবনে এতবড় দ্বন্দ্ব আর কখনো দেখা দেয় নি। বেহুলা অনেক অনুনয় অনুরোধ করে চাঁদকে বললেন—মনসাকে একটি ফুল দিয়ে পূজা করতে...অবশেষে চাঁদ রাজী হলেন...তবে বললেন—আমি মুখ ফিরিয়ে থাকবো, দেখবো না, ...এই যে দিলাম।'

"চাঁদ বাম হাতে একটি ফুল নিয়ে পেছন ফিরে তা ছুঁড়ে দিলেন। চাঁদ তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন—যে হাতে শিব পূজা করেন অর্থাৎ ডান হাতে মনসাকে পূজা করে সে হাত কলঙ্কিত করলেন না। আর মনসা এতেই খুশী। মর্ত্যে মনসার পূজার প্রবর্তন হল।"

বেহুলা লখীন্দরের এ কাহিনীর উৎপত্তি-উৎসের স্থানিকতা ও ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ধারণ আজ অবধি সম্ভব হয়নি। বাংলার মনসা মঙ্গলের কাহিনীকার-কবিরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে কাহিনীর বিন্যাস ঘটিয়েছেন। অনেক অনুসন্ধানী গবেষক বেহুলা লখীন্দরের মিথসম্পদকে একান্ত পূর্ববঙ্গের বলেই দাবী করে আসছেন। যদিও পূর্ববঙ্গের বাইরে যেমন, তেমনি বাঙলার বহির্দেশেও অনুরূপ কাহিনী-পরম্পরা বর্তমান ; অন্তত সর্পদেবীর পূজা প্রবর্তনের ব্যাপারটি ভূ-ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যমান। ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্নতাজনিত জটিলতা/সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে চাঁদ সওদাগর উপাখ্যানের এটুকু সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য যে, শৈব ধর্ম লৌকিক ধর্মাচার (Religious Cult) প্রচার এবং প্রসারের প্রতিকূলে অবস্থান নিয়েছে। বাঙলার উচ্চতর-কুলীন সমাজে যখন বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মকৃত্য প্রচলিত, সাধারণ অন্ত্যজশ্রেণীর মাঝে লৌকিক দেব-দেবীর পূজা-আর্চ্চা তখনও স্বতঃবিদ্যমান। শৈব ধর্মাশ্রিত বৈশ্য জাতি মনসার পূজায় অনাগ্রহ ও অবহেলা করে বলে, সাধারণ জনমানসে মনসার প্রতি মমতা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধা প্রবুদ্ধ হয় বলেই মনে হয়। আর হিন্দু-বর্ণবিদ্বেষের, বর্ণ বিভাজনের শিকার অন্ত্যজ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্বীয় মানসে ধারণকৃত দেব-দেবীকে বিজয়ীর ভূমিকায় দেখতে আগ্রহী। মনসা যেহেতু লৌকিক দেবী, লোক সমাজেই যার অধিষ্ঠান তিনি মূলতঃ সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি। সমাজের দরিদ্রশ্রেণী—মূলতঃ কৃষক সম্প্রদায়, সাপের উৎপাত থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশায় মনসার পূজা দেয়। অন্যদিকে, চাঁদ সওদাগর সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রতিপত্তিশালী শৈব বণিক। মনসার প্রতি চাঁদের যে অবহেলা-ঘৃণা প্রকাশিত-তা কার্যত সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রতি অভিজাত শ্রেণীর মনোভাবকেই উন্মোচিত করে। মনসার প্রতি চাঁদের এই আত্যন্তিক অবহেলাই হয়তো তাকে প্রতিহিংসা পরায়ণা করে তুলেছে। শিবের প্রতিকূলতায় মনসাকে চাঁদ নিকৃষ্ট জ্ঞান করে যে আচরণ, যে দুর্ব্যবহার করেছিলেন মনসা দৃঢ় সংকল্পে তার অহংকে অমূলক প্রমাণ করে ছেড়েছেন, তা যে কৌশলেই হোক—বেহুলার প্রতি চাঁদের স্নেহ-ভালোবাসাকে পুঁজি করেই হোক। সওদাগর চাঁদ ও লৌকিক দেবী মনসার মধ্যকার দ্বন্দ্ব বিরোধের মধ্যে কার্যত তৎকালীন বাঙলার সমাজে বিদ্যমান বর্ণ বৈষম্য—শ্রেণী বিভেদকে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে। যুগ যুগান্তরে প্রবহমান লোক কাহিনীর অন্তরঙ্গের অন্তর্নিহিত এই সব দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রেম পূজা ভালোবাসার চিরকালীন উপাদান মঙ্গলকাব্যের দর্শক শ্রোতার মধ্যে মানবিক অনুভবের স্রোতধারা অব্যাহত রেখে চলেছে।

"বেহুলা-লখীন্দর" উপাখ্যান বা অনুরূপ মিথ-পুরাণ কাহিনীর মধ্যে আমরা অতীতের গ্রামীণ কৃষিজীবী ও নিম্নবর্ণের হিন্দু বাঙালি ওই স্তরের অন্যান্য বঙ্গবাসীর সামাজিক-মানসিক অবস্থান সম্পৃক্ত ভাবনাবলীর সাথে পরিচিত হই। আর এ কাজটি সবচে সার্থকভাবে চলেছে পটচিত্র ও পটের গানে ; এ এসব পটুয়ারা সামাজিক প্রয়োজনের সাপেক্ষে যে সব চিত্রাবলী অংকন করে থাকেন তাতে জনমানসের মনঃস্তাত্বিক অবস্থানও সহজেই দৃশ্যমান। গোষ্ঠীগত এই মনঃস্তরের বিশ্লেষণের মাধ্যম লোক পুরাণ তথা মিথের উপযোগিতা ও সত্যতার বিষয়টির উন্মেষ ঘটে। অপরদিকে, লোকধর্ম লোকবিশ্বাস—মিথ-পুরাণ উপাখ্যান সাধারণ মানুষের

অনভিজ্ঞতাপ্রসূত—কাল্পনিক নয়, বরং তা জনগোষ্ঠী দীর্ঘ সময়-কালপর্বের অভিজ্ঞতালব্ধ-উপলব্ধিজাত।

প্রকৃতিতে মানুষ শক্তিধর জীব, কিন্তু প্রকৃতির সমস্ত শক্তি তার আয়ত্তাধীন নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবজনিত কারণে আদিম মানুষ, অনক্ষর সাধারণ জনগোষ্ঠী আত্মশক্তি বা দৈহিক শক্তিতে প্রকৃতির নিকট পরাজিত হলে, প্রকৃতিকে জয় করতে—বশে আনতে শরণ নেয় আদিদৈবিক অতিলৌকিক বিষয়াবলী, আর সে কারণেই তাকে বারবার ফিরে আসতে হয় মিথ পুরাণের কাছে—আত্ম উন্মোচনের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য। প্রতিকূল প্রতিবেশে টিকে থাকার জন্য তাকে সংস্কারের হাত ধরতে হয়—কৌশল প্রয়োগ করতে হয় যাদুবিদ্যার। আর যাদুবিদ্যা তো একটি বিশ্বজনীন প্রসঙ্গ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতির সাথে যাদুবিদ্যার সম্পৃক্তি সর্বজন স্বীকৃত। ই.বি. টাইলারের মতে—সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস থেকেই লোক সংস্কার গড়ে উঠেছে। মানুষের এই সংঘবদ্ধ-সামাজিক বিশ্বাস ও সংস্কারই জন্ম দিয়েছে ধর্ম ও সংস্কৃতির। পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞরা অলৌকিকতা বিশ্বাসের নামকেই 'ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর একটি অলৌকিক শক্তি, সেজন্য ঈশ্বর বিশ্বাসই ধর্ম। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম প্রজাতি যারা মনে করেন পর্বতের প্রাণ রয়েছে—পর্বত অলৌকিক তাই তা উপাস্য। বস্তুতে প্রাণ আরোপ সমস্তের প্রাণের অস্তিত্বের স্বীকৃতি থেকেই সর্বপ্রাণবাদের ধারণাটি এসেছে। বাংলাদেশের লৌকিক ধর্মের বিশেষত্বটি হলো-তা কখনো নিরবচ্ছিন্ন কোন শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়নি। বাঙলার জল-হাওয়া বাঙলার মাটিতে রয়েছে আধ্যাত্ম-চিন্তার গভীর মূল-অভিলাষী বীজ। এদেশের মানুষ ধর্মচেতনায়, সাধনায় কদাচ অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্তমাংসের মানুষকেই মহিমান্বিত করার প্রবণতাটিই অধিকতর। 'শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—চণ্ডীদাসের এ লাইনটির মধ্যেই যেন বাঙালির সামগ্রিক আধ্যাত্মিক সত্তাটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ধর্মকর্মে বাঙালীর নিকট অলৌকিকতা মনুষ্যত্বের উপলব্ধির সহায়কমাত্র, এরচেয়ে বেশী কিছু নয়। আবার চৈতন্যদেবের ধর্মচিন্তা তো মূলতঃ মানবিকতারই সংবদ্ধ অনুভব। বৈষ্ণব কবিরা প্রেম-সঙ্গীত বাঙলার পল্লীর সর্বত্র প্রেরণা সঞ্চারী ভূমিকা নিয়েছে ; বাউল সাধনারও মনুষত্বের বোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনার মিথষ্ক্রিয়াজাত। বিভিন্ন উৎস থেকে পুরাণের, ধর্মের লোকজ বোধেব থেকে শিল্প সংস্কৃতিতে এদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। আর পটুয়ারাও এইসব উপাখ্যান, পৌরাণিক কাহিনী, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয়, দেশ-কাল চেতনা, পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎ চেতনা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ রূপায়িত করে আসছেন রঙ ও রেখার এবং পটের গানের মাধ্যমে জনগণের কাছে উপস্থাপনের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে মিথতত্ত্বের তাৎপর্য পটুয়াদের চিত্রাবলীতে দুনিরীক্ষ নয়।

পটুয়ারা যে ছবি আঁকেন তা মূলতঃ পৌরাণিক, ধর্মভিত্তিক, হলেও সামাজিক এবং সমকালীন প্রয়োজনকে সামনে এনে। আর পটের গানের কথাগুলো সাধারণতঃ আঞ্চলিক, গ্রাম্য কথ্য ভাষায় রচিত। তাঁরা নিজেরাই গানের কথাগুলো তৈরী করেন সুর আর ছন্দের সামঞ্জস্যে, তারপর পটে তা চিত্রিত করেন। পটুয়ারাই সেই পটের কাহিনী পালাগানের মতো গ্রামেগঞ্জে গান করে চিত্রিত পটগুলো উপস্থাপন করেন। এরা একাধারে কবি, গায়ক, শিল্পী এবং কাহিনীকার। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যতিরেকেই এরা ছন্দ ভেঙে ছন্দ তৈরী করেন—দূর দূরান্তে গিয়ে জারিগান তরজাগান কবিগান যাত্রাপালা রামায়ণগান প্রভৃতি পরম

শ্রদ্ধা ও গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে গ্রহণ বর্জন পরিবর্তন করে নিজেদের জন্য উপযোগী কাহিনী কাঠামো তথা পটের গান তৈরী করে থাকেন। নানা পর্যায়ের তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করে পৌরাণিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় কাহিনী দেশাত্মবোধক চিন্তাধারাকে, সমাজচিত্রের ব্যঙ্গ পটচিত্রে তুলে ধরে এঁরা পরিবেশন করেন গভীর মমতা আর নিষ্ঠার সাথে।

বাঙলায় গুটানো পটগুলো প্রধানত কাগজে আঁকা হয়। অতীতে পট চিত্রিত হতো কাপড়ের ওপর—লম্বা খণ্ড কাপড়ে রঙের প্রলেপে আঁকা হতো বর্ণনামূলক চিত্রাবলী। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় গুটানো বা জড়ানো পটচিত্র আঁকার রীতি যথেষ্ট প্রাচীন, আড়াই হাজার বছর কিংবা আরো আগে থেকেই জড়ানো ও চৌকো পটের প্রচলন এখানে ছিল। শুধু চিত্ত বিনোদনই নয়, উপদেশমূলক ও ধর্মপ্রচারধর্মী পটচিত্রের প্রচলন বহু আগে থেকেই চলে আসছে। তবে ভারতে মুসলিম শাসনামলে জনসাধারণ্যে প্রদর্শিত পটের চেয়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আঁকা পট মিনিয়েচারগুলোর কথা স্মরণ করতে পারি।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে পটচিত্রের কয়েকটি রকমফের নির্দেশ করা যায়—হিন্দু-মুসলিম উপজাতীয় প্রভৃতি। হিন্দু ধর্মাশ্রিত বিষয়াবলীর মধ্যে রয়েছে 'মনসামঙ্গল', "কৃষ্ণলীলা", "রামায়ণ", "কমলেকামিনী" ইত্যাদি। মুসলিম বিষয়াবলীর মধ্যে—"গাজীর পট" এবং উপজাতীয় পটগুলির মধ্যে "যাদু পট", "চক্ষুদান পট" ও "দক্ষিণ রায় পট" প্রধান।

পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ারা এক দ্বৈত জীবন ধারায় অভ্যস্ত—হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় এদের জীবনচর্যায় বর্তমান। এঁদের প্রত্যেকের নাম দু'টি করে—একটি হিন্দুয়ানী অপরটি মুসলিম। কিন্তু পদবীতে এঁরা সকলেই 'চিত্রকর'। এঁরা হিন্দু ধর্মানুসারে পূজা আর্চ্চা করেন আবার মুসলিম অনুশাসন ও মেনে চলেন—জীবনযাত্রায় এরা প্রকৃত অর্থেই বাঙালি। অপরদিকে বাংলাদেশের পটুয়ারা হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পছন্দ করেন, পদবীতে লেখেন 'আচার্য্য'।

সামাজিক পরিবর্তনের অমোঘ পরিপ্রেক্ষিতে পটুয়ারা আজ আর শুধু পট এঁকে পেট চালাতে পারেন না। তাই পটচিত্রীদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে—সূত্রধর, কুম্ভকার, প্রতিমাশিল্পী প্রভৃতি। সেইসব পটশিল্পীদের সামাজিক জীবন যেমন সহজ-সরল ছিল, তেমনি তাদের সৃষ্ট পটের আঙ্গিক, রেখা ও রঙের মধ্যেও একধরনের সারল্য লক্ষ্য করা যায়। এই পট শিল্পীরাই আধুনিক কালের চিত্রকরদের শিল্প ধারাকে অনেকাংশে নতুন পথের সন্ধান যুগিয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এইসব পটুয়াদের জীবন আজ বিপর্যস্ত, ফলে আজকের দিনে পটচিত্রের ধারাক্রম ব্যাহত হচ্ছে। পটুয়াদের যদি বেঁচে থাকার তাগিদে অন্য কাজ করতে হয় তাহলে ঐতিহ্যবাহী পটচিত্র একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বাংলার পটশিল্পীদের মিথ-আশ্রয়ী পটের প্রচলন এখন আর তেমন দেখা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক দেব-দেবীর কাহিনী, ধর্মীয় আখ্যান নানা রকম উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে সাধারণ জনগোষ্ঠী জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করতো ; চিত্রবিনোদনের উপাদানও ছিল এইসব পটচিত্র। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় নব্যশিক্ষিত সমাজের জন্য পটুয়ারা সামাজিক কাহিনী ভিত্তিক পটচিত্র আঁকা শুরু করেন। যার মধ্যে সহজ-সরলভাবে তৎকালীন সমাজচিত্র প্রতিফলিত হতো। বিশেষ করে কালীঘাটের পটে ব্যাঙ্গাত্মক রূপ লক্ষণীয়। একসময় সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম

ধর্মীয় পট রচিত হয়েছে। ধর্মীয় পটগুলিতেও বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আদিম সরলতা ও সাবলীলতা নিয়ে বাংলার নানা অঞ্চলে জনগণের চিত্তবিনোদনের খোরাক যুগিয়েছে, ধর্ম সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বরং এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে পরস্পরকে আবদ্ধ করেছে।

পটে রচনাশৈলী বা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বাংলার মন্দিরের প্যানেলচিত্রের সঙ্গে মিল থাকলেও এর নিজস্ব ঢং পটুয়ারা বজায় রেখেছেন সহজাত রং রেখা ও আকৃতির মধ্যে দিয়ে। পটে রেখাগুলিতে (Outline) অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাল রংয়ের ব্যবহার দেখা যায়, যা মূল ভাবকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে ; পটচিত্রগুলির রং এবং রেখার নকশার নাটকীয়তা এবং চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা সত্যি মন কেড়ে নেয়।

সংস্কৃতি জগতে পটুয়ারা এক স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি নিয়ে উপস্থিত হন। জীবিকার প্রয়োজনে যেমন, তেমনি আত্ম-উপলব্ধি রূপায়নে এই শিল্পীরা পটচিত্রকে বেছে নিয়েছেন। অতীতে বিভিন্ন জাতির মত নানা ধর্ম-কর্ম ও জীবন ধারণের বিষয়াবলী চিত্র এগুলোতে সুস্পষ্ট। তৎকালীন যে সমস্ত বিষয়াবলী এগুলোতে পরিলক্ষিত হয় তাতে অতীত-ঐতিহ্যের পরিচয় যেমন রয়েছে, তেমনি আধুনিক মানুষের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অতীত থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমসাময়িকতাকে উপস্থাপন ও নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে। নতুন নতুন আঙ্গিক ও প্রথার মিলনে মিথিক্যাল চিত্রকলা—পটচিত্র ধর্মের লোকজ বোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানুষকে আরো মানবিকতার স্পর্শ দিতে পারে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক কারণে ঐতিহ্যবাহী পটচিত্র আজ বিলুপ্তির পথে। এ বিষয়ে এখনি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।